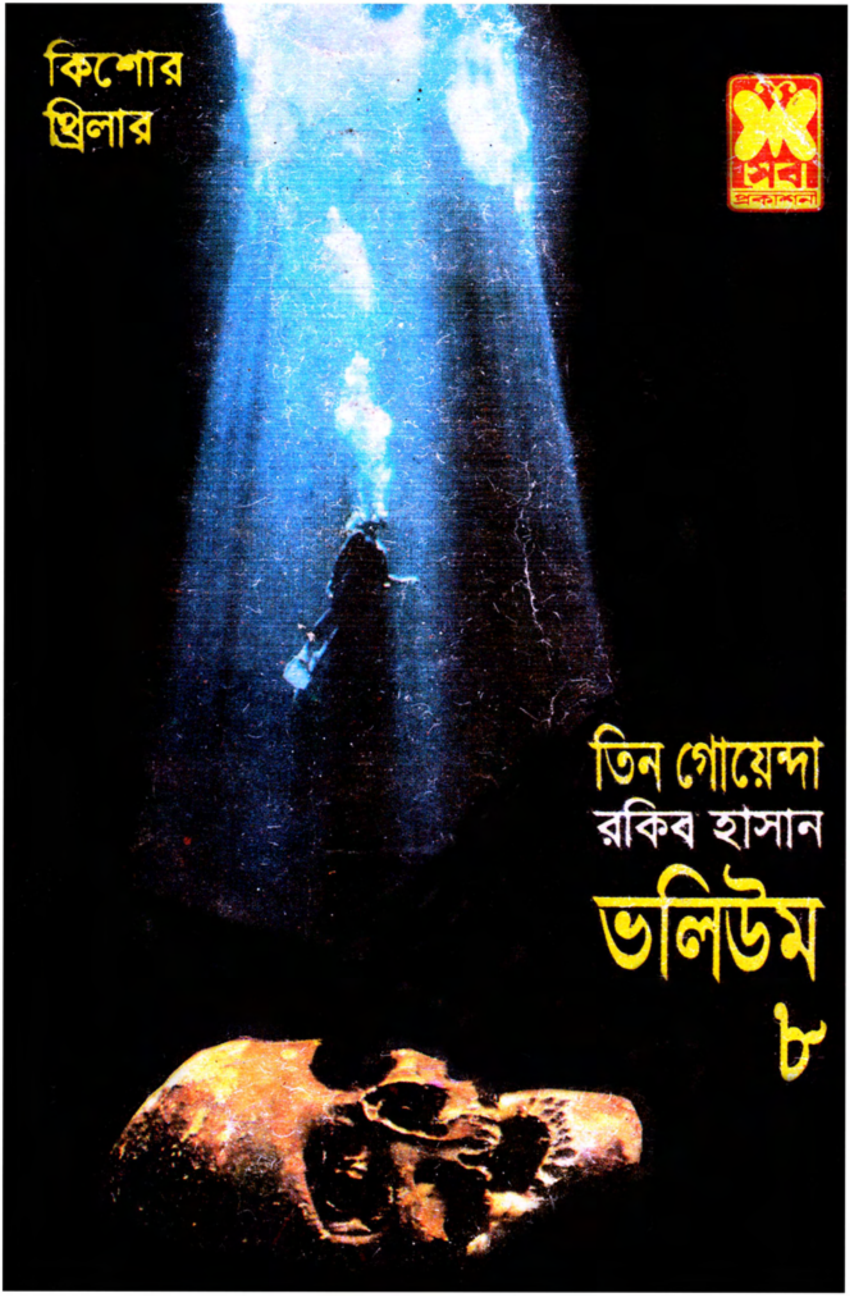
কিশোর
থ্রিলার
সেবা
প্রকাশনী
তিন গোয়েন্দা
রকিব হাসান
ভলিউম
৮

ভলিউম ৮

তিন গোয়েন্দা

৩৪, ৩৫, ৩৬

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

সাঁইত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-1238-0
প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর, ১৯৯২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আসাদুজ্জামান

রচনাঃ বিদেশী কাহিনী অবলম্বনে

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দূরালাপনঃ ৪০৫৩৩২

শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-8
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

আবার সম্মেলন–৭
ভয়াল গিরি-৭০
কালো জাহাজ-১৪৯

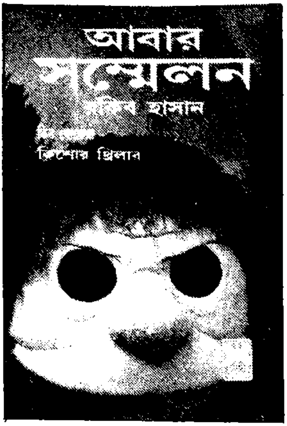

আবার সম্মেলন

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর, ১৯৮৯

'নিশ্চয় কিছু ঘটেছে!' তিন গোয়েন্দাকে বললো জিনা। 'মা'র মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। খোদাই জানে, ভালো না মন্দ!'

এগিয়ে এলেন জিনার মা মিসেস ক্যারোলিন পারকার। কিছুটা উত্তেজিত।

'এই যে,' বললেন তিনি। 'তোমাদের জন্যে খবর আছে। যা ভেবেছিলে, পুরো ছুটিটা এখানে কাটাবে, পারবে না।'

'মানে?' চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'তুমি কি বলতে চাইছ…'

হাসলেন জিনার মা। 'আরে থাম থাম, এত ভাবনার কিছু নেই।…ওই যে, তোর বাবা ডাকছে। তোদেরকে সব বলবে। সেই তখন থেকে কত টেলিফোন যে করল। চল সবাই চলো, রাতের খাবার দেয়া হয়েছে।'

প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে উঠে খাবার ঘরের দিকে এগোল ছেলেরা। নিরবে বসল টেবিলে। একমাথায় বসে রয়েছেন জিনার বাবা, বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর হ্যারিসন জনাথন পারকার।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে শুরু করলেন, 'শোনো তোমরা আজ সকালে পোস্টম্যান এসেছিল অনেকগুলো জরুরী চিঠি নিয়ে। ফলে আগামী কয়েক হপ্তার প্ল্যান বদলাতে হয়েছে আমাকে। স্কটল্যাণ্ডের এডিনবার্গে বিরাট এক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন হবে। আমাকেও দাওয়াত করেছে, যেতে হচ্ছে। এতবড় সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না আমি। আর আমার যাওয়া মানে তোমাদের আন্টিরও যাওয়া,' তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে বললেন তিনি। 'কাজেই, তোমরা এখানে থাকতে পারছ না।' নাটকীয় ভঙ্গিতে থামলেন বদমেজাজী বিজ্ঞানী। তাঁর অতিদুর্লভ একখানি হাসি উপহার দিয়ে বললেন, 'কাজেই, ইচ্ছে করলে তোমরাও যেতে পার আমাদের সঙ্গে।'

'ওহ্, বাবা…!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল জিনা।

'নিশ্চয় যাব,' কিশোর বলল।

রবিন আর মুসার অমত করার প্রশ্নই ওঠে না।

কলরব শুরু করে দিল চার কিশোর-কিশোরী।

'আরে আস্তে, আস্তে, আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ বটে তোমরা, কিন্তু একসাথে থাকতে পারবে না। এডিনবার্গে পৌঁছে আলাদা হয়ে যাব আমরা...'

অবাক হয়ে তাকাল এবার ছেলেরা।

'কেন? আলাদা হব কেন?' জানতে চাইল জিনা।

'কথার মাঝে কথা বলবি না,' রাগতে গিয়েও সামলে নিলেন মিস্টার পারকার। 'আগে আমাকে শেষ করতে দে। ...হ্যাঁ, যা বলছিলাম, আলাদা হয়ে যাব। আমি আর তোর মা উঠব মিডলোদিয়ান হোটেলে। রুম বুক করে ফেলেছি। প্রশ্ন হল, তোরা কোথায় থাকবি?'

একে একে চারজনের মুখের দিকে তাকালেন তিনি। বুঝতে পারলেন, ভেতরে ভেতরে কৌতূহলে ফেটে যাচ্ছে ওরা। ক্ষণিকের জন্যে হেসে উঠল তাঁর চোখের তারা। বললেন, 'আমি ব্যস্ত থাকব সম্মেলন নিয়ে, আর আমার স্ত্রী ব্যস্ত থাকবেন আমাকে নিয়ে। সুতরাং, তোমাদের ব্যবস্থা তোমাদেরকেই করে নিতে হবে।'

'তারমানে হোটেলে থাকছি না আমরা?' ভুরু কুঁচকে বলল জিনা। বাবার মতই বদমেজাজী।

'না। বাইরে থাকবে। ক্যাম্পে।'

'এডিনবার্গে...ক্যাম্প!' রবিন ছাড়া অন্য তিনজন কখনও স্কটল্যাণ্ডে যায়নি। শুনেছে, এডিনবার্গ বিশাল শহর। ওখানে ক্যাম্পিঙের জায়গা কোথায়? সেকথা জিজ্ঞেস করল জিনা।

'অসুবিধে নেই,' বললেন তার বাবা। 'অনেক জায়গা আছে। কয়েক জায়গায় ফোন করেছি আমি। এডিনবার্গের বিশ মাইলের মধ্যেই কয়েকটা জায়গা আছে। আমার যেটা ভাল মনে হল, সেটাও কুড়ি মাইল দূরে, একটা হলিডে ক্যাম্প! ছোটদের জন্যেই তৈরি হয়েছে। দিন পনেরো আরামেই থাকতে পারবে ওখানে চারজনে।'

'চা-র জ-ন!' চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'রাফিয়ানের কি হবে? ও যাচ্ছে না?'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর। জানেন, কুকুরটাকে কতখানি ভালবাসে জিনা। ওটাকে ছাড়া তার ছুটির সব আনন্দ মাটি।

'যাবে,' বললেন তিনি। 'সে-কথাও জিজ্ঞেস করেছি। ক্যাম্পে কুকুর-বেড়াল নিতে অসুবিধা নেই, কোনরকম বিধিনিষেধ নেই, ওদের।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জিনা। চওড়া হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। আরাম করে চেয়ারে হেলান দিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগল। ক্যাম্পটা সম্পর্কে

নানারকম তথ্য জেনে নিচ্ছে। হাতে বোধহয় কোনও কাজ নেই, মিস্টার পারকারেরও তাড়া নেই, ধৈর্য ধরে সব প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলেন তিনিঃ জায়গাটা একটা লকের তীরে। মালিক এক দম্পতি—মিস্টার এবং মিসেস মারফি। দু'জনেই স্কুলের শিক্ষক, ছুটির সময় চলে যান ওখানে, ক্যাম্পটা চালান।

'অনেক মজা করতে পারবে,' মিস্টার পারকার বললেন। 'তোমাদের বয়েসী অনেকেই আসবে ওখানে।'

ভালই জমল রাতের খাওয়া। খেতে খেতে আলোচনা চলল।

'লক মানে কি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'লেক,' জবাব দিল রবিন। 'লক স্কটিশ শব্দ।'

'তাহলে নিশ্চয় সাঁতার কাটা যাবে?'

'নৌকাও পাওয়া যাবে নিশ্চয়?' যোগ করল জিনা। 'বাওয়া যাবে?'

'হ্রদ যখন, পানি আছে,' কিশোর বলল। 'কেন যাবে না? তবে, কোনও...,' চুপ হয়ে গেল সে।

গোয়েন্দাপ্রধানের এই 'কোনও'-র মানে বুঝতে পারল রবিন, মুসা আর জিনা। মানেটা হল, 'রহস্য' কিংবা 'অ্যাডভেঞ্চার' মিলবে তো?

দুই

এডিনবার্গে পৌঁছে কথামত মিডলোদিয়ান হোটেলে উঠলেন জিনার বাবা-মা। আরও অনেক বিজ্ঞানী উঠেছেন ওই হোটেলে। সবাই তাঁরা সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে।

এয়ারপোর্ট থেকেই সোজা বাস স্টেশনে চলে এল তিন গোয়েন্দা, জিনা আর রাফিয়ান। বাসে উঠল। ওরা যাবে বিশ মাইল দূরের হলিডে ক্যাম্প, লক লীন-এ।

শহর থেকে বেরিয়েই শুরু হল পাহাড়। পাহাড়ের ধার দিয়ে গেছে পথটা। আঁকাবাঁকা, কোথাও খাড়া, কোথাও ঢালু। কোথাও এত সরু, একটা বাস চলতে পারে কোনমতে।

'খাইছে!' এরকম একটা জায়গায় এসে আর না বলে পারল না মুসা আমান। 'ওপাশ থেকে আরেকটা বাস এলে এখন কি হবে?'

'আসবে না,' মুসার আশঙ্কা দূর করল রবিন। 'এমনভাবে টাইমটেবিল সেট করা আছে, ওপাশ থেকে এখন বাস আসবেই না।'

লীনহেড গ্রামে এসে বাস থেকে নামল ওরা। স্টপেজ থেকেই ক্যাম্পটা দেখা যায়। বড় সবুজ একটা মাঠের এখানে ওখানে গাছ জন্মে আছে। গাছের ফাঁকে

ছোট ছোট তাঁবু আর কটেজ। বিল্ডিংও আছে। ওগুলোতে রয়েছে ডাইনিং রুম, লণ্ড্রি, গোসলখানা, পড়ার ঘর, খেলার ঘর আর স্ন্যাক বার।

সোজা অফিসে এসে ঢুকল ছেলেমেয়েরা। ওদেরকে স্বাগত জানালেন মারফি দম্পতি। দু'জনকেই পছন্দ করে ফেলল জিনা, যখন দেখল, নির্দ্বিধায় ওঁরা রাফিয়ানের তুলে দেয়া সামনের ডান পায়ের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন। ক্যাম্পটাকে গোলমাল-মুক্ত, আনন্দময় রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন ওঁরা। এমন ব্যবস্থা করেছেন, যাতে অতিথিরা এসে এখানে বাড়ির পরিবেশ পায়, 'দূর-দূর' মনে না করে।

'তোমরা কুঁড়েতে থাকবে,' বললেন মিসেস মারফি। 'তাঁবুর চেয়ে ওখানে আরাম বেশি।' কোন্ কটেজে থাকবে, বলে দিলেন।

সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল ওরা। দূর থেকে ওদের দিকে চেয়ে হাত নাড়ল এক তরুণ। এগিয়ে এসে পরিচয় দিল, 'আমি টমাস সয়ার। আরে না না, মার্ক টোয়েনের বিখ্যাত টম নই, অতি সাধারণ লোক। এখানে মারফিদেরকে সাহায্য করি। অ্যাসিসটেন্ট, হেল্পার, যা খুশি বলতে পার। চল, তোমাদের কুঁড়ে দেখিয়ে দিই।'

প্রথম দর্শনেই টমাসকে পছন্দ করে ফেলল তিন গোয়েন্দা আর জিনা, রাফিয়ানও।

পাশাপাশি দুটো কটেজ দেখিয়ে দিল টমাস।

'চমৎকার!' বলে উঠল জিনা। 'রাফি, তোরও থাকতে কোনও অসুবিধে হবে না। বেশ বড়।'

ক্যাম্পে প্রথম সন্ধ্যাটা ভালই কাটল। আগুনের পাশে বসে সুস্বাদু খাবার, সেই সঙ্গে একটা মাউথঅরগ্যান প্রতিযোগিতা। অনেকের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। বিশেষ করে রাফিয়ানের। এক এক করে সবার সঙ্গে পা মেলাল সে।

অবশেষে ঘুমানোর জন্যে কুঁড়েতে ফিরে এল ওরা। শুয়ে পড়ল চারজনে। কুকুরটা শু'ল জিনার বিছানার পাশে, মাটিতে।

'ভালই, কি বল?' বলল কিশোর। 'গোবেল দ্বীপের চেয়ে কোন অংশেই খারাপ না। খালি যদি মুসার ভবিষ্যদ্বাণীটা ঠিক হয়ে যেত!'

'ভবিষ্যৎবাণী?' হাই তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'কিসের বাণী?'

'ওই যে, প্লেনে বলল না, রহস্য-টহস্য কিছু একটা পেয়েও যেতে পারি।'

'আচ্ছা, কিশোর,' মুসা বলল। 'এই রহস্যের ব্যাপারটা এক মুহূর্তের জন্যেও মাথা থেকে নামাতে পার না তুমি? সুন্দর একটা নিরাপদ ছুটি কাটিয়ে গেলে ক্ষতি কি? কোনও রহস্য নাহয় নাই থাকল।'

'তাহলে এতদিন কি করে কাটাব? খালি খেয়ে আর ঘুরে বেড়িয়ে?'

'ওসব করেও লোকের সময় কাটে, কাটে না?'

'শুধু খেয়ে আর ঘুমিয়েও তো কাটে কত লোকের জীবন। ওটা কোন লাইফ হল?'

'এখন আর তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আমার ঘুম পেয়েছে…!' সশব্দে হাই তুলল মুসা।

সবাই ক্লান্ত ওরা। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন, রোদ ঝলমলে এক সকাল। উঠে কাপড় পরে বেরোল ওরা হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা খাবে।

ডাইনিং রুমে টেবিলে বসেই খাবার খেতে হবে, এরকম কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই ক্যাম্পের। নির্দিষ্ট টেবিলেই সব সময় বসতে হবে, এই নিয়মও নেই। এতে একটা সুবিধে হল, যার যখন যেখানে ইচ্ছে বসছে, খুব তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব হয়ে যাচ্ছে নতুন ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। চিনে নিচ্ছে একে অন্যকে।

আগের রাতে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তারা ছাড়াও নতুন কয়েকজনের সঙ্গে ওদের পরিচয় হল এই সকালে। তাদের নাম জেনি, নিনা, বব, হ্যারি, ডিক, হাকল আর মারিয়া। সাত থেকে সতেরো বছরের মধ্যে ওদের বয়েস। হাসিখুশি, কেউ মুখ গোমড়া করে নেই। নাহ্ জায়গাটা সত্যি ভাল, আরেকবার ভাবল তিন গোয়েন্দা আর জিনা।

'সবাই ভাল এখানে,' বলল মুসা। 'না?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'ওই যে, ওই ছেলেটাকে আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না।'

তাকাল অন্য তিনজন। সতেরো বছরের এক তরুণ। চেহারা সুন্দরই বলা চলে, চোখেমুখের শয়তানী ভাবটা বাদ দিলে। ঠোঁট দুটো অসমান, নিচের ঠোঁটটা বেশি বেরিয়ে আছে। আর কথা বলার সময় যার সঙ্গে বলে সরাসরি তাকায় না তার দিকে, তেরছা ভাবে তাকায়। এটা আরও বেশি খারাপ লাগে।

'হুঁ, ঠিকই বলেছ,' মাথা দোলাল রবিন। 'ওকে আমারও ভাল লাগছে না।'

'আমারও না,' জিনা বলল।

'চেহারা দেখে কি আর সব সময় সব কিছু বোঝা যায়?' তর্ক করার জন্যে নয়, কথাটা এমনিই বলল মুসা।

ওই টেবিলে আরেকটা ছেলে বসেছে, বব। তিন গোয়েন্দার নিচুস্বরের কথাও তার কানে গেল। পাশে কাত হয়ে আস্তে করে বলল, 'কিশোর ঠিকই বলেছে। কেউ পছন্দ করে না ওকে এখানে। ওর ভাল নাম সেটিনার ইকি। কোন্‌দেশী জানি

না, জার্মান কিংবা পোলিশ হবে। কথায় কড়া বিদেশী টান। একা একা থাকে, কারও সঙ্গে কথা বলে না, বন্ধুত্ব করে না, কাউকে কোনও ব্যাপারে সহায়তা করে না। এসব ক্যাম্পের নিয়মের ব্যতিক্রম। কে পছন্দ করবে ওকে?'

'হ্যাঁ, নামটাও বিচ্ছিরি!' বলল ববের পাশে বসা মারিয়া। সুন্দরী, কোঁকড়া কালো চুল। 'ওই দেখ না, কতগুলো খাবার নিয়ে বসেছে। এভাবে খায় কেউ...'

'আমিও বেশি খাই,' হেসে বলল মুসা। 'প্লীজ, আমাকে কিছু বোলো না।'

'আরে না না, আমি সেকথা বলছি না,' অপ্রস্তুত হল মেয়েটা। 'আমি বলছি, খাচ্ছিস খা, একটু ভদ্রভাবে খা না। ওরকম গপ গপ করে, জানোয়ারের মত...আর ওর কাজ-কারবারও কেমন যেন রহস্যময়!'

'রহস্যময়' শব্দটা শুনেই কান খাড়া করল কিশোর। আড়চোখে তার দিকে চেয়ে হাসল রবিন। মুসা আর জিনার দিকে চেয়ে চোখ টিপল। খেয়ালই করল না যেন গোয়েন্দাপ্রধান। চিন্তিত ভঙ্গিতে সেটির দিকে চেয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার।

পরের দুই দিনে হলিডে ক্যাম্পের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আরও সহজ হয়ে এল তিন গোয়েন্দা আর জিনা। খুব উপভোগ করছে। বেশির ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে কাটায়। আশপাশের গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়, কিংবা লক-এ চলে যায়।

ক্যাম্পে যারা এসেছে সবাই সৎ, ভাল, খেলাধুলা আর পড়াশোনায় আগ্রহী, একমাত্র সেটি বাদে। সে আসলেই বদ, ব্যবহার খারাপ। তার চেয়ে বয়েসে ছোটদেরকে তো পাত্তাই দেয় না, বড়দের দিকেও কেমন একটা নাক-উঁচু ভাব নিয়ে তাকায়।

একদিন খেলায় ব্যস্ত বাচ্চারা। তিন গোয়েন্দা আর জিনা বসে বসে দেখছে। এই সময় সেখানে এসে হাজির সেটি। বাচ্চাদের দিকে চেয়ে এমন একটা ভঙ্গি করল, যেন অযথা সময় নষ্ট করছে ওরা। আরেক দিকে চেয়ে হাঁটতে গিয়ে রবিনের পা মাড়িয়ে দিল।

'এই মিয়া,' বলে উঠল মুসা। 'দেখে চলতে পার না?'

জবাব দিল না সেটি। মুসার দিকে একবার কড়া চোখে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে লাগল, যেমন হাঁটছিল।

'আস্ত একটা বেয়াদব!' রেগে গেল জিনা। 'বুঝলাম বিদেশী, কিন্তু ইংরেজি তো জানে। "সরি" বললে কি মুখে ব্যথা লাগত?'

এই সময় সেখানে দৌড়ে এসে হাজির হল দশ বছরের নিনা, উত্তেজিত, ফলে সেটির আলোচনা চাপা পড়ে গেল।

হাঁপাতে হাঁপাতে নিনা বলল, 'শুনেছ?'

'কি?' জানতে চাইল মুসা।

'একটা বিরাট ফ্যান্সি ড্রেস পার্টির আয়োজন করেছেন মিস্টার মারফি। আমরা সবাই যাব। দারুণ হবে, না?'

'ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি?' আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর, এই পার্টি দেখার ইচ্ছে ওর অনেক দিনের। 'কিন্তু এখানে জায়গা কোথায়?'

'এখানে নয়, এডিনবার্গে…ওই যে, টমভাই আসছে। সে-ই বলবে সব।'

হাসিমুখে এগিয়ে এল টমাস। খেলা ফেলে বাচ্চারা সবাই ঘিরে ধরল তাকে। নিনার কথা শুনতে পেয়েছে ওরা।

'টমভাই, কি একটা পার্টি নাকি হবে?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'হ্যাঁ, ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি। হপ্তাখানেকের মধ্যে। এডিনবার্গের লক ডেন হোটেলে ঘর ভাড়া নেয়া হবে। এখানকার সবাই যাবে। নানারকম খেলা হবে, নাচ হবে, যেমন-খুশি-তেমন-সাজ হবে। প্রথম হতে পারলে পুরস্কারও পাবে। আইডিয়াটা কেমন?'

'ভালই তো,' বলল জিনা।

'হুফ!' তার সঙ্গে একমত হল রাফিয়ান।

এই রকম পার্টির কথা অনেক শুনেছে মুসা, খুব নাকি মজা হয়। বিশেষ করে খাওয়া-দাওয়া হয় খুব ভাল। কিন্তু কখনও যোগ দেয়নি। এবার যখন সুযোগ পাওয়া গেছে…। 'দাঁড়ান, আমি কি সাজব, বলি…'

'না না,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল টমাস। 'আগে বলতে হয় না। সবাই জেনে গেলে আর মজা থাকে না। যার যেমন খুশি পোশাক পরবে, সাথে মুখোশও পরতে হবে। যাতে সহজে কেউ চিনতে না পারে। পার্টি চলবে মাঝরাত পর্যন্ত।'

'কিন্তু পোশাক আর মুখোশ পাব কোথায়?'

'ইচ্ছে করলে বানিয়ে নিতে পার। কিংবা ভাড়া আনতে পার। এদেশে প্রায়ই ওরকম পার্টি হয়, তাই জিনিসপত্র ভাড়া পাওয়া যায়। দোকান আছে। মাঝে মাঝেই ভ্যান নিয়ে এডিনবার্গে যাই আমি, বাজার করতে। যেতে চাইলে বল, নিয়ে যাব।'

তিন

লক লীন হলিডে ক্যাম্পে ভীষণ উত্তেজনা। পার্টির আলোচনা ছাড়া আর কোনও কথা নেই।

তিন গোয়েন্দা আর জিনাও আলোচনায় বসেছে।

'টমাস বলল,' জানাল মুসা। 'বাসে করে নিয়ে যাওয়া হবে সবাইকে। হোটেলে গিয়ে তারপর যার যা খুশি সাজবে। সাজার জিনিসপত্র অবশ্য সঙ্গে করেই নিয়ে যেতে হবে। ব্যাগে ভরে, যাতে কেউ না দেখে। হোটেলের বল রুমে হবে পার্টি।'

'বাবাকে ফোন করেছিলাম,' জিনা বলল। 'ভালই আছে। বললাম, পার্টি হবে। বলে দিয়েছে যা খুশি কিনে নিতে। টাকার জন্যে ভাবনা নেই। তবে আমার মনে একটা দুঃখ...'

'তোমার মনে দুঃখ!' রবিন অবাক। 'তোমার আবার দুঃখ কিসের?'

'হ্যাঁ। রাফির জন্যে। মিস্টার মারফি বলতে পারছেন না হোটেলে কুকুর নিয়ে ঢোকা যাবে কিনা না। কোনও রকম পোষা জানোয়ার যদি অ্যালাউ না করে লক ডেন হোটেল? বেচারা রাফি, একা একা এখানে থাকবে কি করে?'

'হুফ!' বিষণ্ণ কণ্ঠে যেন বলতে চাইল রাফিয়ান, 'ঠিকই তো!'

'বেশিক্ষণ তো আর থাকবে না,' বলল কিশোর। 'মাত্র কয়েকটা ঘন্টা। বেশি করে খাবার দিয়ে গেলেই হবে।'

'ঠিক,' তর্জনী তুলল মুসা। 'মন খারাপ হলেই খেয়ে নেবে। দেখ না, কক্ষণো মন খারাপ হয় না আমার। যখনি বুঝতে পারি হতে যাচ্ছে, ব্যস, কিছু না কিছু খেয়ে নিই...'

'সবাই কি আর তোমার মত নাকি?' ঝাঁজাল কণ্ঠে বলল জিনা। 'রাক্ষস...'

'এই তো, লেগে যাচ্ছ,' তাড়াতাড়ি ওদের থামাল কিশোর। 'আসল কথায় এস। কে কি সাজছি আমরা?'

'আমি মাসকেটিয়ার,' সাথে সাথে জবাব দিল রবিন। 'দ্য থ্রী মাসকেটিয়ারস পড়তে খুব ভাল লাগে আমার। মাসকেটিয়ারের পোশাক ভাড়া করব। লম্বা পাকানো গোঁফ আর চোখা দাড়ি লাগিয়ে নেব। কোমরে ঝুলবে তলোয়ার। পাখোয়াজ সৈনিক হয়ে যাব, যদিও মধ্যযুগীয়।'

'মিলল না,' মাথা নাড়ল মুসা।

'কি মিলল না?'

'তুমি যেরকম বইয়ের পোকা, আমি ভেবেছিলাম বুঝি শেকসপিয়ার কিংবা জুলভার্ন সাজবে। অথচ মনে মনে হয়ে বসে আছ সৈনিক। ঠিক আছে, তুমি সৈনিক হলে আমি জলদস্যু। দেখি আমার লুটপাট কিভাবে ঠেকাও। মস্ত এক ভোজালি জোগাড় করে নেব। পাগড়ি, ডোরাকাটা গেঞ্জি, এক চোখ কানা...চোখের ওপর কালো কি যেন লাগায়, পট্টিই বলে বোধহয়, ওরকম একটা লাগিয়ে নেব।'

'খুব মানাবে,' হেসে বলল জিনা। 'এমনিতেই তো ভূতের মত কালো শরীর...'

'ভূতের শরীর কি কালো থাকে নাকি?'

'তা জানি না। তবে মানাবে তোমাকে। যা একখান দেহ, তার ওপর চোখে কালো...হি-হি-হি।...তো, কিশোর, তুমি কি সাজবে? শার্লক হোমস?'

'না। ক্যাট বার্গলার।'

'খাইছে! এত কিছু থাকতে শেষে মধ্যযুগীয় চোর?'

'কেন, মন্দ কি? রবিন সাজবে মধ্যযুগীয় সৈনিক, তুমি জলদস্যু, আমারই বা চোর সাজতে দোষ কি? কালো জারসি, কালো টাইট প্যান্ট, কালো টুপিতে ঘাড়-মাথা ঢেকে থাকবে, মুখে কালো মুখোশ...'

'হ্যাঁ, চোরের মতই লাগবে,' রবিন বলল। 'জিনা, তুমি কি? কাউবয়?'

'না,' সামান্য লাল হল জিনার গাল। 'ছেলে সাজতে আজকাল আর ভাল লাগে না। ভাবছি, আমি সাজব মেষপালিকা। তোমরা তিনজনেই যখন মধ্যযুগের, আমিও মধ্যযুগীয়। আলখেল্লার মত ঢোলা ফ্রক পরব, চুল বাঁধব রঙিন ফিতে দিয়ে, তার ওপর পরব রঙিন নরম হ্যাট...'

'হয়েছে, হয়েছে, আর বলার দরকার নেই,' হাত নাড়ল মুসা। 'কল্পনায়ই দেখতে পাচ্ছি কেমন লাগবে তোমাকে। খালি যদি কয়েকটা ভেড়া থাকত সঙ্গে...'

এ-ধরনের আলোচনা ক্যাম্পের অনেক জায়গায়ই চলছে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেছে ছেলেমেয়েরা। পছন্দমত জিনিস কিনে এনে কেউ পোশাক বানিয়ে নিচ্ছে, কেউ ভাবছে, অযথা খেটে লাভ কি? ভাড়া করে নিলেই হবে।

পার্টির আগের দিন ক্যাম্পের ভ্যানে করে এডিনবার্গে গেল তিন গোয়েন্দা আর জিনা। রাফিয়ানও সঙ্গে গেল। প্রথমে মিডলোদিয়ান হোটেলে গিয়ে জিনার বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করল। লাঞ্চ খেল। তারপর গেল বাজারে। দোকান চিনিয়ে দিল টমাস।

যা যা চাইল ওরা, সব এক দোকানেই পাওয়া গেল।

'দেখ তো কেমন লাগছে?' বলল, মেষপালিকার পোশাক পরা জিনা।

'এক লাফে পিছিয়ে গেছ কয়েকশো বছর,' রবিন বলল। 'ওই যে সেদিন মুসা বলল, কয়েকটা ভেড়া থাকলেই এখন হত।'

'আমাকে কেমন লাগছে?' কোমরের তলোয়ার নেড়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'বেঁটে,' জবাব দিল মুসা। 'মাসকেটিয়ার মানায়নি। তোমার হওয়া উচিত ছিল মার্ক টোয়েন।'

'নাহ, এত বড় লেখকের অসম্মান করতে চাই না। মাসকেটিয়ারই ভাল।

কেন, সেযুগে বেঁটে সৈনিক কি ছিল না?'

'তা ছিল,' স্বীকার করল মুসা। 'আমাকে কেমন লাগছে?'

'খবরদার, এই পোশাক পরে রাস্তায় বেরিও না,' হেসে বলল জিনা। 'ঠিক পুলিশে ধরবে। এই কিশোর, তুমি পরছ না কেন?'

'এখন কি?' বলল কিশোর। 'একবারে কাল রাতেই পরব।'

রাঙতা লাগানো নকল একটা ভোজালি তুলে নিল মুসা। শাঁই শাঁই করে বাতাসে কোপ মারল, যেন মানুষের মাথা কাটছে।

'প্র্যাকটিস করে লাভ নেই,' হাসল রবিন। 'মানুষ পাবে না।'

'আরে দূর, মানুষ কাটতে যায় কে? টেবিলে মুরগী দেবে না, খাওয়ার জন্যে...'

'এটা দিয়ে কাটা যাবে না।'

'তাতে কি? দাঁত তো আছে। আস্ত খাসীর রান খেয়ে ফেলতে পারি, আর মুরগী...তা তোমার তলোয়ার দিয়েও তো কিছু কেটে খেতে পারবে না...'

'মাসকেটিয়াররা তলোয়ার দিয়ে কেটে খায় না। প্রাসাদের দরজা পাহারা দেয়...'

'হ্যাঁ, চোর পাহারা দেয়,' আড়চোখে কিশোরের দিকে তাকাল জিনা। 'ক্যাট বার্গলার।'

ছেলেমেয়েদের আনন্দ দোকানদারের মাঝেও সংক্রামিত হল। কিছুক্ষণের জন্যে ছেলেমানুষ হয়ে গেল যেন সে-ও, হো-হো করে গলা ফাটিয়ে হাসল ওদের সঙ্গে। শেষে আইসক্রীম না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়ল না।

দোকান দেখিয়ে দিয়ে বাজার করতে গেছে টমাস। কখন কোথায় মিলিত হতে হবে, তা-ও বলে গেছে।

পোশাকের প্যাকেটগুলো নিয়ে দোকান থেকে বেরোল তিন গোয়েন্দা আর জিনা। এখনও অনেক সময় আছে হাতে। বিখ্যাত এডিনবার্গ ক্যাসল দেখতে চলল ওরা। খাড়া একটা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছে পুরনো দুর্গটা। আশপাশের এলাকার বেশ অনেকখানি পরিবর্তন করা হয়নি ইচ্ছে করেই, পুরনো পরিবেশ বজায় রাখা হয়েছে।

সময় হলে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল ওরা। ভ্যান নিয়ে এল টমাস। ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা।

'ইস, একেবারে কাহিল হয়ে গেছি!' বলল জিনা। হাই তুলল। 'আমি শুতে চললাম।'

'আমিও,' মুসা বলল। 'যা বড় পাহাড়। উঠতে-নামতেই কাম সারা।'

কাপড় বদলে দু'জনেই শুয়ে পড়ল যার যার বিছানায়। কিশোর আর রবিনও ক্লান্ত, বিছানায় উঠল। রাফিয়ান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল জিনার বিছানার পাশে।

ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

নীরব হয়ে এসেছে ক্যাম্প এলাকা। হ্রদের সব নৌকা তীরে ভেড়ানো, ঘাটে বাঁধা। শান্ত, অন্ধকার রাত।

হঠাৎ কুটিরের কাছে পায়ের চাপে মট করে একটা শুকনো ডাল ভাঙল। একটা কান খাড়া হয়ে গেল রাফিয়ানের। রবিনের ঘুম পাতলা, তারও কানে ঢুকল শব্দটা। ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু চোখ মেলল না।

আরেকবার শব্দ হল। আরও জোরে। পাশ ফিরল রবিন। আরেকটা কান খাড়া করল রাফিয়ান।

নীরব রাতে তৃতীয়বার শব্দ হল মট করে, আর চোখ বন্ধ রাখতে পারল না রবিন। বাইরে, খুব সাবধানে হাঁটছে কে যেন! নিঃশ্বাস বন্ধ করে কান পেতে আছে রবিন। অস্বস্তি বোধ করছে। কেন, বুঝতে পারছে না।

পুরোপুরি সজাগ হয়ে গেছে রাফিয়ান। জিনার দিকে তাকাল। ঘুমোচ্ছে। তাকে জাগানোর চেষ্টা না করে চুপ হয়ে রইল সে।

আস্তে করে বিছানায় উঠে বসল রবিন।

ঠিক এই সময় কুঁড়ের বেড়ার কাছে এসে পড়ল কে যেন, বোধহয় অন্ধকারে হোঁচট খেয়েছে। আরেকটু হলেই চেঁচিয়ে উঠেছিল রবিন, কিন্তু সময়মত সামলে নিল। এত রাতে এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে, নিশ্চয় ভাল লোক নয়। কোনও অসৎ উদ্দেশ্য আছে।

'চোর-টোর না তো?' ভাবল রবিন। 'আমাদের ঘরে ঢুকতে চায়...।' হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হল তার। বিছানা থেকে নেমে গিয়ে কিশোরের বিছানার পাশে বসল। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে ডাকল, 'কিশোর?'

'চুপ! আমিও শুনছি। বিছানায় চলে যাও।'

আরেকবার পায়ের আওয়াজ হতেই আর শুয়ে থাকতে পারল না রাফিয়ান। উঠে দাঁড়াল।

'রাফি, চুপ করে থাক,' ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর।

কিন্তু চুপ থাকল না কুকুরটা। কিংবা হয়ত পারল না। আপনা-আপনিই মৃদু গররর শব্দ বেরিয়ে এল গলার গভীর থেকে।

জিনা এখনও ঘুমিয়ে। আর মুসার শ্রবণশক্তি প্রখর হলে হবে কি, ঘুমালে যেন মরে যায়। সে নাক ডেকে চলেছে।

কে হাঁটছে?--ভাবল কিশোর। ঘুম আসছে না, তাই পায়চারি করতে

বেরিয়েছে? নাকি কোনও শেয়াল-টেয়াল?

আরও জোরে গররর্র করে উঠল রাফিয়ান।

'কিশোর,' চাপা গলায় বলল রবিন। 'দেখ, ওর ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে!'

উঠে বসল কিশোর। গায়ের কম্বল সরিয়ে নামল বিছানা থেকে। 'দাঁড়াও, দেখে আসি। তুমি বসে থাক।'

স্লিপার পায়ে গলিয়ে, পাজামা পরেই বেরিয়ে এল কিশোর। পেছনে রাফিয়ান। তাকে চুপ করে থাকতে বলল সে। যদিও জানে মানুষ হলে চুপ করেই থাকবে কুকুরটা, আর জানোয়ার-টানোয়ার হলে ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করবে।

সামনের দিকে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল কিশোরের একটা আবছা ছায়া—মানুষই—ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে কুঁড়ের কাছ থেকে দূরে। পোশাক দেখে পেছন থেকে বোঝা গেল না ছেলে না মেয়ে।

আশ্চর্য! এত রাতে সে এখানে কি করছিল? নিঃশব্দে পিছু নিল কিশোর।

ঠিক এই সময় এক টুকরো মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। গাছপালার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া মানুষটাকে দেখে চমকে উঠল কিশোর।

সেটিনার ইকি!

অবাক হয়ে ভাবল কিশোর, কি করছিল সেটি? কোথায় যাচ্ছে? শুধু পায়চারি করতেই যদি বেরিয়ে থাকে, এত সাবধানতা কেন? এমনভাবে চলছে, যেন কারও চোখে পড়তে চায় না।

কৌতূহল বাড়ল গোয়েন্দাপ্রধানের। দেখতে হবে, কোথায় যায় সেটি। কাজটায় বিপদ আছে কি না, একবারও ভাবল না। ফিসফিস করে রাফিয়ানকে বলল, 'খবরদার, ঘেউ ঘেউ করবি না!'

কি বুঝল কুকুরটা কে জানে? নীরবে কিশোরের হাত চেটে দিল। টুঁ শব্দও করল না।

নিঃশব্দে সেটিকে অনুসরণ করে চলল ওরা।

চার

সোজা এগিয়ে চলেছে সেটি। সরে যাচ্ছে ক্যাম্প এলাকা থেকে। সীমানার বাইরে বেরিয়ে চলার গতি বাড়িয়ে দিল। তার চেয়ে সাবধানে চলতে হচ্ছে কিশোরকে। শুকনো ডালপালায় পা পড়ে শব্দ হয়ে গেলে এই পিছু নেয়া বিফলে যাবে।

সরু একটা পথ ধরল সেটি। লকের দিকে গেছে পথটা।

'এত রাতে নিশ্চয় গোসল করতে যাচ্ছে না?' ভেবে অবাক হল কিশোর। 'পানিতে নামলে এখন জমে যাবে ঠাণ্ডায়। তাহলে?'

লকের পারে পৌছল সেটি।

পেছনে কিছুটা দূরে রইল কিশোর আর রাফিয়ান।

পিছু নেয়া হয়েছে, বুঝতে পারেনি সেটি। চলেছে। পথ এখন বাঁয়ে মোড় নিয়ে হ্রদের ধার দিয়ে পশ্চিমে এগিয়েছে। হাঁটার গতি আরও বাড়াল।

তার সমতালে চলতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে কিশোর, যদিও রাফিয়ানের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে না।

এতক্ষণ চাঁদ ছিল, হঠাৎ করে আবার ঢাকা পড়ল মেঘের আড়ালে। অন্ধকারে পথই এখন ভালমত চোখে পড়ে না আওয়াজ যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে গিয়ে গতি কমাতে বাধ্য হল কিশোর, খানিক পরে চেয়ে দেখল, সেটিকে দেখা যাচ্ছে না। বোধহয় অনেক এগিয়ে গেছে।

যা হয় হবে। দেখে ফেললে ফেলবে, ভেবে, দৌড় দিল কিশোর। কিন্তু অনেকখানি এগিয়েও ওকে চোখে পড়ল না।

'গেল কই?' আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। আরও জোরে দৌড় দিল।

তারপর থেমে গেল হঠাৎ। কান পাতল। হাঁপাচ্ছে। কিন্তু এর মাঝেও ভারি জুতোর আওয়াজ ঠিকই কানে এল। গাছপালার ভেতর দিয়ে চলেছে। এই জন্যেই এতক্ষণ দেখতে পায়নি। এখনও পাচ্ছে না। পথে উঠে না এলে দেখতে পাবেও না তাকে।

আস্তে রাফিয়ানের মাথায় চাপড় দিল কিশোর। 'যা, পিছু নে,' চাপা গলায় আদেশ দিল।

বুঝতে পারল রাফিয়ান। মাটিতে নাক নামিয়ে শুঁকল। পথ থেকে নেমে গন্ধ শুঁকে শুঁকে এগোল। তার সঙ্গে রইল কিশোর।

পানির ধার থেকে সরে গিয়েছিল, মিনিট পাঁচেক চলার পর আবার পানির কাছে চলে এল। এক জায়গায় এসে থেমে গেল রাফিয়ান। খপ করে তার কলার চেপে ধরে টেনে একটা ঝোপের ভেতরে নিয়ে এল কিশোর। 'শ্‌শ্‌! চুপ, রাফি!'

ঝোপে লুকিয়ে বসে তাকাল কিশোর।

দাঁড়িয়ে গেছে সেটি। একটা টর্চ বের করে জ্বালল। পানির দিকে তাক করে, ওপরে তুলে আলোর বৃত্ত তৈরি করল তিনবার। জবাবে, অন্ধকার হ্রদের দিক থেকে আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল একবার।

'সিগন্যাল!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। গোঁ গোঁ করে উঠতে

যাচ্ছিল রাফিয়ান, মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে থামাল। কাকে সঙ্কেত দিচ্ছে সেটি? কোনও চোরের দলের সঙ্গে জড়িত নয় তো? নির্জন এলাকা, লোক বসতি নেই এদিকটায়—দিনের বেলায় ঘুরতে এসে দেখেছে কিশোর। চোরাই মাল লুকিয়ে রাখা সম্ভব। হয়ত চুরি করে এনে লুকিয়েছে সেটি। এখন এসে সঙ্কেত দিয়ে ডাকছে তার দোসরদের, মাল তুলে দেবে তাদের হাতে বিক্রির জন্যে। কি চুরি করেছে? গহনা? কোন্ জায়গা থেকে চুরি করেছে? এমনও হতে পারে, দূরের কোনও শহর থেকে চুরি করে এনে এই হলিডে ক্যাম্পে লুকিয়েছে সেটি, পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে। কিছুদিন অপেক্ষা করেছে। এখন বের করছে…এখুনি বোঝা যাবে, আসলে কি করেছে।

চুপ করে বসে রইল কিশোর।

মোটর বোটের এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল, এগিয়ে আসছে।

চোর! সন্দেহ হল কিশোরের এত সাহস? মোটর বোট নিয়ে আসছে। একবারও ভাবল না, কাছেই রয়েছে ক্যাম্প। এত রাতে এঞ্জিনের শব্দে সন্দেহ হতে পারে কারও, দেখতে আসতে পারে…

হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন। গভীর নীরবতার মাঝে দাঁড় টেনে এগিয়ে আসার আওয়াজও স্পষ্ট শোনা গেল।

তীরে এসে ঘ্যাচ করে ঠেকল বোট।

সেটি এগিয়ে গেল। 'মিস্টার কাসনার?'

'চুপ! কতবার না বলেছি, নাম বলবে না?' ইংরেজিতেই বলল একটা কর্কশ কণ্ঠ, তবে কথায় কড়া বিদেশী টান। জার্মান, পোলিশ, কিংবা ইহুদী হতে পারে। দু'জনের দেশ আর ভাষা এক নয়, তাহলে ইংরেজিতে কথা বলত না। দেশী ভাষাই ব্যবহার করত।

অস্বস্তি বোধ করতে লাগল কিশোর। এভাবে একা চলে এসে কাজটা ঠিক করেনি। কিন্তু এখন আর ভেবে লাভ নেই। চুপ করে বসে থাকতে হবে আরকি, ওরা যতক্ষণ না যায়।

নিচু কণ্ঠে কথা বলছে দু'জনে। সব শোনা যাচ্ছে না। ভালমত শুনতে হলে আরও কাছে যেতে হবে। কিন্তু যদি ধরা পড়ে যায়?

শেষ অবধি কৌতূহলের কাছে পরাজিত হল ভয়। রাফিয়ানকে বসে থাকার ইঙ্গিত করে খুব সাবধানে ঝোপ থেকে বেরোল কিশোর। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে সরে এল আরেকটা ঝোপের কাছে। হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছে। ঢুকে পড়ল ঝোপটায়।

'না না, অনেক এগিয়ে গেছ, এখন আর পিছাতে পারবে না,' বলছে কাসনার।

'কথা দিয়েছ, অগ্রিম টাকা নিয়েছ। আমিও সেই মতই জানিয়ে দিয়েছি আমার দেশের সিক্রেট সার্ভিসকে। এখন কিছু করতে না পারলে আমাকেও ছাড়বে না ওরা।'

'না, পিছিয়ে আসতে চাইছি না,' তাড়াতাড়ি বলল সেটি। 'ভয় লাগছে আরকি। যদি করতে না পারি?…ঠিক আছে, যাব। এনে দেব আপনাকে প্রফেসর স্পাইসারের ফরমুলা।'

ধক করে উঠল কিশোর বুক। প্রফেসর স্পাইসার, বিখ্যাত আমেরিকান বিজ্ঞানী হেনরি স্পাইসার, দীর্ঘদিন রকেট ফুয়েল নিয়ে গবেষণা করছেন যিনি! বুঝতে পারল, সাধারণ চোর নয় ওরা। ব্যাপারটা অনেক বেশি সিরিয়াস। একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র!

দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। ওরা গুপ্তচর। প্রফেসর স্পাইসারের নাম শুনেছে সে, ম্যাগাজিনে পড়েছে, নতুন ধরনের একটা রকেটের জ্বালানী নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন তিনি। সফল হতে পারলে মহাকাশ আরও অনেক কাছে এসে যাবে মানুষের। খুব শিগগিরই গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে পাড়ি জমাতে পারবে মানুষ। নিশ্চয় এডিনবার্গের সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন স্পাইসার। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাঁর কোনও নতুন আবিষ্কৃত ফরমুলা। সেটাই চুরি করার পরিকল্পনা করেছে ওই দু'জনে।

কান পেতে রয়েছে কিশোর। নিজের বিপদ বুঝতে পারছে। ধরা পড়লে এখন মারাও যেতে পারে। সেটা নির্ভর করছে ফরমুলাটার জন্যে কাসনার কতখানি বেপরোয়া, তার ওপর।

'শোন কি করবে,' বলতে থাকল কাসনার, 'কাল সন্ধ্যায় ফ্যান্সি ড্রেস পার্টির সময়ই সুযোগ। তোমাকে বাছাই করা হয়েছে, তার কারণ, সতেরো বছরের একটা ছেলেকে কেউ সন্দেহ করবে না, বিশেষ করে হলিডে ক্যাম্পে যে ছুটি কাটাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে সব কিছুই আমাদের অনুকূলে। পার্টিটা হচ্ছে লক ডেন হোটেলে, আর প্রফেসর স্পাইসারও উঠেছেন ওই হোটেলেই। ঠিক মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ঘড়িতে বারোটার ঘন্টা বাজলে নিভে যাবে বলরুমের আলো। খেলা শেষ হবে তখন, অন্ধকারে মুখোশ খুলবে ছেলেমেয়ের দল। আর তোমার খেলা শুরু হবে। কাজটা খুবই সহজ। প্রফেসরের রুমে যাবে—গিয়ে দেখবে সে ঘুমিয়ে আছে—জাস্ট ব্রীফকেসটা তুলে নিয়ে চলে আসবে। এই যে নাও, চাবি—মাস্টার কী, দরজার তালা খুলতে কোনও অসুবিধে হবে না।'

'যদি প্রফেসর জেগে থাকে?'

'থাকবে না। সেদিকটা আমি দেখব। রাতে শোয়ার আগে রোজ এক গেলাস

গরম দুধ খায় প্রফেসর। তার দুধে ওষুধ মিশিয়ে দেয়া হবে।'

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল কিশোরের। কি ওষুধ? সত্যিসত্যি ঘুমের, নাকি...আর ভাবতে চাইল না সে। ঝোপের আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দে এসে ওর ঝোপে ঢুকল রাফিয়ান। তার গরম গায়ে হাত রেখে যেন অনেকটা স্বস্তি পেল কিশোর। পাতলা মেঘের আড়ালে রয়েছে এখন চাঁদ। আবছা আলোয় কাসনারের মুখের হাসি বড় কুৎসিত আর নিষ্ঠুর মনে হল, গায়ের রক্ত ঠাণ্ডা করে দেয়। ওই লোককে দিয়ে সবই সম্ভব। তাছাড়া আগে থেকেই সব কিছু ভেবে রেখেছে। সহজে ঠেকানো যাবে না। ফরমুলাটা হাতে পাওয়ার জন্যে মানুষ খুন করতেও বাধবে কিনা সন্দেহ।

সেটির সন্দেহ গেল না। 'প্রফেসরের রুমে তার ব্রীফকেস না থাকলে?'

'থাকবে, আমি শিওর। খুব হুঁশিয়ার লোক। খুঁতখুঁতে। কাউকে বিশ্বাস করে না। ফলমুলাটা কিছুতেই হোটেলের ম্যানেজারের কাছে জমা দেবে না, সেফে রাখার জন্যে, দিয়ে শান্তি পাবে না। ওর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে ভালমত খোঁজখবর নিয়েছি আমরা। জরুরী কাগজপত্র সবসময় কাছে-কাছে রাখে, হাতছাড়া করে না। একটা ব্রীফকেসে ভরে রাখে, যেখানেই যায় নিয়ে যায়।'

'শুনে মনে হচ্ছে, আমার জন্যে সব কিছু তৈরিই করে রেখেছে,' তিক্ত কণ্ঠে বলল সেটি। 'তাহলে আর কি? গিয়ে খালি নিয়ে আসা। পারব।'

'গুড,' বলল কাসনার। 'ব্রীফকেসটা নিয়েই বেরিয়ে পড়বে হোটেল থেকে। এক মুহূর্ত দেরি করবে না। সদর দরজার বাইরে একটা কাল গাড়ি থাকবে। এঞ্জিন চালু। সোজা উঠে বসবে ওটাতে। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল সেটি।

ঘুরে নৌকার দিকে চলল কাসনার। সঙ্গে সঙ্গে গেল সেটি। আর কিছু বলল কিনা ওরা, শুনতে পেলো না কিশোর। অবশ্য আর কিছু শোনারও দরকার নেই। যা শুনেছে, তা-ই যথেষ্ট। বসে রইল স্থির হয়ে।

সেটির পিঠ চাপড়ে দিয়ে গিয়ে বোটে উঠল কাসনার। দাঁড় ফেলল পানিতে।

আরও কিছুক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে রইল সেটি। বোটটা অদৃশ্য হয়ে যেতেই ঘুরল। ফিরে চলল যে-পথে এসেছিল সে-পথে। চলে গেল কিশোরের সামনে দিয়ে। তাকে দেখেনি।

সেটির পিছু নেয়ার আর দরকার নেই। কাজেই বেরোল না কিশোর, অযথা ঝুঁকি নেয়ার কোনও মানে হয় না। বসে রইল আরও কয়েক মিনিট, তারপর উঠল।

কুঁড়েতে ফিরে দেখল, তার দেরি দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে রবিন। লাফ দিয়ে নেমে এল বিছানা থেকে। 'এত দেরি করলে? মুসাকে ডাকব ভাবছিলাম...কোথায়

গিয়েছিলে?'

কথা শুনে জিনার ঘুম ভেঙে গেল। রবিন আর কিশোরকে উত্তেজিত দেখে অবাক হয়ে উঠে বসল। 'কি ব্যাপার?'

'সাংঘাতিক ব্যাপার,' বলল কিশোর। 'মুসাকেও ডাকি। সবাই একসঙ্গেই শোন।'

অনেক ধাক্কাধাক্কির পর চোখ মেলল মুসা। ঘুমজড়িত কণ্ঠে বলল , 'কি? এত তাড়াতাড়ি সকাল হয়ে গেল?'

'এই, ওঠ। জরুরী কথা আছে। এক কাণ্ড হয়েছে।'

'কাণ্ড?' চোখ ডলতে ডলতে উঠে বসল মুসা।

সব কথা খুলে বলল কিশোর। শুনে মুসার চোখ থেকেও দূর হয়ে গেল ঘুম। 'খাইছে!' বলে উঠল সে। 'সেটি হারামজাদা তাহলে স্পাই...প্রফেসর স্পাইসারের ফরমুলা চুরি করতে এসেছে!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এবং আমাদের কাজ সেটা ঠেকানো। ডিউটি।'

'কেন, ডিউটি হতে যাবে কেন?'

'মাঝেমধ্যে না, তোমার ওপর ভীষণ রাগ লাগে আমার। প্রফেসর কি নিজের জন্যে কাজটা করছেন? করছেন মানুষের উপকারের জন্যে, সবার জন্যে। তাঁকে সাহায্য করা প্রতিটি সৎ মানুষের কর্তব্য। একদল শয়তান লোক খারাপ উদ্দেশ্যে, হ্যাঁ, খারাপই বলব, নইলে চুরি করে কেন...'

'হয়েছে, হয়েছে,' দুই হাত তুলল মুসা। 'লেকচার থামাও। ঠিক আছে, ডিউটি। তো এখন কি করব? পুলিশকে গিয়ে বলব?'

'আমরা গিয়ে বললে পুলিশ বিশ্বাস করবে না,' জবাবটা দিল রবিন। 'সেটিকে ধরে পুলিশ জিজ্ঞেস করলে স্রেফ অস্বীকার করবে সে। কোনও প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। আর কিশোরের মুখের কথাই বা বিশ্বাস করবে কেন পুলিশ? ওই কাসনার লোকটা কে, আমরা জানি না। কোথায় থাকে, তা-ও না। সবচেয়ে বড় কথা,"ছেলেমানুষ" বলে আমাদের কথা উড়িয়ে দেবে পুলিশ।'

'রবিন ঠিকই বলেছে,' জিনা একমত। 'কাজেই, এমন একজন বড় মানুষকে গিয়ে বলতে হবে আমাদের, যার কথা পুলিশ বিশ্বাস করে। আর বিশ্বাস করলে হাতেনাতে ধরে ফেলতে পারবে সেটিকে, হয়ত কাসনারকেও। কাল রাতে শাদা পোশাকে হোটেলের আশপাশে লুকিয়ে থাকলেই হল।'

'যদি পুলিশকে বিশ্বাস করানো যায়,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'তেমন বড়মানুষ এখানে কোথায় পাব? আমি তো হ্যারি আংকেলকে ছাড়া আর কাউকে দেখছি না।'

'তাহলে বাবাকেই বলব। কিন্তু বাবা বললেও কি পুলিশ বিশ্বাস করবে?'

ব্যাপারটা নিয়ে আরও অনেকক্ষণ আলোচনা করল ওরা। শেষে সিদ্ধান্ত নিল, মিস্টার পারকারকেই বলবে। তিনি সাবধান করে দেবেন প্রফেসর স্পাইসারকে। তারপর দু'জনে মিলে গিয়ে বলবেন পুলিশকে। তখন আর 'কিছু না' বলে উড়িয়ে দিতে পারবে না পুলিশ। আর পুলিশ যদি ফাঁদ পাতে, স্পাইগুলোকে ধরতে পারবেই।

'এখন এত রাতে আর কিছু করার দরকার নেই,' বলল কিশোর। 'এত তাড়াহুড়োও নেই। তাছাড়া এখন ফোন করতে গেলে সন্দেহ জাগবে মিস্টার মারফির। তাঁকে বোঝানোটা হবে আরেক মুশকিল। তার চেয়ে সকালেই ফোন করব হ্যারি আংকেলকে। ও-কে?'

'ও-কে।' একমত হল সবাই। শুয়ে পড়ল আবার যার যার বিছানায়।

কিন্তু সে-রাতে শান্তিতে ঘুম লেখা নেই ওদের কপালে। সবে চোখ লেগে এসেছে, চমকে জেগে গেল শোরগোল শুনে।

আতঙ্কিত চিৎকার শোনা গেল, 'আগুন! আগুন!'

পাঁচ

'কুইক!' লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল কিশোর। 'জলদি চল।'

ছুটে বাইরে বেরোল ওরা। চারদিকে চেঁচামেচি, হৈ-চৈ।

'দেখ! দেখ!' চেঁচিয়ে বলল মুসা।

উত্তেজিত কণ্ঠে ঘেউ ঘেউ করে উঠল রাফিয়ান।

মুসার নির্দেশিত দিকে তাকাল তিনজনে। ক্যাম্পের কুঁড়েতে আগুন লেগেছে, ঘন ধোঁয়া উঠছে।

'সর্বনাশ!' রবিন বলল। 'আগুনই তো লেগেছে!'

'চল, চল,' বলেই সেদিকে দৌড় দিল কিশোর।

হট্টগোল শুনে অন্যান্য কুঁড়ে আর তাঁবু থেকেও বেরিয়ে এসেছে আরও ছেলেমেয়ে। সবাই ছুটল যেদিকে আগুন লেগেছে।

'খাইছে!' ছুটতে ছুটতে বলল মুসা। 'এ-তো দেখি ববের তাঁবুর কাছে...'

'দমকল আসছে না কেন এখনও!' জিনা বলল।

আগুনের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে গেল ওরা। পাশাপাশি তিনটে কুঁড়েতে আগুন লেগেছে। কি করে ছড়িয়ে পড়ল বোঝা যাচ্ছে না। বালতি দিয়ে পানি এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে টমাস আর আরও কয়েকটা ছেলে। মিস্টার মারফি

হাত লাগিয়েছেন তাদের সঙ্গে। মিসেস মারফি ছুটোছুটি করছেন, দৌড়ে গিয়ে গিয়ে বালতি এনে দিচ্ছেন। তিন গোয়েন্দাও দাঁড়িয়ে রইল না, আগুন নেভাতে লেগে গেল।

'ঢাল, ঢাল, যত পার পানি ঢাল!' চিৎকার করে বললেন মিস্টার মারফি। 'আর যেন ছড়াতে না পারে। দমকলকে ফোন করেছ?'

'করেছি,' জানালেন মিসেস মারফি।

নাচানাচি করছে আগুনের লেলিহান শিখা। বালতির পানি পড়লেই ফোঁস ফোঁস করে উঠছে। যেন ভীষণ রাগে একসাথে ফুঁসছে অনেকগুলো ক্রুদ্ধ অজগর।

কিছুক্ষণ পর মনে হল, সামান্য যেন দমে এসেছে আগুন। কিন্তু ঠিক ওই মুহূর্তে বয়ে গেল এক ঝলক দমকা হাওয়া। উসকে দিল আরও। লাফ দিয়ে গিয়ে আরেকটা কুঁড়েতে পড়ল আগুন, ধরে গেল ওটাতেও।

'আরে, নিক রয়ে গেছে ভেতরে! নিক!' চিৎকার করে বলল মারিয়া। 'আমার ভাই!'

পাইন কাঠে তৈরি কুঁড়েতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। দিশেহারা হয়ে কেঁদে ফেলল মারিয়া। শান্ত করার জন্যে তার হাত চেপে ধরল জিনা। তিন গোয়েন্দা আর টমাস ছুটে গেল কুঁড়ের কাছে। বালতি বালতি পানি ঢেলেও কুঁড়ের আগুন সামান্যতম কমানো গেল না, আরও বাড়ছে। অথচ ভেতরে রয়ে গেছে ছোট্ট একটা ছেলে।

আরেকবার দমকল বাহিনীকে ফোন করতে গিয়েছিলেন মিস্টার মারফি, ফিরে এসে শুনে বললেন, 'কী, ছেলে রয়ে গেছে ভেতরে? সবাইকে না বেরিয়ে যেতে বলেছিলাম?'

'আমারই দোষ,' কাঁদতে কাঁদতে বলল মারিয়া। 'ভাবলাম, ঘুমিয়ে আছে থাক, ওই কুঁড়েতে লাগবে না…এখন তো…' হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সে।

আর শোনার অপেক্ষা করল না মুসা। ফায়ার-ব্রিগেড কখন আসবে কে জানে? ততক্ষণে কুঁড়ে হয়ত ছাই হয়ে যাবে, পুড়ে মরবে নিকার। দরজা দিয়ে ঢোকা অসম্ভব। দু'পাশের জানালা দিয়ে ঢোকারও উপায় নেই। আগুন লেগেছে সামনে থেকে, হয়ত পেছনে এখনও…ছুটে গেল মুসা। ঠিকই আন্দাজ করেছে। পেছনের বেড়ায় লাগেনি এখনও। অনেক উঁচুতে একটা ছোট জানালা দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

যদিও কঠিন, কিন্তু ঢোকার ওই একটা পথই আছে।

দ্বিধা করল না মুসা। লাফিয়ে উঠে ধরার চেষ্টা করল। জানালার চৌকাঠে আঙুল বাঁধল বটে, ধরে রাখতে পারল না। আবার লাফ দিল, এবারও ফসকে

গেল। তৃতীয়বারের চেষ্টায় ধরে ফেলল।

ভেতরে ঢুকতেই ঘন ধোঁয়া যেন গিলে নিল তাকে। নাক-মুখ দিয়ে গলায় ঢুকে জ্বলতে শুরু করল। পরনের পাজামা, ঢোলা শার্ট ভিজে গেছে বালতি দিয়ে পানি ঢালার সময়। তাতে ভালই হয়েছে। পকেট থেকে রুমাল বের করল—ওটাও ভিজে গেছে—বাঁধল নাকেমুখে। তারপর ছুটে গেল বিছানার কাছে।

নিকার তখনও ঘুমিয়ে…না না, ঘুম নয়। বেহুঁশ হয়ে গেছে। তিনধারে, মাথার ওপরে আগুনের হিসহিসানী আর গর্জন। নিকারকে কোলে তুলে নিয়ে পেছনের বেড়ার দিকে দৌড় দিল মুসা। পৌছেই স্থির হয়ে গেল, আতঙ্কে ধড়াস করে উঠল বুক। জানালায় উঠবে কিভাবে?

নিককে বেড়ার ধারে শুইয়ে রেখে ছুটল মুসা। পাগলের মত খুঁজে বেড়াল—অন্তত একটা চেয়ার কিংবা টেবিল। নেই। ঘরের অক্সিজেন ফুরিয়ে আসছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কি করবে? করবে কি এখন?

চোখ পড়ল বিছানার ওপর। আরে, তাই তো! এতক্ষণ মনে পড়েনি কেন? বিছানার এক মাথায় আগুন ধরে গেছে। হ্যাঁচকা টানে তোশক-বালিশগুলো ফেলে দিয়ে চৌকিটাকে হিঁচড়ে নিয়ে এল বেড়ার কাছে।

অসহ্য হয়ে উঠেছে ধোঁয়া। বাতাসে অক্সিজেন ফুরিয়ে গেছে। বুঝতে পারছে, এখুনি বেরোতে না পারলে সে নিজেও বেহুঁশ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই যেন ঝড়ের আওয়াজ শুরু হয়েছে মাথার ভেতর। গা গুলিয়ে উঠছে।

এই সময় জানালার ওপর থেকে ডাক শোনা গেল, 'মুসা! মুসাআ! কোথায় তুমি?'

টমাস। নিশ্চয়ই বেড়ায় মই লাগিয়ে উঠেছে। চেঁচিয়ে বলতে গেল মুসা, 'এই যে, এখানে…!' কিন্তু স্পষ্ট হল না কথা, ঘড়-ঘড় আওয়াজ বেরোল গলা দিয়ে। ফুসফুসে ঢুকে গেছে বিষাক্ত ধোঁয়া।

নিচু হয়ে নিককে আবার তুলে নিয়ে নেশাগ্রস্তের মত টলতে টলতে চৌকির ওপর উঠে দাঁড়াল মুসা। দু'হাতে উঁচু করে তুলে ধরল ছেলেটাকে।

নিককে নিয়ে গেল টমাস।

ঘোরের মধ্যে যেন হাত বাড়িয়ে জানালার ধার খামচে ধরল মুসা। প্রাণ বাঁচানোর প্রচণ্ড তাগিদেই এখনও বেহুঁশ হয়নি। তারপর কিভাবে জানালায় উঠল, কিভাবে বেরোল, বলতে পারবে না।

হুঁশ ফিরলে দেখল, পোড়া কুঁড়ের কাছ থেকে দূরে ঘাসের ওপর চিত হয়ে পড়ে আছে। তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে অনেকগুলো উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত মুখ।

সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। 'উফ্!' বলে চোখ বন্ধ করল আবার সে। কিছুক্ষণ

রি মেলল। হাসল দুর্বল ভঙ্গিতে। 'কোথায় আছি, দোজখে? মরে গেছি তো?'

'না, বেঁচেই আছ,' জিনা বলল। 'জানালা দিয়ে বেরিয়ে মইয়ে নামলে…'

'…তারপর ধপ করে পড়ে গেলে,' জিনার কথাটা শেষ করল রবিন। 'গিয়ে দেখি বেহুঁশ। জিনা তো কাঁদতে শুরু করল…'

'জিনা…তুমি…তুমি কেঁদেছিলে!' মুসা অবাক।

'হ্যাঁ, কেঁদেছিল, তুমি মরে যাচ্ছ ভেবে,' হেসে বলল কিশোর। 'আরে আরে, উঠ না, তোমার শরীর দুর্বল! শুয়ে থাক, শুয়ে থাক…'

'সবল হয়ে গেছি…জিনা কেঁদেছে…মুসা আমান মরে গেছে ভেবে…'

তাকে কথা শেষ করতে দিল না রাফিয়ান। ছেলেমেয়েদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে দেখল, মুসার হুঁশ ফিরেছে। গাল চেটে দিল।

ঠেলে তাকে সরিয়ে দিতে দিতে বলল মুসা। 'আরে সর্, সর্, দম ফেলতে দিবি না?'

'মুসা,' একটা হাত চেপে ধরল মারিয়া, কেঁদে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছে, 'কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব!… নিককে…নিককে…'

'খাইছে! একেবারে হীরো হয়ে গেলাম দেখি। এই তোমরা সরবে, দম নিতে দেবে আমাকে?' ধমক দেয়ার ভান করল বটে মুসা, কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুবই পুলকিত। নিজের জীবন বিপন্ন করে কাউকে বাঁচানোর মাঝে যে এত আনন্দ, জানত না। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসল। দুর্বল ভাব পুরোপুরি কাটেনি এখনও। মাথা ঝিমঝিম করছে। শুয়ে পড়ল আবার।

দমকল বাহিনী এসে গেছে। প্রায় নিভিয়ে ফেলেছে আগুন। টমাস এল। বসে পড়ল মুসার পাশে। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'মুসা, তোমার সাহস আছে…'

'মারছে! আবার শুরু হল,' দু'হাত নাড়ল মুসা। 'পারলে এক গেলাস পানি…'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই উঠে পানি আনার জন্যে দৌড় দিল মারিয়া।

সকাল হল। ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে গেছে মুসা। গোসল সেরে এসে কাপড় পাল্টে নিয়েছে। জিনা, কিশোর আর রবিনও হাত-মুখ ধুয়ে এসে কাপড় পরেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাস্তার ডাক পড়বে।

'আসল কথাই ভুলে গিয়েছিলাম,' হঠাৎ বলল কিশোর। 'হ্যারি আংকেলকে ফোন করতে হবে।'

'করা যাবে,' জিনা বলল। 'অনেক সময় আছে। মাত্র তো সকাল হল।'

পনের মিনিট পড় নাস্তার ঘন্টা বাজল।

কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে রওনা হল তিন গোয়েন্দা আর জিনা। লাফাতে লাফাতে

সঙ্গে চলল রাফিয়ান।

ডাইনিং রুমে ঢুকে দেখল ওরা, আরও অনেক ছেলেমেয়ে জমায়েত হয়েছে। নিকার সুস্থ হয়েছে। মুসাকে দেখেই ছুটে এল। দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। 'মুসাভাই, তুমি সত্যি আমার ভাই...'

এ-ধরনের কথাবার্তা সইতে পারে না মুসা, চোখে পানি এসে যায়। এখনও তার ব্যতিক্রম হল না। আদর করে নিকারের গাল টিপে দিল।

নিকার যেখানে ছিল, তার পাশের চেয়ারে বসেছে মারিয়া। হাত তুলে ডাকল, 'এই, এখানে এস।'

ওই টেবিলেই গিয়ে নিকার আর মারিয়ার সঙ্গে বসল তিন গোয়েন্দা আর জিনা।

'নিক,' খেতে খেতে জিজ্ঞেস করল জিনা। 'তুমি কি সাজবে? বলতে আপত্তি আছে?'

'না না, তোমরা তো এখন আমার বন্ধু,' বলল নিকার। 'আমি সাজব তুষারমানব...কিন্তু...' মুখ কালো হয়ে গেল তার। 'আমার পোশাক তো পুড়ে গেছে!'

'বললাম না, আরেকটা কিনে দেব? এখন শান্ত হয়ে খাও,' বলল তার বোন মারিয়া।

নাস্তা শেষ হল।

ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে কিশোর বলল, 'জিনা, এবার হ্যারি আংকেলকে ফোন করা দরকার। চল।'

অফিসের দিকে রওনা হল তিন গোয়েন্দা, জিনা আর রাফিয়ান।

ওদের পথ আটকালো কয়েকজন খবরের কাগজের রিপোর্টার। হলিডে ক্যাম্পে আগুন লাগার সংবাদ শুনে এসেছে।

একজন জিজ্ঞেস করল, 'মুসা আমান কে?'

দেখিয়ে দিল রবিন।

'মিস্টার মারফি বললেন,' রিপোর্টার বলল। 'তুমি নাকি একটা বাচ্চা ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছ। তোমার একটা ছবি নিতে চাই। আজকে সন্ধ্যার কাগজে খবর বেরোবে।'

মুসা কিছু বলার আগেই ক্লিক করে উঠল ক্যামেরার শাটার।

'এরা কে?' জানতে চাইল রিপোর্টার। 'তোমার বন্ধু?'

মাথা নাড়ল মুসা। 'আমরা সবাই আমেরিকা থেকে এসেছি লস অ্যাঞ্জেলেস...'

তিন গোয়েন্দা, জিনা আর রাফিয়ানকে একসাথে দাঁড় করিয়ে একটা গ্রুপ

ফটো তুলল রিপোর্টার। তারপর মুসাকে ছোটখাটো কয়েকটা প্রশ্ন করে, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গেল।

'দিল ব্যাটারা দেরি করিয়ে,' বিরক্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। হাতঘড়ি দেখল। 'ইস্, এগারোটা বেজে গেছে! চল চল, কুইক।'

ডায়াল করল জিনা। ওপাশের কথা শুনে কালো হয়ে গেল মুখ। আস্তে করে নামিয়ে রাখল রিসিভার। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, 'হোটেলে নেই। খানিক আগে বেরিয়ে গেছে। বাবাও গেছে, মা-ও। রিসিপশনিস্ট জানাল, রাতের আগে ফিরবে না।'

'ততক্ষণে কাজ সেরে ফেলবে সেটি,' গম্ভীর হয়ে গেল মুসা।

'সর্বনাশ!' ভ্রূকুটি করল রবিন। 'এখন কি হবে?'

'কি আর হবে?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'যা করার আমাদেরই করতে হবে। হোটেলে গিয়ে দেখা করতে হবে প্রফেসর স্পাইসারের সঙ্গে। তাঁকে সব কথা খুলে বলতে হবে।'

'কিন্তু ততোক্ষণে যদি ওষুধ খাইয়ে ফেলা হয় তাঁকে?'

'তাহলে তাঁর ফরমুলা বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে আমাদেরকেই।'

ছয়

বাকি দিনটা ভীষণ উত্তেজনার মাঝে কাটল।

ছেলেমেয়েরা উত্তেজিত, রাতের আগুন লাগার ঘটনার জের তো আছেই, তার ওপর পার্টির জন্যে তৈরি হওয়ার ব্যাপার আছে।

পোড়া ঘরগুলো মেরামতের কাজে ব্যস্ত মিস্টার মারফি আর টমাস। শহর থেকে মিস্ত্রি, মালপত্র আনানো হয়েছে। সেদিন বোধহয় ঘর মেরামত শেষ হবে না। সেসব ঘরের ছেলেমেয়েরা রাতে কোথায় ঘুমাবে, সেই ব্যবস্থা করতে হচ্ছে মিসেস মারফিকে।

আগুন লাগায় এমনিতেই ছেলেমেয়েরা মনমরা, তার ওপর পার্টি না হলে আরও খারাপ হবে। ওদেরকে নিরাশ করা উচিত হবে না। নিয়মিত সময়েই পার্টি হবে, ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে।

বিকেলে চা খাওয়া শেষ হল। বাস এল ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। পোশাকের বাক্স নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে করতে গিয়ে বাসে উঠল সবাই।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে এডিনবার্গের দিকে চলল বাস। সবাই উত্তেজিত।

জিনা আর তিন গোয়েন্দাও। ওরা অন্য কারণে উত্তেজিত, পার্টির জন্যে নয়।

ঠিক সময়ে হোটেলে পৌঁছে প্রফেসর স্পাইসারকে হুঁশিয়ার করে দিতে পারবে তো?

'আমাদের কথা শুনলে হয়,' জানালার বাইরে তাকিয়ে, অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে ভাবল কিশোর। 'হ্যারি আংকেলকে না পাওয়ায় মুশকিলই হল।'

লক ডেন হোটেলের বিশাল ডাব্‌ল ডোরের সামনে এসে থামল বাস। নামল ছেলেমেয়েরা। আগেই বলে দেয়া আছে, তাই হৈ-চৈ করল না ওরা। শান্ত ভাবেই ঢুকল ভেতরে। হাসিখুশি এক সুন্দরী রিসিপশনিস্ট অভ্যর্থনা জানাল ওদের।

'এদিকে, প্লীজ, লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলম্যান,' বলল সে। যেন বাচ্চা নয়, বড়দের সঙ্গেই কথা বলছে।

মেয়েদেরকে নিয়ে যাওয়া হল একটা বিশাল ঘরে, ছেলেদের দেখিয়ে দেয়া হল আরেকটা বড় ঘর। পোশাক পাল্টানোর জন্যে। দুটো ঘরেই পর্দা টাঙিয়ে ছোট ছোট খোপ তৈরি করা হয়েছে, একেকটাতে একেকজনে ঢুকে পড়ল পোশাক পরার জন্যে। সবাই ঢুকতেই আলো নিভিয়ে দেয়া হল। কে কি পরছে সেটা যেন অন্য কেউ দেখতে না পারে।

অন্ধকারেই পোশাক পরা শেষ করল ওরা। মুখোশ পরল। তারপর বেরিয়ে এল ঘর থেকে, এবার বলরুমে যেতে হবে।

পথ দেখিয়ে নিয়ে এল তাদেরকে রিসিপশনিস্ট। বিরাট ঘর। মুখোশের চোখের জায়গায় ফুটো রয়েছে। তাজ্জব হয়ে একে অন্যকে দেখছে ছেলেমেয়েরা। এত পরিচিত, অথচ এখন এই পোশাক পরে পুরোপুরি অপরিচিত হয়ে গেছে একে অন্যের কাছে। বিচিত্র দৃশ্য।

এক কোণে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে চার কিশোর-কিশোরী, পাশে একটা কুকুর—মুখে ভেড়ার মুখোশ। তিন গোয়েন্দা, জিনা আর রাফিয়ান। এমনিতে হোটেলে জানোয়ার ঢোকানো নিষেধ। কিন্তু মিস্টার মারফির বিশেষ অনুরোধে, আর এই বিশেষ দিনটির জন্যে কুকুরটাকে অনুমতি দিয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষ। পত্রিকায় ছবি দেখেছে রাফিয়ানের।

'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই,' নিচু কণ্ঠে বন্ধুদেরকে বলল কিশোর। 'প্রফেসরের কাছে যাওয়া দরকার। সময় খুব কম। চল, রিসিপশনিস্টকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, প্রফেসর কত নম্বর রুমে থাকেন?'

লম্বা লম্বা টেবিল বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। ওগুলোতে নানারকম খেলার সরঞ্জাম। অন্যান্য ছেলেমেয়েরা খেলতে বসে গেল। তিন গোয়েন্দা আর জিনার দিকে খেয়ালই নেই কারও। রাফিয়ানকে নিয়ে ওরা চারজনে এগিয়ে গেল রিসিপশন

ডেস্কের দিকে।

ডেস্কের ওপাশে বসে আছে একজন লোক। ছেলেমেয়েদের দেখে হাসল।

'স্যার,' কিশোর বলল। 'একটা কথা বলতে পারবেন? প্রফেসর স্পাইসার কি এখন তাঁর রুমে আছেন?'

কী-বোর্ডের দিকে এক পলক চেয়ে বলল লোকটা, 'হ্যাঁ, আছেন।'

'প্লীজ, তাকে বলবেন কি, প্রফেসর হ্যারিসন পারকারের ভাইপো তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায়? বিজ্ঞানী প্রফেসর পারকার, সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন। বলে দেখুন, তিনি রাজি হয়ে যাবেন।'

কিশোরের কথায় অবাক হল লোকটা। কি ভাবল। তারপর রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল। সুইচ বোর্ডের একটা সুইচ টিপে দিল। কিশোর লক্ষ্য করল, সুইচটার নিচে নম্বরঃ ১০৪।

রিসিভার কানে ঠেকিয়েই রেখেছে লোকটা। কুঁচকে যাচ্ছে ভুরু। অবাক হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে। 'আশ্চর্য! প্রফেসর স্পাইসার তো তাঁর রুমেই রয়েছেন। জবাব দিচ্ছেন না কেন? বোধহয় কাজ করছেন।...সরি,' কিশোরকে বলল সে। 'প্রফেসরকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। তিনি আমাদের বোর্ডার। তাঁর ভালমন্দ দেখা আমাদের দায়িত্ব। এক কাজ কর না? কাল সকালে একবার আস?'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর। যেন ঠিকই বলেছে রিসিপশনিস্ট। লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে এল সেখান থেকে।

'শুনলে তো?' ফিসফিস করে বলল সে। 'প্রফেসর রুমে আছেন, কিন্তু জবাব দিচ্ছেন না।'

'তারমানে ওষুধ খাইয়ে দেয়া হয়েছে,' মুসা বলল।

'হ্যাঁ। এছাড়া আর কি?' বলল রবিন।

'এখন তাহলে কি করব আমরা?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, একদম সময় নেই,' জরুরী কণ্ঠে বলল কিশোর। 'প্রফেসর স্পাইসারের ফরমুলা বাঁচাতে হবে।'

'ঠিক। কোনও শত্রু দেশের হাতে পড়তে দেয়া চলবে না,' জিনা বলল।

'দেশের হাত থাকে না,' এই জরুরী মুহূর্তেও রসিকতা করতে ছাড়ল না মুসা।

'আরে ধুত্তোর!' রেগে গিয়ে বলল জিনা। 'বুঝে নিলেই পার। আমি বলতে চাইছি বিদেশী স্পাইয়ের হাতে পড়তে দেয়া চলবে না।'

'থাম তো তোমরা!' ধমক দিল কিশোর। 'ঝগড়া করার আর সময় পেলে না। সেটি ঢুকবে ঠিক বারটায়...'

'বারটা পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করবে?' জিনার প্রশ্ন।

'কারণ, তখন বলরুমের আলো নিভে যাবে,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'বললাম না সেদিন?'

'হুঁ। অন্ধকারের সুযোগ নেবে সেটি,' বিড়বিড় করল রবিন। 'সবার চোখ এড়িয়ে চলে যাবে প্রফেসরের ঘরে, কেউ দেখতে পাবে না তাকে। কেউ খেয়াল করবে না। মাস্টার কী তো দিয়েছেই তাকে কাসনার, তালা খুলতেও অসুবিধে হবে না। ব্রীফকেসটা নিয়ে বেরিয়ে যাবে।'

'পারবে না,' বলল কিশোর। 'ওর আগেই আমরা হাতিয়ে নেব। চল। প্রফেসরের ঘরে। দেখি ঢোকা যায় কিনা?'

'যদি তালা লাগানো থাকে?' মুসা বলল।

'না-ও থাকতে পারে। গিয়ে দেখা যাক। আগে থেকে ভেবে লাভ নেই।'

'কে যাবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা

'সবাই এক সঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না। তুমিই যাও,' কিশোর বলল। 'কেউ যদি তোমাকে দরজা খুলতে দেখে, কিছু জিজ্ঞেস করে, বানিয়ে একটা কিছু বলে দিও।'

'কি বলব?'

'বলবে…বাথরুমের দরজা মনে করেছ। চোখের পট্টি আর ভোজালি এখানে রেখে যাও, তাহলে নজরে পড়বে না। কালো পট্টিটা বিচ্ছিরি।'

'কিন্তু কিভাবে বুঝব একশো চার নম্বর রুমটা কোথায়?'

'অবশ্যই দোতলায়। একশো তো, শুরুটা এক, অর্থাৎ ফার্স্ট ফ্লোর। দোতলার চার নম্বর ঘর।'

'বেশ। যাচ্ছি।'

দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল মুসা। লিফট দিয়ে ওঠার চেয়ে এটাই ভাল মনে হল।

লবিতে দাঁড়িয়ে রইল কিশোররা। টবে লাগানো লতা ঘন হয়ে লতিয়ে উঠে পর্দার মত ঝুলে আছে, তার আড়ালে রয়েছে ওরা। ফলে কারও চোখে পড়ল না। আশা করছে, মুসা যেন ব্যর্থ না হয়।

কিন্তু নিরাশ হতে হল ওদেরকে। বিফল হয়েই ফিরল মুসা। খালি হাতে।

'দরজায় তালা,' জানাল সে। 'হ্যাণ্ডেল ধরে অনেক টানাটানি করলাম, খুলল না। জোরে জোরে থাবা দিলাম দরজায়, কেউ সাড়া দিল না। প্রফেসরের নাম ধরেও ডেকেছি কয়েকবার, জবাব নেই। শেষে কীহোল-এ কান পাতলাম, ভেতরে নাক ডাকার শব্দ। দরজার নিচ দিয়ে আলোও আছে দেখলাম।'

'হুঁ, ঘুমের ওষুধই খাইয়ে দেয়া হয়েছে,' জিনা বলল। 'কড়া ওষুধ। কয়েক

ঘন্টা ঘুম ভাঙবে না।'

হাতঘড়ি দেখল রবিন। 'করলে তাড়াতাড়ি কিছু করা দরকার। এগারোটা প্রায় বাজে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ওদিকে মারিয়া আর নিকও নিশ্চয়ই খুঁজতে আরম্ভ করেছে আমাদেরকে। খুঁজে না পেলে হৈ-চৈ শুরু করবে।'

'কিন্তু করবটা কি?' মুসার জিজ্ঞাসা। 'মাস্টার কী নেই যে গিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করব।'

'না, চাবি নেই, কিন্তু মগজ আছে। তা-ই খাটানর চেষ্টা করব।' এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। 'দরজা যেহেতু বন্ধ, জানালা দিয়ে ঢুকতে হবে। দোতলার জানালার সারির নিচ দিয়ে একটা কার্নিশমত আছে, বেশ চওড়া। হোটেলে ঢোকার আগেই দেখেছি। বেশ গরম পড়েছে আমার বিশ্বাস, জানালা খোলাই রেখেছেন প্রফেসর।'

'কিন্তু উঠবে কি করে ওখানে?' রবিন বলল। 'ডেঞ্জারাস...'

'তাছাড়া,' বলে উঠল মুসা। 'হোটেলের বাইরে লোক থাকলে দেখে ফেলবে।'

'না, ডেঞ্জারাসও নয়, দেখবেও না,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল কিশোর। 'সবাই একসাথে যাচ্ছি না আমরা, যাওয়া উচিত হবে না। আমি একা যাব। ঘরটা দোতলায়। যদি ফসকে পড়ে যাইও, তেমন ব্যথা পাব না। আর যা-ই হোক, মরব না অন্তত। যেখান দিয়ে উঠব সেখানটা অন্ধকার। আমার পরনে রয়েছে কালো পোশাক, এতে মস্ত সুবিধে হয়েছে। এরকম পরিস্থিতি হতে পারে ভেবেই এই পোশাক বেছে নিয়েছি আমি, খেলায় যোগ দেয়ার জন্যে নয়।'

'তা তো বুঝলাম,' জিনা বলল। 'কিন্তু উঠবে কি করে? তার চেয়ে মুসা গেলে ভাল হত না?'

'না। ওর ওই ডোরাকাটা গেঞ্জিই মেরে দিয়েছে, অন্ধকারেও লোকের চোখে পড়বে। আর এত ভয় পাচ্ছ কেন? ও গাছ বাইতে পারে, আমি পারি না? খুব ভাল করেই জান, আজকাল রীতিমত ব্যায়াম করি আমি। ওরকম দোতলা তিনতলায় সহজেই উঠে যেতে পারি। বাথরুমের জানালা দিয়ে কার্নিশে নামব। ওটা ধরে চলে যাব প্রফেসরের ঘরের জানালায়। তবে, অসুবিধে যেটা হবে, তা হল প্রফেসরের ঘর চেনা। জানালা দিয়ে তাঁকে দেখতে না পেলে চিনব না কোনটা একশো চার।'

'ভুলে যদি অন্য কারও ঘরে ঢুকে পড়?'

'তা ঢুকব না। প্রফেসরের এত ছবি দেখেছি পত্র-পত্রিকায়, দেখলেই চিনতে পারব। আর তাঁকে না দেখে তো ঢুকছি না।'

সব কথার জবাব তৈরি থাকে কিশোর পাশার কাছে! কোনও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে তাকে ঠেকানো মুশকিল। হাল ছেড়ে দিল জিনা। আর কোনও প্রশ্ন করল না।

সময় বয়ে যাচ্ছে।

'তোমরা এক কাজ করবে,' বলল কিশোর। 'আমি যাওয়ার পর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করবে। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাবে দোতলায়। প্রফেসরের দরজার কাছে করিডরে দাঁড়িয়ে থাকবে। এমন ভাব দেখাবে, যেন কারও জন্যে অপেক্ষা করছ। আমি ভেতর থেকে দরজা খুলে দেব। তখন ঢুকবে।'

এক এক লাফে দু'তিনটে করে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে লাগল কিশোর।

তাকে চলে যেতে দেখল তার বন্ধুরা। উৎকণ্ঠায় ভুগছে তিনজনেই। ইচ্ছে করছে, এক দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে দেখে, ঠিকমত যেতে পারছে কিনা কিশোর। কিন্তু সেটা করা উচিত হবে না। তাহলে সমস্ত পরিকল্পনাই ভেস্তে যেতে পারে।

দীর্ঘ কয়েকটা মিনিট পেরোল।

নড়ে উঠল রবিন। 'এবার বোধহয় সময় হয়েছে। চল, যাই।'

'চল,' বলল মুসা।

সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল মাসকেটিয়ার, জলদস্যু, মেষপালিকা আর তার প্রিয় ভেড়া। এক সাড়িতে। অবাক হয়ে ভাবছে তিনজনে, ওপরে উঠে কি দেখতে পাবে?

সাত

হোটেলের বলরুমে তখন পুরোদমে চলছে পার্টি। গোয়েন্দাদের ভাগ্য ভাল, তারা যে নেই, এটা খেয়ালই করল না কেউ। হোটেলের লোকেরাও ব্যস্ত ওদিকে, কাজেই সিঁড়ি আর করিডরগুলো নির্জন।

এক তলায় উঠে এল ওরা। আর কেউ নেই।

'ওটা একশো চার,' দরজাটা দেখিয়ে নিচু কণ্ঠে বলল মুসা।

'কিশোর কি ঢুকলই, না কি!' আনমনে বিড়বিড় করল রবিন।

বাথরুমের জানালা ডিঙিয়ে সহজেই কার্নিশে নামল কিশোর। পুরো দেয়াল জুড়ে লম্বালম্বিভাবে চলে গেছে কার্নিশটা। অন্ধকার। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে পা বাড়িয়ে পাশে সরছে। বন্ধুদেরকে বলে এসেছে বটে কাজটা কিছু না, কিন্তু এখন দুরুদুরু করছে বুক। যদি পড়ে যায়? 'দূর, পড়ে গেলে যাব!' নিজেকে ধমক দিল

সে। 'মরে তো আর যাব না!'

দুটো আলোকিত জানালা পেরোল সে। সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখেছে দুটো ঘরের ভেতরেই। কেউ নেই। তারমানে ওগুলো নয়।

অবশেষে আকাঙ্ক্ষিত ঘরটা পাওয়া গেল। আলোকিত জানালা দিয়ে বকের মত গলা বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখল। হাসি ফুটল মুখোশে ঢাকা মুখে। বিড়বিড় করে নিজেকে বলল, 'ওই যে, প্রফেসর স্পাইসার।'

জানালা খোলা। ঢুকে পড়ল কিশোর। ঢুকেই টেনে দিল জানালার ভারি মখমলের পর্দা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দম নিল কিছুক্ষণ।

তারপর পায়ে পায়ে এগোলো প্রফেসরের বিছানার কাছে। চিত হয়ে শুয়ে আছেন তিনি। কোট-প্যান্ট-টাই-জুতো, সব পরা। কিছুই খোলার সময় পাননি যেন। অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। জোরে জোরে নাক ডাকছে। নিঃশ্বাসের তালে তালে হাস্যকর ভঙ্গিতে কাঁপছে তার পুরু গোঁফজোড়া। দেখে বিশ্বাসই হতে চায় না, ওই বেঁটে, মোটা, ভুঁড়িওয়ালা লোকটা বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। বরং সার্কাসের ভাঁড় হলেই যেন বেশি মানত।

প্রফেসরের চেহারা দেখে সময় নষ্ট করল না কিশোর। দ্রুত গিয়ে দরজা খুলে দিল।

'খাইছে! ঢুকেছ তাহলে?' ঢুকতে ঢুকতে বলল মুসা।

'না, ঢুকিনি এখনও,' রসিকতা করল কিশোর। 'কার্নিশ থেকে পড়ে মরে গেছি। আমার ভূতকে দেখছ এখন।'

'আবার ভূতের কথা আসছে কেন...' পলকে নার্ভাস হয়ে গেল মুসা। ফিরে তাকিয়ে রবিন আর জিনাকে ডাকল। 'এই জলদি ঢোক। কেউ দেখে ফেললে মুশকিল হবে।'

'হ্যাঁ, এস, কুইক!' ডাকল কিশোর। 'দাঁড়াও দাঁড়াও, রবিন, তুমি রাফিকে নিয়ে বাইরে থাক। কাউকে আসতে দেখলে শিস দেবে।'

'শিস? ঠিকমত পারি না তো। আওয়াজ হয় না।'

'তাহলে গান গেয়ে উঠবে।'

'কি গান?'

'দূর! সেটাও বলে দিতে হবে নাকি? এবার ফিরে গিয়ে ভালমত শিস প্র্যাকটিস করবে, গোয়েন্দাদের দরকার হয়। ইয়ে, থাকগে গান-টান বাদ দাও।'

'তাহলে কি করব?'

'কাউকে দেখলে কেশে উঠবে, জোরে। আর সেটিকে দেখলে নাক ঝাড়বে...ঠিক আছে? থাক। আমরা কাজ সেরে ফেলি গিয়ে, দেরি হয়ে যাচ্ছে...'

রবিন আর রাফিয়ানকে বাইরে পাহারায় রেখে দরজা বন্ধ করে দিল কিশোর। ভেতর থেকে টিপে নবের তালা লাগিয়ে দিল।

'এবার কী?' ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ব্রীফকেসের ভেতরে কি আছে, দেখি আগে,' জবাব দিল কিশোর।

খুঁজতে হল না, দেখা গেল ব্রীফকেসটা। হঠাৎ করে ঘুমিয়ে পড়েছেন প্রফেসর, বিছানার পাশের টেবিলে রেখেছিলেন, ওখানেই পড়ে আছে ওটা।

'ব্রীফকেসটা নিতে পারি,' নিজেকেই যেন বলল কিশোর। 'কিন্তু চোরেরা আমাদের হাতে দেখলে কেড়ে নেবে। কি করা যায়?' বলতে বলতে মুসার দিকে তাকাল।

'আমি কি জানি?' দু'হাত উল্টাল মুসা।

'দেখি কি করা যায়।' টেবিলের কিনারে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। ব্রীফকেসের ডালা তুলল। ভেতরে একগাদা কাগজ। নানারকম নকশা, দুর্বোধ্য লেখা আর অঙ্ক। কিছুই বুঝল না সে। বোঝার চেষ্টাও করল না।

'কী সব লেখা! আর কি করে যে বোঝে!' বিড়বিড় করল মুসা।

'কিশোর, কাগজগুলো বের করছ কেন?' বলে উঠল জিনা, 'কি করবে?'

'দেখই না, কি করি? এস, হাত লাগাও। মুসা, তুমিও এস। জিনা, এগুলো ধর,' কাগজগুলো জিনার হাতে গুঁজে দিল কিশার। 'মুসা, আমি এদিক থেকে ধরছি। তুমি ওদিক দিয়ে যাও। প্রফেসরকে উঁচু করে ধরতে হবে।'

'কিন্তু করবেটা কি?' মুসাও অবাক।

'আরে এত অস্থির হচ্ছ কেন? দেখই না। যা বললাম, কর।'

দু'দিক থেকে প্রফেসরের পিঠের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিল কিশোর আর মুসা। বেজায় ভারি। তুলে ফেলল তাঁর শরীরের ওপরের অর্ধেকটা।

'জিনা,' বলল কিশোর। 'কাগজগুলো রেখে দাও পিঠের নিচে। জলদি।...আরে আরে, সাজিয়ে রাখ না, দুমড়ে যাবে তো। হ্যাঁ, হয়েছে।...সমান করে রাখ, যাতে পাশ দিয়ে দেখা না যায়।'

আবার আগের মত করে প্রফেসরকে শুইয়ে দেয়া হল। তাঁর পিঠের নিচে চাপা পড়ল ফরমুলা। খবর নেই ভদ্রলোকের। আগের মতই নাক ডাকিয়ে চললেন।

হাসি ঠেকাতে পারল না মুসা। 'বেচারা! কি কষ্টটাই না দিচ্ছেন আমাদের। কে বলেছিল ওই ফরমুলা বানাতে...'

'বকবক কর না তো,' থামিয়ে দিল তাকে কিশোর। 'বারোটা প্রায় বাজে, খোঁজ, খোঁজ। ম্যাগাজিন, পত্রিকা নিশ্চয় আছে। জড় কর।'

কিশোরের উদ্দেশে বুঝল না জিনা কিংবা মুসা। কিন্তু প্রশ্ন করল না। বেশি

খুঁজতে হল না। গাদা গাদা পত্রিকা আর ম্যাগাজিন পাওয়া গেল।

কিছু পত্রিকা তুলে নিয়ে ভাঁজ করতে শুরু করল কিশোর। ঢুকিয়ে রাখল প্রফেসরের শূন্য ব্রীফকেসে। হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'আমাদের দোস্ত সেটিনারকে একেবারে নিরাশ করতে চাই না। এত কষ্ট করে আসবে ব্রীফকেসটা নিতে কিছু অন্তত নিয়ে যাক। কাসনার দেখে যদি তার কান ডলে লাল না করে ফেলে তো আমার নাম কিশোর পাশা নয়।' হাসল। 'সত্যি বলছি, ওর জন্যে খুব দুঃখ লাগছে। হি-হি!'

কিশোরের দুঃখ পাওয়া দেখে মুসাও হেসে ফেলল। 'কসম খোদার, কিশোর, পত্রিকাগুলো পেয়ে ব্যাটাদের চেহারা যা হবে না, যদি দেখতে পারতাম...'

'ঠিক,' জিনাও হাসছে। 'যদি পারতাম!'

'আমার দেখতে ইচ্ছে করছে প্রফেসরের চেহারা,' হেসে বলল কিশোর। 'উঠে ব্রীফকেসটা দেখবেন না। তারপর আবিষ্কার করবেন, তাঁর পিঠের তলায় চলে গেছে সমস্ত ফরমুলা। কি করবেন?'

'কি আর করবেন?' মুসা বলল। 'আবার গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বেন ওগুলোর ওপর। ভুঁড়ি দিয়ে ঢাকবেন...'

তার কথা শেষ হল না। ঢং ঢং করে উঠল ঘড়ির ঘন্টা। বারোটা বাজে।

'মাঝরাত!' জরুরী কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর। 'চল, ভাগি। সেটি এসে পড়বে।' ব্রীফকেসটা বন্ধ করে আবার আগের জায়গায় রেখে দিয়ে দরজার দিকে দৌড় দিল।

নিচতলার বলরুমে তখন হাসাহাসি আর হৈ-চৈ চরমে উঠেছে। আলো নিভে গেছে। তুষারমানবের পোশাক পরা ছোট্ট নিকার তার বোনের হাত আঁকড়ে ধরেছে। 'আপা! আমার ভয় করছে!' ফিসফিস করে বলল সে।

'দূর বোকা। ভয়ের কি আছে? এখন মুখোশ খুলব আমরা। খোল।'

'যা অন্ধকার! কিছুই দেখছি না।'

'এই পাঁচ মিনিট। তারপরই আলো জ্বেলে দেবে। দেখবে, সবারই মুখোশ খোলা, তখন চিনতে পারব সবাইকে।'

হাসাহাসি চলছে। মুখোশ খুলছে যার যার। নিজের মুখোশ খুলে ভাইয়েরটা খুলে দেয়ার জন্যে হাত বাড়াল মারিয়া। কিন্তু কোথায় নিকার? কিভাবে যেন আলাদা হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে ভিড়ের মধ্যে। ভয় পেল মারিয়া। চেঁচিয়ে ডাকল, 'নিক! নিক!'

হট্টগোলে ঢাকা পড়ে গেল তার চিৎকার। ভাইয়ের কানে পৌঁছল না।

অন্ধকারে নিকারও ভয় পেয়ে গেছে। আলোকিত লবি দেখে ছুটে গেল সেদিকে। বোনের নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকছে, 'মেরিআপা! মেরিআপা!...'

ঘন্টার প্রথম বাড়িটা পড়তেই কাজ শুরু করে দিল সেটি।

সেই বিকেল থেকে অধীর হয়ে আছে, অপেক্ষা করছে, কখন আসবে মধ্যরাত। ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে দূরে দূরে থেকেছে। পরনে ডোমিনো-ঢোলা আলখেল্লার মত পোশাক, পরনের আসল পরিধেয় ঢেকে রাখার জন্যে অনেক সময় ব্যবহার করে লোকে। জোগাড় করে দিয়েছে কাসনার। ডোমিনোর নিচে পরেছে ওয়েইটারের কালো প্যান্ট, ডোরাকাটা ওয়েস্টকোট, পায়ে নরম জুতো। হোটেলে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে নিঃশব্দে চলাফেরার জন্যে এটাই সব চেয়ে উপযুক্ত পোশাক।

আলো নিভে যেতেই ডোমিনো খুলে ফেলল সেটি। মুখে কালো মুখোশ পরেছিল, একটানে খুলে ফেলল ওটাও। প্রায় দৌড়ে চলল। সিঁড়ির কাছে পৌঁছেও গতি কমাল না। একেক লাফে কয়েকটা করে ধাপ ডিঙিয়ে উঠে এল দোতলায়।

সতর্কই ছিল রবিন, আরও সতর্ক হয়ে গেল। বিপদের মুহূর্ত উপস্থিত। নিচে প্রচণ্ড কোলাহল। হোটেলের ঘড়িতে বারোটার ঘন্টা বাজছে। নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল সে।

'রাফি!' বিড়বিড় করে বলল। 'ওরা করছে কি?' কুকুরটাকে নয়, আসলে নিজেকেই প্রশ্নটা করল রবিন। 'এত দেরি করছে কেন?'

হালকা পদশব্দ কানে আসতেই ঝট করে ফিরে তাকাল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে কে যেন? মুখটা দেখেই চিনতে পারল, সেটি! ফ্যাকাসে হয়ে গেল রবিন।

মৃদু গররর করে উঠল রাফিয়ান।

সেটি চলে এসেছে! ওদেরকে হুঁশিয়ার করে দেয়া দরকার। জোরে নাক ঝাড়ল রবিন।

ভেতর থেকে শুনতে পেল কিশোররা। প্রফেসর নাক ডাকিয়েই চলেছেন। দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল তিনজনে। কান খাড়া। বাইরে কি হচ্ছে শোনার জন্যে।

আবার নাক ঝাড়ল রবিন। আগের বারের চেয়ে জোরে। জরুরী কোনও মেসেজ দিতে চাইছে।

নিশ্চয় সেটি, ভাবল ভেতরের তিনজন। দরজার কাছে থাকা আর নিরাপদ নয়। ছুটল আবার ঘরের ভেতরে। 'কুইক!' বলল কিশোর। 'বাথরুমে!'

বেডরুমের লাগোয়া বাথরুমে ঢুকলো ওরা। দরজাটা লাগিয়ে দিল মুসা।

'উঁহু, ফাঁক করে রাখ,' কিশোর বলল। 'দেখব।'

বাইরে, করিডরে, সেটিকে দেরি করিয়ে দেয়ার সব রকম চেষ্টা চালাল রবিন।

সিঁড়িতে থেকেই রবিনকে দেখেছে সেটি, চিনতে পারেনি, বিরক্ত হয়েছে। এখানে এই সময়ে কাউকে আশা করেনি। ভেবেছিল, একেবারে নির্জন পাবে। মুখোশও খুলে ফেলেছে। থামল না তাই। মুখ ঘুরিয়ে সোজা এগিয়ে গেল ঝাড়ু রাখার তাকের দিকে। ভাবল, তাকে চিনতে পারবে না।

রবিনও এমন ভাব দেখাল, যেন চিনতে পারেনি। ঝুঁকে কি যেন খুঁজতে লাগল।

'দূর, কোথায় ফেললাম?' রাফিকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'এই দেখ্ না, কলমটা কোথায়?...এই যে, পেয়েছি।'

কলমটা তুলে নিয়ে মুছল। ধীরেসুস্থে ঢুকিয়ে রাখল আবার পকেটে। রাফিয়ানের কলার ধরে টান দিল, 'চল, যাই।' কোনও তাড়াহুড়ো নেই। সিঁড়ির দিকে না গিয়ে আস্তে আস্তে এগোল লিফটের দিকে। বোতাম টিপল।

লিফট এল। দরজা খুলল। যেন সব দোষ রাফিয়ানের, তাড়াতাড়ি করছে না বলে তাকে ধমকাল রবিন। ঢুকে পড়ল লিফটে।

চোখের কোণ দিয়ে চেয়ে সবই দেখল সেটি, আর মনে মনে চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করল 'ছেলেটা' আর কুকুরটার। লিফটের দরজা বন্ধ হতেই দিল দৌড়। যতটা সময় নষ্ট হয়েছে সেটা পুষিয়ে নেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করল। ছুটে এসে দাঁড়াল একশো চার নম্বর দরজার সামনে। পকেট থেকে মাস্টার কী বের করে ঢুকিয়ে দিল তালার ফোকরে।

দরজা খুলল।

বাথরুম থেকে, দরজার ফাঁক দিয়ে 'ওয়েইটারকে' ঢুকতে দেখল কিশোর। মুসা আর জিনাও দেখল।

'সেটি হারামজাদা!' ফিসফিস করে গাল দিয়ে উঠল মুসা।

'মরুক!' বলল জিনা।

ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে আবার তালা লাগিয়ে দিল সেটি। ফিরে তাকাল। প্রফেসরের দিকে চেয়ে হাসি ফুটল মুখে। 'কিছু লাগবে আপনার, স্যার?' ওয়েইটারের সুর নকল করে ব্যঙ্গ করল ঘুমন্ত মানুষটাকে। 'নাকে বালিশ-টালিশ চাপা দিয়ে নিলে পারতেন, স্যার, তাহলে শব্দ কিছু কম হত। বাড়ি মাথায় করে ফেলেছেন তো।'

বিছানার পাশের টেবিলে রাখা কালো ব্রীফকেসটার ওপর চোখ পড়ল তার।

'বাহ্, ওই তো,' এগিয়ে গেল সে। 'আপনি বড্ড বেখেয়াল, স্যার। জিনিসপত্র রাখতে জানেন না। আরও হুঁশিয়ার হওয়া উচিত ছিল। এত দামী কাগজপত্র এভাবে ফেলে রাখে কেউ? বড় ভুলো মন আপনার, স্যার।'

ব্রীফকেসটা টেনে নিল সেটি।

তালা খুলবে না তো?--ভাবল মুসা। ভেতরে সাধারণ পত্রিকা দেখে কি প্রতিক্রিয়া হবে? কিশোরের মুখের দিকে তাকাল সে।

মুচকি হাসল গোয়েন্দাপ্রধান। ফিসফিস করে বলল, 'পারবে না। তালা লাগিয়ে দিয়েছি। চাবি আমার পকেটে।'

তালা খোলার চেষ্টা করল সেটি কয়েকবার, পারল না। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে মুখ বাঁকাল। অর্থাৎ, খুললে খুলুক না খুললে নাই। খোলাটা আমার কাজ নয়, আমার দায়িত্ব শুধু ব্রীফকেসটা নিয়ে গিয়ে কাসনারের হাতে তুলে দেয়া।

ঘর থেকে বেরোনোর জন্যে পা বাড়িয়ে থেমে গেল সেটি। বেশি কথা বলা স্বভাব। ঘুমন্ত প্রফেসরকে শেষবারের মত টিটকারি মারার লোভ সামলাতে পারল না। 'এত চালাক একজন লোক এত বোকা হয় কি করে বুঝি না! আপনি কি গর্দভ নাকি, স্যার? আসলে দুনিয়ার সব বিজ্ঞানীই এক ধরনের বোকা গাধা!'

রাগে জ্বলে উঠল জিনা। ঘরে ঢোকার পর থেকেই প্রফেসরকে টিটকারি দিয়ে চলেছে সেটি, এটা সহ্য হচ্ছিল না তার। অনেক কষ্টে দাঁতমুখ খিঁচে চুপ করে থেকেছে কোনমতে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে সেটির কুৎসিত মন্তব্য শুনে আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারল না, কারণ জিনার বাবাও একজন বিজ্ঞানী। কিশোর কিংবা মুসা বাধা দেয়ার আগেই ঝটকা দিয়ে খুলে ফেলল দরজা। 'কুত্তার বাচ্চা!' বলে গাল দিয়ে উঠে ঝড়ের বেগে ছুটে গেল সেটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে।

আট

পাথর হয়ে গেছে যেন সেটি।

কিন্তু মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই নড়ে উঠল। এক লাফে সরে গেল জিনার সামনে থেকে। তারপর ব্রীফকেসটা বগলদাবা করে ঘুরে দৌড় দিল দরজা থেকে।

তাকে ধরার জন্যে পেছন থেকে বাঘের মত লাফ দিল জিনা। নিশানা ঠিক রাখতে পারল না, দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। আবার যখন উঠে দাঁড়াল, সেটি চলে গেছে।

ছুটে বেরোল কিশোর আর মুসা। দরজার নব ঘোরানোর চেষ্টা করল কিশোর,

ঘুরল না ওটা। বেরিয়ে গিয়ে পাল্লা বন্ধ করে রেখে গেছে সেটি, আর নিশ্চয় মাস্টার কী-টা ঢোকানো রয়েছে ফোকরে, তাড়াহুড়োয় নিয়ে যেতে মনে নেই। তাহলে ভেতর থেকে কিছুতেই খোলা যাবে না আর নবের তালা, এমনকি রুমের চাবি দিয়েও নয়। তারমানে পড়ল আটকা! ইতিমধ্যে সহজেই পালিয়ে যাবে সেটি।

কিন্তু ওদের ধারণা ভুল। সহজে পালাতে পারল না সেটি। লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পড়ল রবিনের খপ্পরে।

লিফট থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে চলে এসেছে রবিন। যদি কিছু ঘটে, আর তার সাহায্য দরকার পড়ে, সেকথা ভেবে। দেখল, একটা ব্রীফকেস—নিশ্চয় প্রফেসরের—বগলদাবা করে নিয়ে পালাচ্ছে সেটি।

রবিন ভাবল, কোনও কারণে ব্যর্থ হয়েছে কিশোররা। সেটি ব্রীফকেসটা হাতিয়ে নিয়েছে। ওকে থামাতে হবে, তাড়াতাড়ি। কিন্তু কিভাবে?

গায়ের জোরে পারবে না। সঙ্গে রাফিয়ানও নেই। ও রয়েছে নিকারের কাছে। অন্ধকারে বোনের কাছ থেকে আলাদা হয়ে লবিতে চলে এসেছে নিকার, ওকে ওখানে পেয়েছে রবিন, একা থাকতে চায়নি ছোট্ট ছেলেটা। তাই কুকুরটাকে তার কাছে রেখে এসেছে সে।

বেশি ভাবনার সময় নেই। একটানে কোমরে ঝোলানো তলোয়ার খুলে নিল। লাঠির মত করে বাড়িয়ে ধরল সেটির পায়ের সামনে।

অবাক হল সেটি। শেষ মুহূর্তে থামার চেষ্টা করল, পারল না। কাঠের তলোয়ারে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সিঁড়ির ধাপ থেকে একেবারে মেঝের ওপর। কিন্তু ব্যাগ ছাড়ল না। কোনমতে উঠে দাঁড়াল আবার।

এবার কি করবে? ভাবনায় পড়ে গেল রবিন। রেলিঙের নিচে দিয়ে তলোয়ারটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল, বের করে নিল আবার। বাড়ি মারবে মাথায়? তাতে কিছু হবে বলে মনে হয় না।

কিছু হত কিনা, মারতে পারলে বোঝা যেত, কিন্তু সেই সুযোগই পেল না রবিন। আগেই দৌড় দিল সেটি।

তবে তার দুর্ভাগ্য তখনও শেষ হয়নি। সদর দরজার কাছে গিয়ে কি মনে হতে ফিরে তাকাল। দেখল, চারপেয়ে একটা অদ্ভুত জানোয়ার গরগর করতে করতে ছুটে আসছে তার দিকে।

চিৎকার করে উঠল তরুণ গুপ্তচর। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। আতঙ্কিত হয়ে দেখছে, কুকুরের মত শরীর আর কিম্ভূত বানরের মত মুখওয়ালা জীবটাকে।

বেশি ভয় পেয়ে যাওয়ায় ঠিকমত কাজ করছে না সেটির ব্রেন। ফলে বুঝতে

পারল না, ওটা কুকুর, মুখে মুখোশ পরিয়ে দেয়া হয়েছে। নিকারের কাজ। খেলাচ্ছলে তুষার মানবের মুখোশটা খুলে পরিয়ে দিয়েছে রাফিয়ানের মুখে। ভেড়ার মুখোশ পরে থাকার সময় চোখের কাছে ফুটো ছিল, দেখতে পাচ্ছিল রাফিয়ান, তাই সহজভাবে নিয়েছিল। ওটা খুলে অন্য মুখোশ পরানোতে চোখ বন্ধ হয়ে গেছে, আর দেখতে না পেলে আতঙ্কিত হয়ে যায় সে। তা-ই হয়েছে এখন। সেটির ওপর হামলা চালাতে নয়, মুখোশটা খোলার জন্যেই পাগল হয়ে ছোটাছুটি শুরু করেছে।

প্রথম চমকটা কেটে যেতেই সেটিও সেটা বুঝতে পারল। পাশে সরে দাঁড়াল। ছুটে চলে গেল কুকুরটা। ব্রীফকেসটা নিয়ে বেরিয়ে চলে এল সেটি, পথে। নানা ঝামেলায় অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেলেছে।

আর এই সময়ের সদ্ব্যবহার করল কিশোর। যে-ই বুঝল দরজা দিয়ে বেরোনো যাবে না, দৌড় দিল জানালার দিকে, যেখান দিয়ে ঢুকেছিল। চৌকাঠ ডিঙিয়ে আবার অন্ধকার কার্নিশে নামল। তার জানা আছে, কাসনার গাড়ি পাঠাবে, সেটা দাঁড়িয়ে থাকবে হোটেলের সদর দরজার কাছে। তাতে করেই পালাবে সেটি।

কার্নিশ বেয়ে পাশে সরে যাচ্ছে কিশোর। পথের ওপর চোখ। যে কোনও মুহূর্তে এখন বেরিয়ে আসবে সেটি। ক্যাট বার্গলারের কালো পোশাক পরেছে বলে আরেকবার ধন্যবাদ দিল ভাগ্যকে। কাজে লাগছে এখন এই কালো কাপড়।

আরও কয়েক পা সরে নিচে তাকাল সে। বাথরুমের জানালা দিয়ে গিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে, সদর দরজা দিয়ে বেরোতে বেরোতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ততক্ষণে নাগালের বাইরে চলে যাবে সেটি।

দ্রুত মনস্থির করে নিল কিশোর। মাটি বেশি নিচে না। চোখ বন্ধ করে দিল লাফ। নিরাপদেই নামল মাটিতে। স্কুলের জিমনেশিয়ামে শেখানো হয়, কিভাবে উঁচু জায়গা থেকে লাফ দিতে হয়। দিয়েই কিভাবে ঝাঁকুনি এড়ানোর জন্যে পা ভাঁজ করে ফেলতে হয়। তা-ই করল সে, তবু কিছুটা ঝাঁকি লাগলই।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকাল আবার পথের দিকে। এত রাতে নির্জন।

গ্লাস ডোরের ওপাশে দেখা গেল সেটিকে। লবিতে। কি যেন দেখে থমকে গেছে।

জানোয়ারটাকে কিশোরও দেখল। 'আরি! রাফিকে ওই মুখোশ পরাল কে?' অবাক হয়ে ভাবল সে। 'যাক, ভালই হয়েছে। ভয় পাইয়ে দিয়েছে সেটিকে।'

কয়েক সেকেণ্ড সময় মিলল। সুযোগটা পুরোপুরি নিল কিশোর। ঘুরে তাকাল, যেখানে গাড়ি পার্ক করে রাখার কথা। কয়েকটা গাড়ি আছে, তার মাঝে কালো রঙের দুটো। দৌড়ে এগোল। কাছে যেতেই শুনল, একটার এঞ্জিন চালু। নিশ্চয়

ওটা। ভুল হওয়ার উপায় নেই। কাসনার বলেই দিয়েছে, গাড়ির এঞ্জিন চালু রাখবে।

বেশ বড় গাড়ি। পেছনে চকচকে ক্রোমিয়ামের লাগেজ র‍্যাক। তাতে গুটিসুটি হয়ে লুকিয়ে থাকতে পারবে কিশোর। ড্রাইভার চেয়ে আছে হোটেলের দরজার দিকে।

নিঃশব্দে গুড়ি মেরে আরেকটা গাড়ির পাশ কাটিয়ে কালো গাড়িটার পেছনে চলে এল কিশোর। কালো কাপড় মিশে গেল গাড়ির রঙের সঙ্গে। ফিরে তাকালেও এই অন্ধকারে এখন তাকে দেখতে পাবে না ড্রাইভার।

হঠাৎ হোটেল থেকে বেরিয়ে এল সেটি। দৌড়ে চত্বর পেরিয়ে এসে ঢুকল গাড়িতে। এলিয়ে পড়ল পেছনের সীটে। বলল, 'জলদি চালান!'

চলতে শুরু করল গাড়ি।

গতি বাড়ছে। লাগেজ র‍্যাক আঁকড়ে রইল কিশোর। 'পড়ে না মরি!' ভাবল সে। 'এই অবস্থায় আমাকে দেখলে মুসারা এখন কি হাসাহাসিটাই না করত! নাহ্, থাকা যাবে না বোধহয়,' প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি লাগতে আরেকটু হলেই হাত প্রায় ছুটে গিয়েছিল তার।

শহরের বাইরে বেরিয়ে এল গাড়ি।

আরও কয়েক মাইল পর মোড় নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা বুনো অঞ্চলে। গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটল।

মনে মনে পস্তাচ্ছে এখন কিশোর। এই ঝুঁকি নেয়া উচিত হয়নি মোটেই। কি ঘটবে কে জানে! ঠাণ্ডা রাতের বাতাস, শহরের ভেতরে একরকম ছিল, এখানে অন্যরকম—বেশি ঠাণ্ডা। পরনে পাতলা কাপড়ের পোশাক। শীত করছে। অবশ হয়ে আসা আঙুল দিয়ে আরও জোরে আঁকড়ে ধরল র‍্যাক।

যেভাবেই হোক, ধরে রাখতেই হবে। পড়া চলবে না।

আর বেশিক্ষণ লাগল না। শেষ হল যাত্রা। একটা গেটে ঢুকল গাড়ি, ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগোল রুক্ষ ড্রাইভওয়ে ধরে। ঝাঁকুনি দিয়ে থামল অবশেষে একটা বাড়ির বাইরে। চাঁদ উঠেছে। ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় কেমন যেন অবাস্তব লাগল বাড়িটাকে।

গাড়ি থেকে বেরোল সেটি।

ড্রাইভার বলল, 'তুমি ভেতরে যাও। আমি বসছি। আবার তোমাকে এডিনবার্গে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে হবে।'

ব্রীফকেস হাতে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল সেটি, দরজার পাল্লা ঠেলে ঢুকে গেল ভেতরে।

খুব সাবধানে মাটিতে পা রাখল কিশোর। দ্বিধা করছে। ড্রাইভার এখন তাকে দেখে ফেললে ভীষণ বিপদ হবে। তবে এত দূর এসে বাড়ির আলোকিত জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দেয়ার লোভটাও সামলাতে পারছে না। সেটি কি করছে? কার সঙ্গে কি কথা বলছে?

ড্রাইভার এদিকে পেছন করে আছে। ফিরে চাওয়ার কোনও কারণ নেই। 'ফরচুন ফেভারস দ্য বোল্ড' বলে নিজেকে সাহস জোগাল কিশোর। নিচু হয়ে, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে পিছিয়ে এল গাড়ির কাছ থেকে। তারপর ঘুরে দূর দিয়ে এগোল জানালাটার দিকে।

জানালার কাছে পৌঁছল, ড্রাইভারের চোখ এড়িয়ে। আস্তে চৌকাঠের ওপরে মাথা তুলে উঁকি দিল ভেতরে। দেখে অবাক হল, যে লোকটা বসে আছে ঘরে সে কাসনার নয়, অন্য একজন। সুন্দর করে ছাঁটা চুল, উজ্জ্বল চোখে কেমন এক ধরনের শীতল কাঠিন্য, বসে আছে সেগুন কাঠে তৈরি একটা ডেস্কের ওপাশে। তার মুখোমুখি চেয়ারে বসেছে সেটি।

দু'জনেরই চেহারা দেখতে পাচ্ছে কিশোর।

জানালার কাচের শার্সি সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। ফলে ভেতরের কথাবার্তা বেশ স্পষ্টই কানে এল। আর বলছেও ইংরেজিতে।

'পারলে তাহলে,' বলল লোকটা। 'ভাল। দেখি ভেতরটা।'

'তালা লাগানো, স্যার,' সেটি বলল। 'ভাঙতে হবে।'

নীরবে একটা কাগজ-কাটা ছুরি তুলে নিল লোকটা। চোখা মাথাটা তালার ফুটোয় ঢুকিয়ে জোরে মোচড় দিতেই খুলে গেল তালা।

ডালা ফাঁক করে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল লোকটা। বের করে আনল একগাদা পুরনো খবরের কাগজ।

দেখে হাঁ হয়ে গেল সেটি। বড় বড় হয়ে যাচ্ছে চোখ।

স্পষ্ট দেখল কিশোর, লোকটার চোয়াল কঠিন হয়ে গেল। টেবিলে ছড়িয়ে দিল কাগজগুলো। রাগে জ্বলে উঠল শীতল চোখের তারা।

'এই তোমার ফরমুলা?' কণ্ঠস্বর বদলে গেছে লোকটার, শুনলে ভয় লাগে এখন। 'এগুলো আনতে বলা হয়েছে?'

আরেক দিকে মুখ ফিরিয়েছে সেটি। বোঝা যাচ্ছে না তার চেহারা কেমন হয়েছে। আবার যখন এদিকে ফিরল, দেখা গেল, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এক বিন্দু রক্ত নেই যেন মুখে। তোতলাতে শুরু করল, 'আ-আমি…! রকেটের ফরমুলা কোথায়…'

'সে-কথাই তো আমি জানতে চাইছি? ফরমুলা কোথায়? কি করেছ?…দেখ

ছেলে, বেঈমানীর ফল ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।'

'না না, স্যার, বেঈমানী করছি না। কসম! আমি ব্রীফকেসটা খুলেও দেখিনি!'

আতঙ্কিত সেটির মুখের দিকে চেয়ে ভাবছে লোকটা। রাগ কমল না। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল চেয়ার থেকে। ডেস্কের পাশ ঘুরে এসে থামল সেটির সামনে। হাত বাড়িয়ে তার ওয়েস্টকোটের কলার চেপে ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল।

'কি করে কথা আদায় করতে হয়, জানা আছে আমার!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'নিশ্চয় কোনও গাধামি করেছ, জেনে গেছে কেউ। আমাদের প্ল্যান ফাঁস হয়ে গেছে। জলদি বল, কি করেছ? এমনিতেই তা বেশি কথা বল...'

'বিশ্বাস করুন, স্যার, আমি কিচ্ছু করিনি!' সেটির কণ্ঠে আতঙ্ক। 'কারও কাছে কিচ্ছু বলিনি। ঘুণাক্ষরেও না। কি করে যে...হয়ত...হয়ত...'

থেমে গেল সেটি।

'হয়ত কি? জলদি বল,' ধমক দিল লোকটা।

'ব্রীফকেসটা আনার সময় অনেক গোলমাল হয়েছে। মিস্টার কাসনার যতটা বলেছেন, তত সহজে পারিনি। প্রফেসর ঘুমিয়েই ছিল। কিন্তু আমি ব্রীফকেসটা নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় হঠাৎ বাথরুম থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে আমাকে মারতে ছুটে এল। ব্রীফকেসটা ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল কিনা কে জানে?'

অবাক হল লোকটা। 'মেয়ে?'

'হ্যাঁ, স্যার। চিনি ওকে। হলিডে ক্যাম্পে আমাদের সঙ্গেই থাকে। ওর সঙ্গে আরও তিনটে ছেলে আছে। তাদের একজন দাঁড়িয়ে ছিল প্রফেসরের ঘরের বাইরে, আমি যখন বারান্দায় উঠি। আমাকে দেরি করিয়ে দিয়েছিল।'

তারপর কি কি ঘটেছে, বিস্তারিত জানাল সেটি।

শুনতে শুনতে ভুরু কুঁচকে গেল লোকটার। 'হুঁ, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, কোনভাবে জেনে ফেলেছে এই খবর। কিভাবে জানল?'

'স্যার, আমার মনে হয়, ওরাও আমার মতই স্পাই। অন্য কোনও দেশের হয়ে ব্রীফকেসটা চুরি করতে এসেছিল। তবে ওদের আগেই গিয়ে আমি...'

'না। তুমি আগে যাওনি, ওরাই তোমার আগে ঢুকে বসে ছিল। আর চুরি করাই যদি উদ্দেশ্য হবে, তোমাকে দেখে বেরোত না। থাকত বাথরুমেই। তুমি ব্রীফকেস নিয়ে আসার পর ফরমুলা নিয়ে বেরিয়ে যেত। তুমি জানতেই পারতে না কিছু। আশ্চর্য...খুবই আশ্চর্য লাগছে আমার কাছে!' চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল লোকটা। তারপর বলল, 'মাসকেটিয়ারের পোশাক পরা ছেলেটা দরজা পাহারা দিচ্ছিল, না?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'আর কাউকে দেখেছ?'

'না, কেউ ছিল না। খালি বারান্দা। কোনও পোর্টারও না।'

'বেঁচেছ। দুটো ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কেউ তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারবে না। ওরা কিছু বলেও সুবিধে করতে পারবে না। ওরা বলবে করেছ, তুমি বলবে, করনি। কার কথা বিশ্বাস করবে পুলিশ? তারমানে তেমন কোনও বিপদ হচ্ছে না তোমার।'

এতক্ষণে কিছুটা স্বস্তি পেল সেটি। 'তাহলে এখন আমি কি করব, স্যার?'

'কিছু না। তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবে ড্রাইভার। সেখান থেকে ফিরে যাবে হলিডে ক্যাম্পে। সহজ, স্বাভাবিক আচরণ করবে। ওই ছেলেমেয়েগুলোর ওপর চোখ রাখবে। তবে ওরা যেন বুঝতে না পারে যে তুমি নজর রাখছ। তারপর কি করতে হবে জানাব তোমাকে।'

নয়

আর কিছু শোনার নেই।

সাবধানে আবার গাড়ির পেছনে ফিরে এল কিশোর। উঠে বসল লাগেজ র‍্যাকে।

ফিরে চলল গাড়ি। আগের চেয়ে দ্রুত গতিতে। পথে কোথাও থামল না। হোটেলের সামনে এসে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে দাঁড়াল সেটিকে নামিয়ে দেয়ার জন্যে।

একই সময়ে নামার সাহস পেল না কিশোর। চোখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে। সেটি নেমে গেল। গাড়িটা আবার চলতে শুরু করতেই লাফ দিয়ে নামল চত্বরে। সোজা থাকতে পারল না, চিত হয়ে পড়ে গেল। ব্যথা পেল, তবে হাড়টাড় কিছু ভাঙল না।

ছড়ে যাওয়া হাঁটু আর কনুই ডলতে ডলতে বলরুমের দিকে এগোল।

পুরস্কার বিতরণ করা হচ্ছে তখন। অনুষ্ঠানের এটাই শেষ পর্ব। সময় মতই পৌঁছতে পেরেছে।

এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে জিনা, মুসা আর রবিন। ওদের সঙ্গে কথা বলছে মারিয়া, নিকার, আর বব। রাফিয়ানও আছে।

কিশোরকে দেখেই দৌড়ে এল কুকুরটা।

'এই রাফি, কেমন আছিস?' মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল কিশোর। 'পুরস্কার-টুরস্কার পেয়েছিস কিছু?'

খুব উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিল এতক্ষণ রবিন, মুসা আর জিনা। বিপদেই ছিল বলা যায়। কারণ, ওরা যে উদ্বিগ্ন, এটাও বলা যাচ্ছিল না কাউকে, এমনকি চেহারাও স্বাভাবিক রাখতে হচ্ছিল, আর সেটা রাখতে বেশ কষ্টই হচ্ছিল। নীরবে কিশোরের ফেরার অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছিল না। তাকে ফিরতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

'কোথায় গিয়েছিলে, কিশোর?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আমি? ও, খোলা বাতাসে একটু দম নিতে গিয়েছিলাম। এখানে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।'

মারিয়া আর ববের সামনে খোলাখুলি বলা যাবে না। ওদের অলক্ষ্যে রবিনকে সরে আসার ইশারা করে সরে গেল কিশোর। রবিন কাছে এলে নিচু কণ্ঠে বলল, 'ক্যাম্পে ফিরে সব বলব। সেটি কোথায়?'

'ওই যে,' ইশারায় দেখিয়ে দিল রবিন। 'এইমাত্র এল। ওয়েইটারের পোশাক পরে বোঝাতে চাইছে ফ্যান্সি ড্রেসে এই সাজেই সে সেজেছে। তোমরা দু'জন ছিলে না, এটা কেউ খেয়াল করেনি।'

'ভালই হয়েছে।'

রবিনকে নিয়ে আবার আগের জায়গায় সরে এল কিশোর। এমনভাবে কাজটা করল দু'জনে, মারিয়া কিংবা বব কিছুই সন্দেহ করল না।

বার বার এদিকে তাকাচ্ছে সেটি। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। ওরা সরাসরি তার দিকে তাকালেই ঝট করে আরেক দিকে তাকাচ্ছে।

'সন্দেহ করছ আমাদের, মিয়া,' মনে মনে হাসলো কিশোর। 'লাভ হবে না। তোমার কীর্তি সবই জানা হয়ে গেছে আমার।'

পরিস্থিতিটা বেশ মজার। সেটির ধারণা—জিনা আর রবিন জানে, সে চোর এবং স্পাই। আর একথাটা এখন শুধু কিশোর জানে, অন্য তিনজনকে জানানর সুযোগ পায়নি। সেটি ভেবে অবাক হচ্ছে, ছেলেমেয়েগুলো কে? তার মতোই স্পাই? কাউন্টার স্পাই? কিশোর ছাড়া বাকি তিনজনও অবাক। সেটি ফেরার পর থেকেই দেখছে, কেমন করে জানি তাকাচ্ছে তাদের দিকে! আর এমন ভাবে এসে মিশে গেল পার্টির সঙ্গে, যেন কিছুই ঘটেনি।

পুরস্কার বিতরণী শেষ হল।

প্রায় সবাই কিছু না কিছু পেল। পার্টি শেষ। ক্যাম্পে ফেরার পালা। হুড়োহুড়ি করে এসে বাসে উঠল ওরা।

অনেক রাত হয়েছে। ফেরার পথে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়ল।

ক্যাম্পে ফিরে বাস থেকে নেমেই সোজা চলে গেল যার যার তাঁবু কিংবা

কুঁড়েতে, তারপর বিছানায়, সবাই, তিন গোয়েন্দা আর জিনা বাদে।

কুঁড়েতে ঢুকে সব কথা খুলে বলল কিশোর।

'এই কাণ্ড!' কিশোরের কথা শেষ হলে বলল রবিন। 'পুরো এক ঝাঁক স্পাইয়ের বাসা!'

'সেটি মিয়া তাহলে এখন আমাদের ওপর চোখ রাখবে,' হাসল মুসা। 'রাখুক। দেখবে, খালি বদনা নিয়ে বাথরুমে যাচ্ছি আর আসছি আমি। পার্টিতে বেশি খেয়ে ডায়রিয়া হয়ে গেছে।'

তার কথা শুনে হেসে উঠল অন্যেরাও। কিছুই না বুঝে 'হুফ! হুফ!' করল রাফিয়ান।

পরদিন সকাল থেকে সেটিকে চোখের আড়াল করতে পারল না। তিন গোয়েন্দা আর জিনা। সরতেই চায় না। এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে, যেন কি জরুরী কাজ রয়েছে।

'খুব ভাল হয়েছে,' বলল কিশোর। 'ও-ব্যাটার ওপর চোখ রাখার জন্যে আমাদের আর কষ্ট করতে হচ্ছে না। ও নিজেই নিজেকে আমাদের কাছাকাছি রাখছে। যদি কিছু করে, সহজেই দেখে ফেলব।'

'ঝামেলায় পড়েছি, একথা অস্বীকার করা যাবে না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল জিনা। সেটিকে কেয়ারও করি না আমি। কিন্তু ওর সঙ্গে বড় বড় স্পাই রয়েছে। ওই হারামজাদাগুলো যদি কিছু করে বসে? কিশোর, ব্যাপারটাকে এত হালকাভাবে নেয়া কি ঠিক হচ্ছে?'

'না, তা হচ্ছে না। আরে জিনা, ভুলেই গিয়েছিলাম! হ্যারি আংকেলকে ফোন করছি না কেন? চল, চল।'

ক্যাম্প অফিস থেকে মিডলোদিয়ান হোটেলে ফোন করল জিনা। 'হ্যালো। আমি মিস জরজিনা পারকার। মিস্টার হ্যারিসন পারকারকে দিন, প্লীজ।...হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তাঁর মেয়ে।' নীরবতা। বন্ধুদের দিকে চেয়ে হেসে চোখের ইশারা করল জিনা। অর্থাৎ, বাবা ফিরেছে। 'হ্যাল্লো, বাবা, আমি জিনা। কাল কেমন কাটালে? ...কাল সকালে ফোন করেছিলাম তো। রিসিপশনিস্ট বলল তোমরা বাইরে চলে গেছ। ...রাতেই খবর পেয়েছ?...হ্যাঁ হ্যাঁ, মুসা আমান হীরো হয়ে গেছে, সেই সাথে আমরাও। বাবা, একটা জরুরী কথা বলার জন্যে ফোন করেছি। সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেছে। তোমার সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলা দরকার। এখানে আসতে পারবে?'

এই সময় একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল জিনার। ফিরে চেয়ে দেখল, সেটি। কথা শুনছে। রাগে জ্বলে উঠল জিনা। গাল দিতে গিয়েও অনেক কষ্টে সামলে নিল

নিজেকে।

'বাবা, শোন,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল জিনা, 'মাকে নিয়ে এস। মনে হচ্ছে কত যুগ তোমাদের দেখি না। আসতে পারবে তো?'

জিনার কণ্ঠের এই হঠাৎ পরিবর্তন ধরতে পারলেন না মিস্টার পারকার। ভাবলেন, এমনিই আসতে বলছে জিনা। আগুন লাগার কথাই সব খুলে বলতে চায়। 'না, এখন তো পারব না, খুব ব্যস্ত। তা হঠাৎ করে আমাদেরকে দেখার এত শখ হল কেন তোর? কচি খুকি তো আর ন'স, বোঝা উচিত, আমি ব্যস্ত। অনেক কাগজপত্র রেডি করতে হবে। সম্মেলনের জন্যে তৈরি হতে হবে না? রাখি এখন। গুডবাই।'

লাইন কেটে গেল।

সমস্ত রাগ গিয়ে সেটির ওপর পড়ল জিনার। কড়া চোখে একবার সেদিকে তাকিয়ে গটমট করে বারান্দা থেকে নেমে কুঁড়ের দিকে এগোল।

'কি হল?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'হঠাৎ রেগে গেছ?'

'সেটি হারামজাদার জন্যেই পারলাম না।' বাবার সঙ্গে কি কথা হয়েছে জানাল জিনা। 'ভাবছি, মারিয়াকে সব বলে তাকে দিয়ে একবার ফোন করাব বাবাকে। তার ওপর চোখ রাখবে না সেটি।'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আর কাউকে বলা উচিত হবে না। মারিয়া কথা পেটে রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে আমার। ক্যাম্পের সবাইকে জানিয়ে দেবে। স্পাইগুলো তখন হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। আর ধরা যাবে না ওদেরকে।'

'তাহলে হ্যারি আংকেলকে চিঠি লেখা যাক,' পরামর্শ দিল মুসা।

'সেটাও ঠিক হবে না,' বলল কিশোর। 'নিশ্চয় এডিনবার্গে এখন গুপ্তচরে ছেয়ে গেছে, নানান দেশের স্পাই। নিজেদের বিজ্ঞানী, অন্য দেশের বিজ্ঞানী, সবার ওপর চোখ রাখছে ওরা। কারও কাছে কোনও চিঠি গেলে, ওদের চোখ এড়িয়ে যেতে পাবে কিনা সন্দেহ। হয়ত রুমে রুমে গোপন মাইক্রোফোন লাগিয়ে রেখেছে। টেলিফোন লাইন টেপ করে রেখেছে। জিনাকে দিয়ে ফোন করিয়েই ভুল করলাম হয়ত! জিনার ফোনের মানে ওরা বুঝে গিয়ে থাকলে ভয়ানক বিপদে পড়ব আমরা।'

'কি করব তাহলে?' প্রশ্ন করল রবিন।

'প্রথম কথা, নোট বা চিঠি পাঠাতে পারব না। ফোনেও কিছু বলা যাবে না। দেখা করতে গেলে, পিছে পিছে যাবে সেটি। সন্দেহ বাড়বে তার বসদের। হয় পালাবে, নয় লুকিয়ে পড়বে। পুলিশ আর ধরতে পারবে না। তার চেয়ে যা করছি, তাই করি। চুপ করে থাকি। সেটি আমাদের ওপর চোখ রাখতে থাকুক, আমরা

তার ওপর চোখ রাখি। তারপর দেখা যাক, কি হয়?'

হাসল মুসা। 'বোঝা যাচ্ছে, স্পাই ধরার সমস্ত কৃতিত্ব তুমি নিতে চাইছ।'

'সুনাম কি আমার একলা হবে নাকি? তোমাদের হবে না?'

পরের দুটো দিন আর কিছু ঘটল না।

অস্বাভাবিক কিছু করল না সেটি। তিন গোয়েন্দা আর জিনাও কিছু করল না। সেটির অবাক লাগছে, জিনা কিংবা রবিন তাকে কিছু বলে না কেন? সেরাতে তো তাকে মারার জন্যে খেপে গিয়েছিল মেয়েটা? তবে কি ওরাও তার ওপর চোখ রাখছে? যতই ভাবল, তার মনে হল, হ্যাঁ, সেটাই স্বাভাবিক। ওরা কোনও দেশের গুপ্তচর, তাতে কোনও সন্দেহ নেই এখন তার।

তারপর, তৃতীয় দিন সকালে ক্যাম্পে ডাইনিং রুমে যেন একটা বোম ফাটানো হল তিন গোয়েন্দা আর জিনার জন্যে। রেডিও বাজছে। মিউজিক শেষে শুরু হল খবর।

স্থানীয় খবর পড়তে লাগল নিউজরীডারঃ রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়েছেন আমেরিকার বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর হেনরি স্পাইসার। এবারকার এডিনবার্গ সায়েন্স কনফারেন্সে যোগ দিতে এসেছিলেন তিনি। তাঁকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। সম্মেলনে যাওয়ার জন্যে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সি ডাকেন প্রফেসর। এই সময় বড় কালো একটা ট্যাক্সি এসে থামল তাঁর পাশে। দু'জন লোক বেরিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে লোকজনের চোখের সামনে তাঁকে ধরে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে যায়।

খবর শুনে থ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা আর জিনা। খাওয়া থামিয়ে দিল।

পড়ে চলেছে নিউজরীডারঃ তিন রাত আগে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে প্রফেসরের ঘরে। ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। ঘুম থেকে উঠে দেখেন, তাঁর ব্রীফকেসটা নেই। তাতে মূল্যবান কাগজপত্র ছিল। পুলিশকে ফোন করলেন। পরে দেখেন, তাঁর বিছানায় পড়ে আছে কাগজগুলো, ওগুলোর ওপরেই ঘুমিয়েছিলেন ব্রীফকেসটা এখনও উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।

অন্য টেবিলে বসা সেটির দিকে আড়চোখে তাকাল কিশোর। স্পাইটাও কান খাড়া করে খবর শুনছে।

একে অন্যের দিকে তাকাল গোয়েন্দারা। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। নিরাপদে কথা বলার জন্যে কুঁড়েতে চলল।

দশ

'শেষতক,' বলল রবিন। 'কিডন্যাপই করে ফেলল!'

'খবর শুনেই বোঝা যাচ্ছে,' মুসা বলল। 'পুলিশ আর প্রেস কিচ্ছু জানে না। কারা কিডন্যাপ করেছে, কেন করেছে···কিশোর, আর দেরি করা ঠিক না। পুলিশকে গিয়ে সব জানানো দরকার।'

'কি হবে জানিয়ে?' প্রশ্ন তুলল কিশোর। 'কি প্রমাণ আছে আমাদের কাছে? সেটিকে ধরে যদি জিজ্ঞেস করেও, সব কিছু অস্বীকার করবে সে। আর কিছু করার আছে তখন পুলিশের? তবে সেটিকে ধরবে কিনা তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। পুলিশ আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না। খবরের কাগজওয়ালাদের কাছে গিয়ে বললে ওরা হাসবে। তাতে স্পাইদের লাভ। সাবধান হয়ে যাবে ওরা। প্রফেসরকে এমন কোথাও সরিয়ে ফেলবে, আর খুঁজেই পাব না।'

অবাক হয়ে মুসা বলল, 'প্রফেসর কোথায় আছেন জান নাকি তুমি?'

'আন্দাজ করতে পারছি। আমার বিশ্বাস, বনের মধ্যে সেই বাড়িটাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। রকেটের ফরমুলার জন্যেই কিডন্যাপ করা হয়েছে। তাঁর হাতে নতুন ব্যাগ ছিল কিনা, তাতে ফরমুলা ছিল কিনা, জানি না। কিডন্যাপাররাও জানে না। তাই কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি। একেবারে ফ্যাকটরিকেই তুলে নিয়ে গেছে। ব্যাগে ফরমুলা পেলে তো ঝামেলা চুকেই গেল, আর না পেলে প্রফেসরকে দিয়ে আবার লিখিয়ে নেবে। চেষ্টা করলে নিশ্চয় নতুন করে আবার লিখতে পারবেন তিনি।'

'হ্যাঁ, ভালই বুদ্ধি করেছে শয়তানেরা,' একমত হল জিনা।

'আরও একটা ব্যাপার,' রবিন বলল। 'ফরমুলাটা যদি পায়ও, সেটা অসম্পূর্ণ থাকতে পারে। প্রফেসরকে নিয়ে যাওয়ায় বাড়তি সুবিধে পাবে। ওই জায়গাগুলো শেষ করে দিতে বাধ্য করা হবে তাঁকে।'

'কিশোর,' মুসা বলল। 'তুমি শিওর, ওই বাড়িটাতেই তাঁকে রাখা হয়েছে?'

'তাই তো মনে হয়। তবে, পুলিশকে নিয়ে যেতে পারব না ওখানে। তোমাদেরকেও না। আমি নিজেই জানি না বাড়িটার ঠিকানা। সেরাতে লাগেজ র‍্যাকে এমনভাবে ছিলাম, পড়ে না যাই সে চেষ্টা করতে করতেই অবস্থা কাহিল। পথের নিশানা রাখতে পারিনি। তাছাড়া এডিনবার্গে আমরা নতুন। পথঘাট প্রায় কিছুই চিনি না। রকি বীচ হলে অন্য কথা ছিল। কাজেই চিনে আবার ওখানে ফিরে যেতে পারব বলে মনে হয় না।'

হঠাৎ চাপা গলায় গর্জন করে উঠল রাফিয়ান। লম্বা হয়ে শুয়ে ছিল, লাফ দিয়ে উঠে দরজার দিকে দৌড় দিল। ঘেউ ঘেউ শুরু করল গলা ফাটিয়ে।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল জিনা। 'রাফি, কি হয়েছে রে?'

ততক্ষণে উঠে পড়েছে কিশোর। এক ধাক্কায় দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। তার পেছনে রাফিয়ান। বেরিয়েই তীরবেগে ছুটল ঘন হয়ে জন্মানো একগুচ্ছ গাছের দিকে। একটা মূর্তিকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখা গেল গাছগুলোর আড়ালে। পেছন থেকে শুধুমাত্র তার পরনের প্যান্ট চোখে পড়ল কিশোরের, বুঝতে পারল না ছেলে না মেয়ে।

'নিশ্চয় সেটি,' রাগে মনে মনে জ্বলে উঠল গোয়েন্দাপ্রধান। 'ওই শয়তানটা ছাড়া কেউ না। ওভাবে আড়ি পেতে আর কেউ শুনতে আসবে না। নিশ্চয় আমাদের কথা সব শুনে গেছে। দূর, এবার কপালটাই খারাপ আমাদের!'

গাছপালার ভেতরে ঢুকে পড়েছে রাফিয়ান। তার নাকই বলে দিচ্ছে, মানুষটা কোনদিকে গেছে। ধরে ফেলতে পারবে সহজেই।

কিংবা বরং বলা ভাল, পারত। কারণ, গাছগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে একটা ঝোপের দিকে দৌড় দিতে যাবে, এই সময় তার সামনে এসে দাঁড়াল একঝাঁক ছেলেমেয়ে। ঘিরে ধরল তাকে। আনন্দে চেঁচামেচি জুড়ে দিল। এই হলিডে ক্যাম্পে বাচ্চাদের খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছে রাফিয়ান।

'হাই, রাফি!' চেঁচিয়ে উঠল একজন। 'যাচ্ছিস কোথায়? আয়, পা মেলা,' হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটা।

তার কলারের বেল্ট চেপে ধরল একজন। একজন পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। আরেকজন মাথা চাপড়ে দিল।

কিশোর এসে দেখল, সেটিকে তাড়া করার কথা ভুলে বসে আছে রাফিয়ান। আনন্দে খেলা জুড়েছে।

আশপাশে স্পাইটার ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। পালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে, সময়ও।

'দূর, কপালটা এবার সত্যিই খারাপ!' আরেকবার ভাবল কিশোর।

পরের দিন ঘটল দুর্ঘটনা, অল্পের জন্যে বেঁচে গেল কিশোর।

লকের মাঝখানে বিরাট একটা ড্রাইভিং টাওয়ার আছে। ভাসমান এক ধরনের প্ল্যাটফর্ম, বিভিন্ন উচ্চতায় বেশ কায়দা করে লাগানো হয়েছে ডাইভিং বোর্ড। চমৎকার উষ্ণ আবহাওয়া। মিস্টার মারফি ঠিক করলেন, ছেলেমেয়েদেরকে সাঁতার কাটতে পাঠাবেন। ঘোষণা করে দিলেন সেকথা। টমাসকে সঙ্গে দিয়ে উৎসাহী

সাঁতারুদেরকে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

অনেকগুলো ক্যানূ জাতীয় নৌকা আছে ক্যাম্পের। ওগুলোতে করেই চলল সাঁতারুরা।

অনেকেই চলল। তাদের মধ্যে জিনা তো অবশ্যই রয়েছে, আর রয়েছে তিন গোয়েন্দা, বব, মারিয়া, আরও অনেকে।

একটা ছেলে, ড্যানিয়েল তার নাম, সেটির মত অত খারাপ না হলেও খুব একটা ভাল না। আর বেশ অহঙ্কারী। সবাইকে বলতে লাগল, কত বড় সাঁতারু সে, কত ভাল দক্ষ ডাইভার। কথাবার্তা শুনে মনে হল, সাঁতারে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন সে, অসংখ্য অলিম্পিক মেডাল বিজয়ী। যারা সাঁতার জানে না, তাদেরকে মাত্র আধ ঘন্টায় সাঁতার শিখিয়ে দেবে, এই চ্যালেঞ্জও দিয়ে বসল।

ওকে নিয়ে খানিকটা মজা করার লোভ সামলাতে পারল না মুসা। হেসে বলল, 'ড্যানি ভাই, আমরা এক্কেবারে আনাড়ি। সাঁতারের কিচ্ছু জানি না। শুধু দেখতে চলেছি। আমি আর জিনা তো জীবনে পানিতেই নামিনি। ওই কিশোর আর রবিনটাও কিছু জানে না। দয়া করে যদি শিখিয়ে দিতেন?'

'এটা আর এমন কি ব্যাপার?' তুড়ি বাজিয়ে বলল ড্যানিয়েল, 'দেব শিখিয়ে। ওই যে বললাম, আধ ঘন্টা...'

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলল সে। ওখানে ছেলেমেয়েদের ভিড়। মুসা এবং ড্যানির কথা অনেকের মত বিশেষ একজনও শুনেছে। সেটি। রহস্যময় একটা হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে। আড়চোখে তাকাল একবার কিশোরের দিকে।

এক এক করে ডাইভিং বোর্ডে উঠে গেল কয়েকজন ডাইভার।

সব চেয়ে উঁচুটাতে উঠল ড্যানিয়েল। চেঁচিয়ে বলল, 'এই যে দেখ, আমি কিভাবে কি করি? এক জাম্পে দু'বার ডিগবাজি খেয়ে পড়ব...'

ড্যানিয়েলের কীর্তি দেখার জন্যে ঠেলাঠেলি করে এল ছেলেমেয়েরা। টাওয়ারের গোড়ায় প্ল্যাটফর্মের একেবারে কিনারে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর, কয়েকটা ছেলের পেছনে। মুখ উঁচু করে ড্যানিয়েলকে দেখছে। ঠিক তার পেছনেই যে এসে দাঁড়িয়েছে সেটি, জানেও না।

যখন জানল, দেরি হয়ে গেছে। হঠাৎ কি মনে হতেই মুখ ফিরিয়ে তাকাল কিশোর। চোখাচোখি হয়ে গেল স্পাইটার সঙ্গে। সেই মুহূর্তে তাকে জোরে এক ধাক্কা মারল সেটি।

তাল সামলাতে পারল না কিশোর। প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল লকের পানিতে। কেউ খেয়াল করল না ব্যাপারটা, সবাই ড্যানিয়েলের পতন দেখছে। তার পানিতে

পড়া, আর কিশোরের পড়া, প্রায় একই সময়ে ঘটল। ফলে আওয়াজেও বোঝা গেল না কিছু।

মাথা নিচু করে পড়েছে কিশোর। পানির নিচে তেরছা হয়ে বেরিয়ে আছে প্ল্যাটফর্মের খানিকটা, তাতে ভীষণ জোরে ঠুকে গেল মাথা। ক্ষণিকের জন্যে জ্ঞান হারাল সে। ঠাণ্ডা পানি দ্রুত হুঁশ ফেরাল তার। সাঁতার না জানলে মরেছিল, আর উঠতে হত না। আর সাঁতার জানে না মনে করেই ফেলেছে সেটি, ওই যে শুনেছে মুসার কথাঃ আমরা কেউ সাঁতার জানি না। কিশোরকে মেরে ফেলতে চেয়েছে। সেটি যে এতখানি খারাপ, মানুষ খুন করতেও পিছপা নয় টাকার জন্যে, এটা ভাবতেও পারেনি কিশোর। তাহলে আরও সতর্ক থাকত।

ভেসে উঠল কিশোর। ওপর দিকে চেয়ে দেখল, সেটি নেই। তাকে ফেলে দিয়েই সরে গেছে।

আবার গিয়ে ডাইভিং বোর্ডে উঠেছে ড্যানিয়েল। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি আর ভাঁড়ামি করে বাচ্চাদের হাসাচ্ছে। এত প্রচণ্ড শোরগোল, কিশোরের মনে হল, এখন একটা ফগহর্ন বাজালেও কারও কানে ঢুকবে না। সাহায্যের জন্যে চেঁচিয়ে লাভ নেই। কেউ শুনতে পাবে না তার ডাক। যা করার নিজেকেই করতে হবে।

মাথায় বাড়ি লাগায় খুব দুর্বল লাগছে। কিছুক্ষণ ভেসে থেকে কাটিয়ে নিল সে-ভাবটা। ফুলে উঠেছে মাথার একপাশ, সাংঘাতিক ব্যথা করছে।

প্ল্যাটফর্মে উঠে এল আবার কিশোর। ভিড়ের মধ্যে সেটিকে চোখে পড়ল। আস্তে করে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। ইচ্ছে করেই জোরে কনুই দিয়ে এক গুঁতো মারল তার পিঠে।

ঝট করে ফিরে তাকাল সেটি। গাল দেয়ার জন্যে মুখ খুলেছিল, খোলাই রইল মুখটা। চোখ বড় বড়। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

যেটুকু সন্দেহ ছিল কিশোরের, তা-ও দূর হয়ে গেল। আচমকা ঠেলা লেগে সে পড়েনি, ইচ্ছে করেই তাকে পানিতে ফেলেছে সেটি। খুন করার জন্যে!

ক্যাম্পে ফিরে বন্ধুদের সেকথা জানাল কিশোর।

'হারামজাদা!' শুনে লাফ দিয়ে উঠল মুসা। 'এখুনি গিয়ে ঘাড় মটকাব ওর! ভেবেছে কি...'

অনেক কষ্টে তাকে ঠেকাল কিশোর। বলল, 'এখন গোঁয়ার্তুমির সময় নয়। যা করার ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে করতে হবে। সেটিকে গিয়ে মারলে উল্টে তুমি বিপদে পড়বে। প্রমাণ করা যাবে না, আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল সে...'

'আবার সেই প্রমাণ!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'প্রমাণের নিকুচি করি আমি! ব্যাটাকে ধরে আচ্ছামত ধোলাই না দিয়েছি তো আমার নাম মুসা আমান নয়।'

'পারবে না,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'ও একা নয়। ওর বসেরা ট্রেনিং পাওয়া স্পাই। সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র নিশ্চয় আছে। যা করার কৌশলে করতে হবে আমাদের। তবে প্রথমে, যেভাবেই হোক, সব কথা জানাতে হবে হ্যারি আংকেলকে। সেটির চোখ এড়িয়ে আমাদের কাউকে চলে যেতে হবে হোটেলে। ভুল করে ফেলেছি, আরও আগেই যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত ছিল।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল জিনা। 'গেলে আমিই যাব। আমি তার মেয়ে, ঢোকা সহজ হবে, হোটেলের কেউ মানা করবে না। আর সেটি এখন তোমার ওপরই চোখ বেশি রাখবে। কারণ, সে শুনে ফেলেছে, তুমি সেদিন চুরি করে তাদের গোপন আস্তানা দেখে এসেছ। সেজন্যেই মেরে ফেলতে চেয়েছিল। একবার যখন করেছে, আবার চেষ্টা করবে। কখন কিভাবে হামলা করে বসে কে জানে!'

'আমারও তাই মনে হয়,' বলল কিশোর। 'শোন, কি করব। আজ বিকেলে ক্যাম্পের বাইরে একটা "গুপ্তধন শিকারের" আয়োজন করেছেন মিস্টার মারফি। যা মনে হয়, টমাসকে সঙ্গে দিয়েই পাঠাবেন। তারমানে, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতে পারব আমরা। তখন কোনও একটা ছুতোয় আমাদের কাছ থেকে সরে যাবে তুমি। হাইওয়েতে গিয়ে যেভাবেই হোক একটা গাড়ি ধরে লিফট নেবে। চলে যাবে এডিনবার্গে। আংকেলকে জানিয়ে যত তাড়াতাড়ি পার ক্যাম্পে ফিরে আসবে। ঠিক আছে?'

ভালই আয়োজন করা হয়েছে। বুনো এলাকায় ব্যবস্থা হয়েছে গুপ্তধন শিকারের। তীরচিহ্ন আর আরও নানারকম চিহ্ন দিয়ে একটা গোলকধাঁধার মত সৃষ্টি করা হয়েছে। যে ওই ধাঁধার রহস্য ভেদ করে সঠিক জায়গায় পৌঁছতে পারবে, সে-ই খুঁজে পাবে গুপ্তধন, অর্থাৎ, এক ব্যাগ সোনার মোহর। ব্যাগের ওপরেই যা সোনালি রঙ দিয়ে লেখা রয়েছে 'সোনার মোহর', ভেতরে রয়েছে আসলে চকোলেট। তবে সেটা নিয়ে মাথাব্যথা নেই বাচ্চাদের। মজাটা অন্যখানে। খুঁজে বের করাতেই যত আনন্দ।

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গুপ্তধন খুঁজতে শুরু করল ছেলেমেয়েরা। হাসাহাসি, হৈ-চৈয়ে মুখর হয়ে উঠল নীরব বনভূমি।

এই খেলায় বেশ আনন্দ পেত তিন গোয়েন্দা আর জিনা, যদি না জরুরী কাজ থাকত তাদের হাতে। এমন ভান করল ওরা, যেন নিশানা দেখে দেখে খুঁজছে। আসলে একটু একটু করে সরে যাচ্ছে হাইওয়ের দিকে।

এই সতর্কতার দরকার আছে কিনা বুঝতে পারছে না কিশোর। কারণ, সেটিকে দেখা যাচ্ছে না। ধরে নিল, আছে ব্যাটা কাছাকাছিই কোথাও। গাছপালা আর ঝোপের আড়ালে থেকে চোখ রাখছে তাদের ওপর।

বনের প্রান্তে চলে এল ওরা।

'আরে, দেখ!' বলে উঠল রবিন। হাত তুলে দেখাল। 'সেটি।...ওই যে।'

একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছে সেটি।

'ওই লোকই,' বলল কিশোর। 'ওকেই সেদিন দেখেছি ঘরের মধ্যে। সেটিকে ধমকাচ্ছিল। ওর কথাই বলেছি।'

পথের কিনারে বড় একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দু'জনে। দূরে রয়েছে, এখান থেকে ওদের কথা শোনা যাচ্ছে না।

'এইই সুযোগ,' বলল কিশোর। 'লোকটার পিছু নেব। খুঁজে বের করব বনের ভেতরের বাড়িটা।'

হ্যাঁ, এটাই সুযোগ। কপালগুণে যখন মিলে গেছে সুযোগটা, মিস করা উচিত হবে না, একমত হল সবাই।

একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা। দু'জনের ওপর চোখ রাখল। কি করে লোকটাকে অনুসরণ করা যায়, ভাবছে কিশোর। কোনও উপায় বের করতে পারছে না।

এক সময় ঘুরে দাঁড়াল সেটি। সরু একটা বুনোপথের দিকে এগোল। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে আগের জায়গায়, সেটির দিকে চেয়ে আছে, চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

'সেটি তো গেল,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'এখন কি করা? লোকটার পিছু নেব কিভাবে?'

নিচের ঠোঁটে ঘনঘন চিমটি কাটছে কিশোর।

'ওই যে শাদা গাড়িটা,' দেখাল সে। 'নিশ্চয় লোকটার। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। আমাদের চিনবে না সে। গিয়ে অনুরোধ করব একটা লিফট দিতে। বলব, এডিনবার্গে যেতে চাই। রাজি হয়েও যেতে পারে। তবে এডিনবার্গ পর্যন্ত তো যাবে না, বনে ঢোকার পথের মোড়ে আমাদের নামিয়ে দেবে। যদি নেয়। সে গাড়ি নিয়ে ঢুকে যাবে বনে, সেই বাড়িতে যাবে। আর যদি তা-ই করে, একেবারে পানির মত সহজ হয়ে যাবে আমাদের কাজ।'

'এডিনবার্গের দিকে যাবে ভাবছ কেন?' প্রশ্ন করল রবিন। 'গ্লাসগোর দিকেও যেতে পারে।'

'মনে হয় না। এডিনবার্গের দিক থেকে এসেছে। দেখছ না, গাড়ির মুখ গ্লাসগোর দিকে। আমি শিওর, সেটির সঙ্গে কথা যখন বলেছে, আবার এডিন-বার্গের দিকেই ফিরবে সে, তারমানে তাদের আস্তানায়। আর শাদা গাড়ির মানেও পরিষ্কার। পুলিশ এখন বড় একটা কালো গাড়ি খুঁজছে।'

বনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে সেটি। নিশ্চয় আবার তিন গোয়েন্দা আর

জিনার ওপর চোখ রাখতে যাচ্ছে। কথাটা ভেবে মুচকি হাসল কিশোর।

ঘুরে গাড়ির দিকে রওনা হল লোকটা।

'কুইক!' বলে উঠল কিশোর। 'চল।'

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে প্রায় দৌড় দিল চারজনে।

গাড়িতে উঠে বসেছে লোকটা। এঞ্জিন স্টার্ট দিল। কিশোরের অনুমানই ঠিক, এডিনবার্গের দিকে গাড়ির মুখ ঘোরাতে শুরু করল সে।

দৌড়ে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দুই হাত মাথার ওপরে তুলে লোকটাকে থামতে ইশারা করল কিশোর।

থামল লোকটা।

জানালার কাছে এসে অভিনয় শুরু করে দিল কিশোর, মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'স্যার, বড্ড বিপদে পড়েছি, স্যার! এডিনবার্গে যেতে হবে আমাদের। তাড়াতাড়ি। এইমাত্র খবর পেলাম, আবার বাবা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে!' কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। 'হাসপাতালে। হয়ত আর দেখতেই পাব না...!' কান্নার জন্যে কথা শেষ করতে পারল না সে।

এগার

বিভ্রান্ত হয়ে গেল লোকটা। দ্বিধা করছে। ছেলেদের মনে হল, না-ই করে বসবে। কিন্তু কিশোরের নিখুঁত কান্না দেখেই বোধহয় মন গলে গেল। বলল, 'কিন্তু আমি তো এডিনবার্গে যাচ্ছি না,' কথায় কড়া বিদেশী টান। 'আরও আগেই আমার বাড়ি। যেখান পর্যন্ত যাব...'

'ওটুকু হলেই চলবে, স্যার,' বলে উঠল কিশোর। 'তারপরের ব্যবস্থা করে নিতে পারব। অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যার আপনাকে...,' বলতে বলতেই টান দিয়ে খুলে ফেলল গাড়ির পেছনের দরজা। লোকটা হ্যাঁ-না কিছু বলার আগেই হাত নেড়ে বলল, 'এই তোমরা ওঠ। জলদি কর।'

রবিন, মুসা আর জিনা বসল পেছনের সীটে। সামনের সীটে লোকটার পাশে উঠে বসল কিশোর। রাফিয়ানকে নিয়ে সমস্যা হল। লোকটাই সমাধান করে দিল, 'পেছনে তোল কুকুরটাকে। মেঝেতে বসে থাকবে।'

'ম্যানি থ্যাংকস, স্যার,' গদগদ কণ্ঠে বলল কিশোর। 'কি বলে যে আপনাকে...'

'হয়েছে, হয়েছে,' হাত নাড়ল লোকটা। 'তোল ওটাকে।'

তিন গোয়েন্দার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল রাফিয়ান।

চলতে শুরু করল গাড়ি।

মনে মনে না হেসে পারল না কিশোর। সেরাতে আর আজকের রাতে কত তফাত! ওই একই জায়গায় চলেছে। রাতে গিয়েছিল কালো গাড়ির লাগেজ র‍্যাক আঁকড়ে ধরে, প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সহ্য করতে করতে, প্রতি মুহূর্তে ছিল পড়ে যাওয়ার ভয়। এখন চলেছে নরম গদিতে বসে। হাসি পেলেও হাসল না। বাদলা দিনের আকাশের মত করে রাখল মুখটা, যেন যেকোনও সময় শুরু হয়ে যেতে পারে অঝোর বর্ষণ।

কিশোরের ভাবসাব দেখে পেট ফেটে হাসি আসছে মুসার। অনেক কষ্টে সামলে রাখল নিজেকে।

লীনহেড গাঁয়ের ভেতর দিয়ে গেছে হাইওয়ে। গ্রামটা পেরিয়ে এল গাড়ি। আরও মাইল দশেক এগোল। তারপর থেমে গেল। আর সামনে যাবে না।

লোকটাকে আরও কয়েকবার ধন্যবাদ দিয়ে গাড়ি থেকে নামল কিশোর। তার সঙ্গীরাও নামল।

গাড়িটা আবার চলতে শুরু করতেই রবিনের কানে কানে মুসা বলল, 'জলদি, নাম্বারটা টুকে রাখ।'

'নাম্বারই তো দেখছি না,' বলল রবিন। 'টুকবো কিভাবে? কাদা। ইচ্ছে করেই লাগিয়ে দিয়েছে হয়ত।'

গাড়িটাকে চলে যেতে দেখছে ওরা।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। তার অনুমান ঠিক হবে তো?

হল!

'ওই যে!' চেঁচিয়ে উঠল উত্তেজিত কণ্ঠে। 'ওই যে, ঘুরছে!'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিলে,' মুসা বলল। 'বনের দিকে ঘুরেছে যখন, বনের মধ্যেই কোথাও যাবে।'

'তাহলে আমার ধারণা ঠিক। এই বনের ভেতরেই কোথাও রয়েছে স্পাইদের গোপন ঘাঁটি। এখন শুধু খুঁজে বের করতে হবে বাড়িটা।'

'এত বড় বন,' মুসা তেমন আশা করতে পারছে না। 'ঘন জঙ্গলই বলা যায়। এর মাঝে কোথায় একটা বাড়ি লুকিয়ে আছে কি করে জানব? খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মত লাগছে আমার কাছে। রাতের আগে খুঁজে না পেলে আর পাব না।'

'নাথিং ভেঞ্চার, নাথিং উইন,' আশার বাণী শোনাল কিশোর। 'এখানে দাঁড়িয়ে বকবক করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। চল, কাজ শুরু করি। একেবারে খালি-হাত নই আমরা,' বলতে বলতে পকেট থেকে একটা দস্তানা বের করে দেখাল সে। 'এটা কাজে লাগবে। রাফির নাকের কাছে দোলাব, গন্ধ শুঁকে আমাদের হয়ে

খোঁজার কাজটা সে-ই সেরে দেবে।'

'কোথায় পেলে এটা? কার?' জানতে চাইল জিনা।

'নিশ্চয় স্পাইটার। ওর গাড়ির গ্লাভ কম্পার্টমেন্ট থেকেই মেরেছি।'

'তুমি তো একটা আস্ত চোর!' মুসা অবাক। 'কখন মারলে? লোকটা দেখেনি?'

'দেখলে কি আর দিত?' হেসে বলল কিশোর। 'একবার মোড় ঘোরাচ্ছিল, পাশের দিকে চেয়েছিল, সেই সুযোগে নিয়ে নিয়েছি।'

'চেষ্টা করলে পকেটমারের ওস্তাদ হতে পারবে।...কিন্তু, কাজ হবে এটা দিয়ে?'

'হতেও পারে। দেখতে দোষ কি?'

আশা বাড়ল মুসার। রাফিয়ানের ওপর ভরসা করা যায়। তবে জিনিসটা ওই লোকের হলে হয়।

'তোমরা তিনজনেই যাচ্ছ তাহলে?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'ঝুঁকি যত কম নেয়া যায়, তত ভাল। আমি আর মুসা যাব। তুমি রবিনকে নিয়ে চলে যাও এডিনবার্গে। আমরা দু'জনে আটকা পড়লে, তোমরা এসে সাহায্য করতে পারবে। একটা বাস-টাস ধরে চলে যাও। যেভাবেই হোক, আংকেলের সঙ্গে দেখা করবেই।'

'হ্যাঁ। দেখা না করে আর উপায় নেই,' জিনা বলল।

'আমরা ইতিমধ্যে বাড়িটা বের করে ফেলার চেষ্টা চালাব। যদি পাই, ঢুকে দেখব প্রফেসর স্পাইসার ওখানে আছেন কিনা। কারও কিছু বলার আছে?'

বলার থাকলেই বা কি? কিশোর কি কারও কথা শুনবে নাকি? মুসা কিংবা রবিন, কারোরই ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না। বড় বেশি ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধান।

'না, কি আর বলব?' রবিন বলল। 'জিনা, এস যাই। ওখানে গিয়ে দাঁড়াই। বাস পেলে তো ভাল। নাহলে কোনও কার-টারকে ধরতে হবে।'

'যদি মুসা আর কিশোরের কিছু হয়? যদি রাফিয়ানকে মেরে ফেলে স্পাইরা?' হাঁটতে হাঁটতে বলল জিনা।

'মারতে যাতে না পারে সে-জন্যেই তো যাচ্ছি আমরা। পুলিশ নিয়ে আসতে।'

জিনা আশ্বস্ত হতে পারল না। ফিরে তাকাল।

বুনো পথের মোড়ে হারিয়ে যাচ্ছে কিশোর, মুসা আর রাফিয়ান। শাদা গাড়িটা যে-পথ দিয়ে ঢুকেছে, সে-পথে।

পথের ধারে দাঁড়িয়ে থেকে বার বার পেছনে বনের দিকে তাকাচ্ছে রবিন।

আরেকটা কথা ভাবছে। যদি এখন গুপ্তধন শিকারিদের কেউ বেরিয়ে আসে? ওরা এখানে কি করছে নিশ্চয় জানতে চাইবে? কি জবাব দেবে তাকে? গল্প বানিয়ে বলতে হবে। সেই গল্পটা কি? আর বাস আসতেই বা কতক্ষণ? কয়েক মিনিটের মধ্যে না এলে কোনও একটা গাড়িকেই থামাতে হবে। ধরা যাক, বাস এল, কিংবা গাড়ি থামাতে পারল। গিয়ে পৌঁছল এডিনবার্গে। মিস্টার পারকারের সঙ্গে কি দেখা হবে? আর যদি হয়ও তাঁকে কি সব কথা বোঝানো যাবে? বুদ্ধিমান বিজ্ঞানী তিনি, কোনও সন্দেহ নেই, তবে সেটা নানারকম আবিষ্কার আর অঙ্কের ক্ষেত্রে। জাগতিক ব্যাপারে তাঁকে 'ভোঁতা' বললেও বাড়িয়ে বলা হবে না।...

'রবিন, একটা গাড়ি আসছে!'

জিনার কথায় রবিনের ভাবনায় বাধা পড়ল। মুখ ফিরিয়ে তাকাল। বাস যখন এল না, চেষ্টা করে দেখা যাক ওই গাড়িটাতেই লিফট নেয়া যায় কিনা। হাত নাড়ল সে।

কাছে এসে ঘ্যাচ করে থামল গাড়িটা। দু'জন মানুষ। ড্রাইভ করছে একজন লোক, পাশে বসে আছে এক মহিলা। চোখে সন্দেহ।

অনুরোধ জানাল রবিন।

'এডিনবার্গে যেতে চাও, না?' মহিলা বলল। 'হুম্‌ম্!...অনেক লম্বা পথ। হেঁটে যেতে পারবে না, তা ঠিক। কিন্তু কি করে জানছি, কোথাও থেকে পালিয়ে আসনি?'

'বিশ্বাস করুন, মিথ্যে কথা বলছি না। পালিয়ে আসিনি।'

'না, বিশ্বাস করতে পারছি না। পথেঘাটে অচেনা কাউকে লিফট দেয়া উচিতও নয়। এই ডেভিড, চালাও।'

চলতে শুরু করল গাড়িটা।

'না, উচিতও নয়!' সেদিকে চেয়ে মুখ ভেংচাল জিনা। 'শয়তান মেয়েমানুষ! কেউ লিফট দেবে কিনা এখন তাই ভাবছি।'

খানিক পরে এল একটা দুধের গাড়ি। পেছনে সারি সারি বাক্সে খালি বোতল ঝনঝন করছে। ভরা বোতল সাপ্লাই দিয়ে খালিগুলো নিয়ে এসেছে।

পথের ওপর এসে জোরে জোরে দু'হাত নাড়ল রবিন।

কাছে এসে থামল ট্রাক। জানালা দিয়ে মুখ বের করল গোমড়ামুখো গোলগাল চেহারার ড্রাইভার। দেখেই দমে গেল রবিন। নিজে থেকেই লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'লিফট চাই, না?'

'হ্যাঁ, স্যার, প্লীজ! বাস মিস করেছি আমরা।'

'জলদি ওঠ। তাড়া আছে আমার।'

'আমাদেরও' শব্দটা প্রায় এসে গিয়েছিল রবিনের মুখে। বলল না। তাড়াতাড়ি উঠে বসল ড্রাইভারের পাশের সীটে। তার পাশে বসল জিনা।

এডিনবার্গে পৌঁছল ট্রাক। চেহারা যা-ই হোক, ড্রাইভার মানুষটা খুবই ভাল। তাড়া আছে ওর, তবু ছেলেরা বিদেশী জেনে কিছুটা ঘুরপথে এসে মিডলোদিয়ান হোটেলে যাওয়ার পথের মোড়ে নামিয়ে দিল দু'জনকে।

হোটেলের দিকে প্রায় দৌড়ে চলল জিনা আর রবিন। উত্তেজনায় বুক কাঁপছে। জিনার বাবা-মাকে এখন পাওয়া না গেলে মুশকিল হয়ে যাবে।

হোটেলে পৌঁছল দু'জনে। লবিতে ঢুকেই জিনার মায়ের মুখোমুখি পড়ে গেল। বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।

'মা-আ!'

'আরে জিনা! রবিন! কি ব্যাপার?' অবাক হলেন মিসেস পারকার। 'এখানে কি জন্যে এসেছ?'

'বাবা কোথায়, মা?' জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল জিনা।

'কনফারেন্সে। আমি বাজারে যাচ্ছি, কয়েকটা জিনিস কিনতে। হয়েছে কি তোদের? মুখচোখ ওরকম শুকনো কেন? কিশোর আর মুসা কোথায়? কিছু ঘটিয়ে বসিসনি তো?'

'না না, খারাপ কিছু ঘটেনি,' তাড়াতাড়ি বলল রবিন। 'কিন্তু আংকেলের সঙ্গে কথা বলা দরকার। খুব জরুরী। প্রফেসর স্পাইসারের কিডন্যাপিঙের ব্যাপারে। সে-জন্যেই আমাদেরকে পাঠিয়েছে কিশোর।'

ভুরু কুঁচকে ফেললেন মিসেস পারকার। একবার রবিনের দিকে, একবার মেয়ের দিকে তাকাচ্ছেন। সিরিয়াস ব্যাপার, বুঝতে পেরেছেন। বললেন, 'চল, রুমে। আমাকে সব কথা বলবে। তারপর ওকে ফোন করব।'

কনফারেন্স সেন্টারে ফোন করলেন মিসেস পারকার। অনেক চেষ্টার পর একজন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানকে বোঝাতে পারলেন, তাঁর স্বামীকে এখুনি ভীষণ দরকার। ফোন ধরে রাখতে বলে কনফারেন্স রুমে গেল লোকটা। কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে জানাল, জরুরী আলোচনা চলছে এখন, মিস্টার পারকারকে ডিসটার্ব করার সাহস হয়নি তার। মিসেস যদি কিছু মনে না করেন, নিজে এসে একবার স্বামীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতে পারেন। ঢোকার ব্যবস্থা করে দেবে টেকনিশিয়ান।

লোকটাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিলেন মিসেস পারকার।

ছেলেদের বলল, 'চল। ট্যাক্সি নেব।'

হোটেলের বাইরে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে পাওয়া গেল গাড়ি। ড্রাইভারকে জলদি করতে বললেন মিসেস পারকার।

কনফারেন্স সেন্টারের সামনে এসে থামল গাড়ি।

কিছুতেই ঢুকতে দেবে না তাদেরকে দারোয়ান। টেকনিশিয়ানের কথা বললেন মিসেস পারকার। তাকে ফোন করল দারোয়ান। রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল, 'ঠিক আছে, শুধু আপনি যান। ছেলেরা থাকবে।'

'থাক।' বলে ভেতরে ঢুকে গেলেন মিসেস পারকার।

ওয়েটিং রুমে বসে আছে জিনা আর রবিন। সময় যেন আর কাটে না। ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে ঘনঘন। এই সময় এমন একজনকে ঢুকতে দেখল, যাকে এখানে দেখতে পাবে, কল্পনাও করেনি।

সেটিনার ইকি!

নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না দু'জনে। কিন্তু সেটি ওদের দিকে তাকাল না। চোখ নামিয়ে রেখেছে। যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন।

ওদেরকে দেখে ফেলার আগেই উঠে জিনার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল রবিন। ঢুকে পড়ল পাশের ক্লোকরুমে।

'ও দেখে ফেললে অসুবিধে হবে,' নিচু কণ্ঠে বলল রবিন। 'সন্দেহ করবে। তার ওস্তাদদের ফোন করে হুঁশিয়ার করে দেবে। কিন্তু ব্যাটা এখানে কি করছে?'

জিনা কিছু বলার আগেই ক্লোকরুমের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সেটি। দু'জনকে দেখে চমকে উঠল।

সামলে নিতে সময় লাগল। হাসল। তারপর বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গেল।

হঠাৎ রবিনের মনে হল, সেটিকে আটকানো দরকার। কোনও কিছু না ভেবেই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

এরকম হামলা আসতে পারে, ভাবেইনি সেটি, ধাক্কার চোটে সামনের দিকে ঝুঁকে গেল তার শরীর, পেছনের দিকে উঠে গেল একটা পা। টলে উঠল। তাকে সামলানর সুযোগ দিল না রবিন। লাথি মেরে সরিয়ে দিল অন্য পা-টাও। হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেটি। চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাটা।

কঠিন মেঝেতে ভীষণ জোরে কপাল ঠুকে গেছে সেটির। জ্ঞান হারাল সে।

কোমর থেকে বেল্ট খুলে সেটির হাত পিছমোড়া করে বাঁধল রবিন। তাকে সাহায্য করল জিনা। পা-ও বাঁধা হল, জিনার বেল্ট দিয়ে। তারপর একটা রুমাল ঠেসে গুঁজে দিল মুখের মধ্যে।

'ধর, ব্যাটাকে আলমারিতে ঢোকাই!' বলল রবিন। 'থাকুক আটকে এখানে।'

টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে একটা আলমারিতে ঢোকানো হল সেটিকে। বাথরুমে একটা তোয়ালে পাওয়া গেল, আর একটা বালতি। ওগুলো নিয়ে এল রবিন। তোয়ালেটা সেটির বাঁধা হাতের ওপর আরেকবার বাঁধল। বালতিটা পরিয়ে দিল মাথায়, কাঁধ পর্যন্ত—বাড়তি সতর্কতা। আলমারির পাল্লা বন্ধ করে দিল।

'দম বন্ধ হয়ে মরবে না তো?' জিনা বলল।

'না।' আলমারির তালার চাবি খুঁজছে রবিন।

পাওয়া গেল ওটা। আলমারির পাশেই একটা ছোট খোপের ভেতরে। তালা লাগিয়ে চাবিটা নিজের পকেটে রেখে দিল রবিন। হেসে বলল, 'পারলে বেরোক এখন গুপ্তচরের বাচ্চা।'

আবার ওয়েটিং রুমে এসে ঢুকল দুজনে।

মিসেস পারকার ফেরেননি।

বার

বনের ভেতরের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে কিশোর, মুসা আর রাফিয়ান। দ্রুত হাঁটছে।

কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ শেষ হয়ে গেল বন। পথের দু'ধারে এখন খোলা মাঠ।

ভাবনায় পড়ে গেল মুসা। 'খোলা জায়গায় হাঁটছি। যদি ব্যাটারা জানালা দিয়ে দেখে ফেলে? স্পাইটা আমাদেরকে চিনে ফেলবে।'

'আরে, না,' কিশোর বলল। 'বাড়ি কই? বাড়িই দেখছি না। ওটা বনের মধ্যে, খোলা জায়গায় নয়।'

আর কোনও কথা হল না। নীরবে এগিয়ে চলল ওরা।

রাফিয়ান খুব উপভোগ করছে। দিনটা গরম। আবহাওয়াও ভাল। ঝকঝকে রোদ।

অনেকক্ষণ একটানা হাঁটা, তার ওপর কড়া রোদ, গা গরম হয়ে গেল। বনের ঠাণ্ডা ছায়ায় ঢুকে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ল কিশোর। 'বাপরে! একেবারে ঘেমে গেছি।'

'হ্যাঁ, গরমটা বেশিই,' বলল মুসা।

'এখন থেকে আরও সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। রাফি, এবার তোর পালা। দেখি, কি করতে পারিস?' বলে দস্তানাটা বের করে ওর নাকের কাছে ধরল কিশোর। 'শোঁক, ভাল করে শুঁকে গন্ধ চিনে রাখ। হ্যাঁ, এবার খুঁজে বের কর এটার

মালিককে।'

নাক কুঁচকে কয়েকবার গন্ধ শুঁকল রাফিয়ান, লেজ নাড়ল। মাটিতে নাক নামিয়ে শুঁকল। তারপর ছুটতে শুরু করল। ওকে অনুসরণ করল কিশোর আর মুসা।

এক জায়গায় এসে দু'ভাগ হয়ে গেছে পথ।

রাফিয়ানকে ডেকে থামাল কিশোর। দ্বিধা করছে। কোনদিকে যাবে?

পথ বাতলে দিল বুদ্ধিমান কুকুরটা। এগিয়ে চলল আবার একটা পথ ধরে।

'রাফি না থাকলে বিপদেই পড়তাম,' বলল মুসা। 'আমি তো ভাবছিলাম ওই পথটা ধরে যাব। জিন্দেগিতেও খুঁজে পেতাম না বাড়িটা।'

'তা ঠিক নয়,' একমত হতে পারল না কিশোর। 'পেতাম। দেরি হত আরকি। রাফি থাকায় সুবিধে হয়েছে। সময় বাঁচবে।'

রাফিয়ানকে আস্তে চলতে বলে বনের ভেতর ঢুকল কিশোর। মুসাকেও ডাকল। গাছপালার আড়ালে থেকে এখন অনুসরণ করে চলল কুকুরটাকে।

কিছুদূর এগিয়ে গতি আরও কমিয়ে দিল কিশোর। রাফিয়ানকে বলল, 'রাফি, আস্তে।' মুসাকে বলল, 'মনে হচ্ছে এসে গেছি। সামনে কিছুটা খোলা দেখছ? সেরাতে এরকম একটা জায়গা দেখেছিলাম। তার পরে আবার বনের মধ্যে ঢুকেছিল গাড়ি।'

খুব সাবধানে খোলা জায়গাটা পেরিয়ে এল ওরা। আবার ঢুকল গাছপালার আড়ালে।

হঠাৎ থেমে গেল কিশোর। মুসার হাত খামচে ধরল। 'ওই বাড়ি!' উত্তেজনায় শ্বাস দ্রুত হয়ে গেছে তার।

মুসাও দেখল। গাছের আড়াল দিয়ে চোখে পড়ছে বিরাট একটা শাদা বাড়ি। চারপাশে ঘেরা বাগান, বাগান ঘিরে রেখেছে উঁচু বেড়া। গেট আছে।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'এ-যে আস্ত দুর্গ! একথা তো বলনি? ঢুকব কোনখান দিয়ে?'

'রাতে ঠিক বুঝতে পারিনি,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'তাছাড়া দেখার তেমন সুযোগও ছিল না। ঢোকাটা কঠিনই। তবে অসম্ভব নয়।'

'কিশোর, ঝুঁকি নিয়ে কি লাভ? স্পাইদের ঘাঁটি তো দেখলাম। চল, ফিরে যাই। পুলিশকে জানাই। যা করার ওরাই করুক।'

কিন্তু রাজি হল না কিশোর। বাড়িটা যখন পাওয়া গেছে, ভেতরে না দেখে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই তার। বলল, 'না। বাড়িতে কেউ আছে কিনা দেখা দরকার। নইলে পুলিশকে কি বলব গিয়ে? প্রফেসর এখানেই আছেন কিনা দেখতে

হবে। বেড়া ঘেঁষে দাঁড়াও। তোমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে বেড়া ডিঙাব।'

'পাগল হয়েছ! জেনেশুনে বাঘের গুহায় ঢুকবে?'

'বাঘ নয় ব্যাটারা, শেয়াল। কিডন্যাপাররা ছিঁচকে চোরের চেয়েও বাজে। ওদেরকে বাঘ বললে মানহানি হবে বাঘের।'

বাধা দিয়ে লাভ হবে না, বুঝতে পারছে মুসা, তবু ঠেকানোর শেষ চেষ্টা করল, 'ভালমত ভেবে দেখ, কিশোর। বেড়ার ওপরে তার থাকতে পারে, তাতে কারেন্ট থাকতে পারে, কিংবা বার্গলার অ্যালার্মের সাথে যোগ থাকতে পারে। ওভাবে যেও না, কিশোর, প্লীজ!'

'বেশ, এত যখন ভয় পাচ্ছ, তুমি এখানেই থাক। আমি একাই চেষ্টা করে দেখি।'

কি আর করে, সঙ্গে চলল মুসা। বেড়ার ধারে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় শোনা গেল এঞ্জিনের শব্দ। একটা গাড়ি আসছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকাল মুসা আর কিশোর। রাফিয়ানকেও টেনে নিয়ে গেল সঙ্গে।

ওরাও ঢুকে পড়ল, গাড়িটাকেও আসতে দেখা গেল এবড়োখেবড়ো পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে। একটা ভ্যান। গেটের কাছে এসে থামল। খোলার জন্যে নামল ড্রাইভার। সে একলাই, গাড়িতে আর কেউ নেই। পেছনে দুটো বাক্স।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল কিশোর। ড্রাইভার এদিকে পেছন করে গেট খোলার জন্যে এগোতেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। মুসাকে অবাক করে দিয়ে দিল দৌড়। নিচু হয়ে দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়ল ভ্যানের পেছনে। বাক্সগুলোর আড়ালে লুকাল।

রাফিয়ানও কিশোরের পিছু নিতে চেয়েছিল, বেল্ট টেনে ধরে রাখল মুসা, বেরোতে দিল না। বুক কাঁপছে তার। কাজটা কি কিশোর ঠিক করল? বিপদটা অনুমান করতে পেরেছে? দিশেহারা হয়ে গেল মুসা। কি করবে এখন? বেরোবে কিনা ভাবতে ভাবতেই দেরি করে ফেলল। গেট খুলে ফিরে এসে গাড়িতে উঠল ড্রাইভার। গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকল। তারপর আবার নেমে এসে গেট বন্ধ করল।

কিশোর এখন শত্রুদের সীমানার মধ্যে!

এরপর কি ঘটবে? বকের মত গলা বাড়িয়ে দেখছে মুসা, ঝোপের মধ্যেই রয়েছে।

ভ্যানটা আবার চলতে শুরু করতেই এক লাফে নেমে পড়ল কিশোর। পথের ধারের একটা ঝোপের দিকে ছুটল। নিরাপদেই গিয়ে ঢুকল ওটার ভেতরে, ড্রাইভারের চোখ এড়িয়ে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।

কিশোর ভাবছে, ঢোকা তো গেল, এখন প্রফেসরকে খুঁজে পেলেই হয়। তাকে

এখানেই বন্দি করে রাখা হয়েছে, নাকি অযথা কষ্ট করছে ওরা?

বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে ভ্যান। এরপর কি করা যায়, মতলব আঁটছে কিশোর। প্রথমতঃ, বাড়িটার কাছে যেতে হবে। প্রতিটি ঘরে উঁকি দিয়ে দেখতে হবে। ভাগ্য বিশ্বাস করে না সে, এখন করতে ইচ্ছে করছে। কারণ, রওনা হওয়ার পর থেকে এ-যাবত প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে সহায়তা করছে ভাগ্য।

আরও একবার করল। ঝোপ থেকে বেরিয়ে ছুটে আরেকটা ঝোপের আড়ালে এসে থামল কিশোর। তারপর আবার ছুটল, আরেকটা ঝোপ লক্ষ্য করে। এভাবে ঝোপের আড়ালে আড়ালে চলে এল বাড়ির কাছাকাছি. টেরই পেল না ড্রাইভার।

কার সঙ্গে যেন কথা বলছে লোকটা।

কান পাতল কিশোর। শুনতে পেল, বলছে, 'নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, কতটা ঝুঁকি নিয়েছি? শুধু আপনার জন্যেই করেছি কাজটা। হ্যাঁ, যা যা আনতে বলেছেন, সব নিয়ে এসেছি। লিস্টের কিচ্ছু বাদ যায়নি। এবার কাজ শুরু করতে পারেন। ও, আরেকটা কথা, ওরা বলে দিয়েছে, কোনরকম চালাকি না করার জন্যে। তাহলে বিপদে পড়বেন। আর অবাধ্য মানুষকে দিয়ে কি করে কাজ করাতে হয়, খুব ভাল মত জানে ওরা।'

কই, কাউকে তো দেখা যাচ্ছে না? অবাক হল কিশোর। লোকটা নিজে নিজেই কথা বলছে নাকি? কিন্তু নিজের সঙ্গে এভাবে কেউ কথা বলে না। কথার জবাবও দিল না কেউ। তাহলে? লোকটার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে, প্রফেসর স্পাইসারের উদ্দেশ্যেই বলেছে।

আর কিছু বলল না ড্রাইভার। ভ্যানের পেছনে এসে বাক্স নামাতে শুরু করল। বাড়ির ভেতরে বয়ে নিয়ে গেল ওগুলো। হয়ত ঘরের ভেতরে বসে খুলবে সাবধানে। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আবার এগোল কিশোর।

ভ্যানের কাছে এসে থামল। তাকাল চারপাশে। কেউ নেই। গাড়িটার এক পাশে একটা কুয়ার দেয়াল, ওপরে ঢাকনা।

তীক্ষ্ণ চোখে সেটার দিকে তাকাল কিশোর। দেয়ালের গোড়ায় মাটির সমতলে একটা ভেন্টিলেটর শ্যাফট নজর এড়াল না তার। ওটা ওখানে কেন? কুয়ার ভেতরে ওভাবে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করার কি দরকার? বুঝে ফেলল। কুয়াটাকে বন্দিশালা বানানো হয়েছে। বাড়ি থেকে দূরে, এমন একটা জায়গায় কুয়াটা, চোখে পড়বে সবারই, অথচ কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। ভাববে, সাধারণ কুয়া। চমৎকার বুদ্ধি বের করেছে ব্যাটারা। বাতাস চলাচলের গোপন ব্যবস্থা আছে, কথা বলার জন্যেও কোনও যন্ত্র লাগিয়েছে বোধহয়। কোনওভাবে খবর পেয়ে পুলিশ যদি এসে চড়াও হয়ও, ঘরগুলো তন্নতন্ন করে খোঁজে, বন্দিকে পাবে

না।

সময় নষ্ট করল না কিশোর। কুয়ার আরও কাছে এগিয়ে নিচু গলায় ডাকল, 'প্রফেসর? আপনি নিচে আছেন? আমি কিশোর, বিজ্ঞানী মিস্টার হ্যারিসন পারকারের সঙ্গে আমেরিকা থেকে এসেছি। শুনতে পাচ্ছেন? পেলে জবাব দিন, প্লীজ!'

জবাব এল মৃদু ফিসফিস স্বরে, 'হ্যাঁ, আছি। কুয়ার তলায়। শুনতে পাচ্ছ?'

'পাচ্ছি। আমি আপনাকে বের করার চেষ্টা করছি।'

কুয়ার ঢাকনা সরাতে চাইল কিশোর, পারল না। খুব শক্ত করে লাগানো রয়েছে। ঠেলা দিল, জোরে টান দিল আবার, নড়লও না। নাহ্, এভাবে ঢাকনা সরানো যাবে না।

এতই ব্যস্ত কিশোর, পেছনে লোকটার আগমন টেরই পেল না। কাঁধ খামচে ধরল ভারি একটা হাত। 'বা-বা-বা!' সেই স্পাইটার কণ্ঠ। 'তোমার বাবা না হাসপাতালে? মারা গেছে?'

পাথর হয়ে গেল যেন কিশোর।

কুয়ার দেয়ালের গোড়ায় দুটো পাথরের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে দিল লোকটা। লুকানো একটা সুইচ টিপতেই সরে গেল ঢাকনাটা। কুয়ার মুখের কাছ থেকে নেমে গেছে লোহার সিঁড়ি।

'দুঃখিত, খোকা,' হাসল লোকটা। 'সেই প্রবাদটা শুনেছ তো, অতি-কৌতূহলে বেড়াল মরে?' হঠাৎ বদলে গেল কণ্ঠস্বর। কঠিন শীতল হয়ে উঠল, সেরাতে সেটির সঙ্গে যে-সুরে বলেছে, 'যাও, নিচে নাম!'

নড়ল না কিশোর।

তার হাত চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল লোকটা। পরক্ষণেই চিৎকার করে উঠল ব্যথায়।

বসে আছে তো আছেই মুসা। কিশোরের কোনও খবর নেই। আর এভাবে বসে থাকা যায় না, ভাবল সে। গিয়ে দেখতে হয় কি হয়েছে। বেরিয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে। রাফিয়ানকে নিয়ে এগোল গেটের দিকে।

গেটের কাছে এসে থামল। উঁকি দিল ভেতরে। কাউকে দেখতে না পেয়ে সাবধানে খুলে ফেলল পাল্লার হুড়কো, ঢুকে পড়ল ভেতরে। রাফিয়ানকে বলল, 'দেখ, কিশোর কোথায় গেছে?'

গন্ধ শুঁকে এগোল রাফিয়ান। বেশি খুঁজতে হল না। পথ ধরে এগিয়ে একটা ঝোপের অন্যপাশে এসেই দেখতে পেল, শত্রুর কবলে পড়েছে কিশোর। মুহূর্ত

দেরি করল না আর কুকুরটা। নিঃশব্দে ছুটে গিয়ে পেছন থেকে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। কামড় দিয়ে ধরে তাকে নিয়ে পড়ল মাটিতে।

গড়াগড়ি করে, ঠেলে রাফিয়ানকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল স্পাইটা। পারল না। এক জায়গা ছাড়ালে আরেক জায়গায় কামড়ে ধরছে কুকুরটা।

কুয়ার কাছে দাঁড়িয়ে নিচে চেয়ে জোরে ডাকল কিশোর, 'প্রফেসর! উঠে আসুন! কুইক!'

শুকনো কুয়ার তলায় থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠেছেন প্রফেসর। দ্বিতীয়বার বলতে হল না তাঁকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। বেরিয়ে এলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। দেখলেন এক নাটকীয় দৃশ্য।

বিশাল এক কুকুরের সঙ্গে যেন কুস্তি লড়ছে স্পাইটা। আর দুটো ছেলে দু'পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। নিগ্রো ছেলেটা উৎসাহ দিচ্ছে কুকুরটাকে, 'ধর, আরও জোরে ধর ব্যাটাকে! কামড়ে ছিঁড়ে ফেল!'

কুকুরটার সঙ্গে পারবে না বুঝে শেষে জোরাজুরি বাদ দিয়ে পকেটে হাত ঢোকাল স্পাইটা। একটা হুইসেল বের করে বাজাল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির এক পাশে দরজা খুলে বেরোল পাঁচ-ছয়জন লোক। দৌড়ে এল।

কিশোর, মুসা, প্রফেসর বুঝতে পারলেন, হেরে গেছেন। এতগুলো লোকের সঙ্গে পারা সম্ভব না। দু'জন এসে রাফিয়ানকে টেনে-হিঁচড়ে সরাল স্পাইটার ওপর থেকে।

'কুত্তার বাচ্চা!' টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল স্পাইটা। ধাঁ করে এক লাথি বসিয়ে দিল রাফিয়ানের পেটে।

ভীষণ রাগে চেঁচিয়ে উঠে ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট শুরু করল রাফিয়ান। এবার ছুটতে পারলে সোজা লোকটার গলা কামড়ে ধরবে। কিন্তু পারল না। মাটিতে চেপে ধরে রাখা হল তাকে।

পিস্তল বের করল একজন।

'না না, দোহাই আপনার!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'গুলি করবেন না···এই রাফি, চুপ, চুপ! নড়িস না!'

বিপদ বুঝতে পারল রাফিয়ান। শান্ত হয়ে গেল।

গুলি করল না লোকটা। পিস্তল নেড়ে বলল, 'যাও, এবার সবাই ঢোক কুয়ার মধ্যে···'

তার কথা শেষ হল না। একটা ঝাড়ের ধার থেকে লাউড স্পীকারে ভেসে এল ভারি কণ্ঠ, 'খবরদার, এক চুল নড়বে না কেউ! গুলি খেয়ে মরবে!···পিস্তল ফেল

হাত থেকে। …প্রফেসর, সরে যান। কিশোর, মুসা, সরে যাও…আরও সর।'

ঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন অস্ত্রধারী পুলিশ। তাদের পেছনে বেরোলেন মিস্টার পারকার, জিনা আর রবিন।

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

জিনার দিকে ছুটে গেল রাফিয়ান। 'শয়তান লোকটাকে' কামড়াতে পেরে সে যে খুব খুশি হয়েছে, সেটা বোঝানোর জন্যে।

'একেবারে সময়মত এসেছেন আপনারা,' কিশোর বলল।

'গরু খোঁজা খুঁজেছি সারা বনে! তারপর পেয়েছি,' গম্ভীর হয়ে আছেন মিস্টার পারকার। 'কতবার বলেছি, এসবে জড়াবে না। কথা শোন না। এরকম করে কোন্‌দিন মারা পড়বে…'

জবাব দিল না কিশোর। আরেক দিকে চেয়ে রইল। ভুল বলেননি হ্যারি আংকেল।

আসামীদের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল পুলিশ। পরে যে ছয়জন বেরিয়ে এসেছে, তাদের মাঝে কাসনারও রয়েছে, চিনতে পারল কিশোর।

বন্দিদেরকে নিয়ে গিয়ে পুলিশের গাড়িতে তোলা হল।

'সেটি হারামজাদা বাকি রয়ে গেল,' রবিনের দিকে চেয়ে বলল মুসা। 'ওকে ধরার কথা বলনি?'

'বলেছি,' হাসলো জিনা। 'আলমারির ভেতর থেকে তাকে বের করেছে পুলিশ।'

'আলমারি?'

'চল, যেতে যেতে বলব।'

সেই দিন সন্ধ্যায় লক লীন হলিডে ক্যাম্পে এক বিশেষ পার্টির আয়োজন করা হল, তিন গোয়েন্দা, জিনা, আর রাফিয়ানের সম্মানে। অনেক আনন্দ করল সবাই।

পার্টি শেষে ক্লান্ত হয়ে যার যার ঘরে গেল ওরা।

তিন গোয়েন্দা, জিনা, আর রাফিয়ান এল তাদের কুঁড়েতে।

'বুঝেছ,' বিছানায় শুয়ে গায়ের ওপর কম্বল টেনে দিতে দিতে বলল জিনা। 'দারুণ জমল এবার স্কটল্যাণ্ডে। আশা করিনি এতটা মজা হবে।'

'তা তো বুঝলাম,' বলল কিশোর। 'কিন্তু এখনও তো ছুটি শেষ হতে আরও অনেক বাকি। কি করে কাটাব?'

ঃ শেষ ঃ

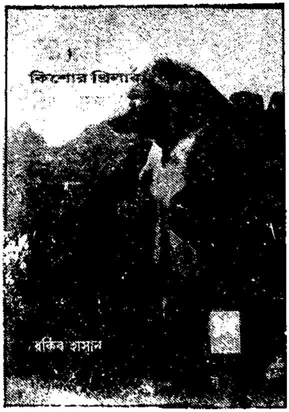

ভয়াল গিরি

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর, ১৯৮৯

খুব সাবধানে প্রায় খাড়া পাহাড়ী পথ বেয়ে ধীরে ধীরে উঠে চলেছে ট্রাক। একটা স্কি শপ-এর পাশ কাটিয়ে এল। আল্পস-এর পার্বত্য এলাকার কটেজের মত করে তৈরি হয়েছে এই বাড়িটা। দোকানটার পাশে একটা মোটেল। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময় এখন, দোকান, মোটেল দুটোই বন্ধ। একটা রেস্টুরেন্ট দেখা গেল, নাম 'দি হ্যাডেলরেনবাস'। জানালায় উজ্জ্বল নীল শাটার। রৌদ্রোজ্জ্বল ফুটপাথ দিয়ে অলস ভঙ্গিতে হাঁটছে দু'চারজন লোক, বোধহয় বেড়াতে বেরিয়েছে। একটা পেট্রল স্টেশনে চেয়ারে হেলান দিয়ে ঢুলছে রঙচটা জিনসের প্যান্ট পরা অ্যাটেনডেন্ট।

স্টেশনে ঢুকে পাম্পের সামনে এনে গাড়ি রাখল বোরিস। ড্রাইভিং সীটের পাশের দরজা খুলে লাফ দিয়ে নামল। অন্য পাশের দরজা খুলে নামল রোভার। রকি বীচে পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে কাজ করে ওরা দুই ভাই, বাড়ি ব্যাভারিয়ায়। এমনিতেই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে ওরা, আজ যেন সেটার বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। নতুন শার্ট গায়ে দিয়েছে বোরিস, একটা ভাঁজ পড়েনি কোথাও, কুঁচকায়নি, অথচ সেই রকি বীচ থেকে দীর্ঘ পথ গাড়ি চালিয়ে আওয়েনস ভ্যালি ছাড়িয়ে এসে পৌঁছেছে এখানে। জায়গাটা একটা স্কি রিসোর্ট। সিয়েরা নেভাডার একটা উঁচু অঞ্চল। ভাইয়ের মতোই রোভারের পোশাকও ধোপদুরস্ত, কড়া ইস্তিরি করা প্যান্ট, পায়ে চকচকে পালিশ করা জুতো।

'বোনকে তাক লাগিয়ে দিতে চাইছে,' ফিসফিস করে বলল রবিন।

হেসে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। মুসাও হাসল। ট্রাকের পেছনে বসে তিনজনেই তাকিয়ে রয়েছে দুই ভাইয়ের দিকে।

অ্যাটেনডেন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বোরিস। ডাকল, 'এই যে, ভাই, শুনছেন?'

ঘোঁৎ করে উঠল লোকটা। চোখ মেলল।

'বিরক্ত করলাম,' খুব ভদ্রভাবে বলল বোরিস। 'মিলানি রোজেনডালের বাড়িটা কোথায়, বলতে পারবেন?'

'দ্য স্কাই ইন?' উঠে দাঁড়াল লোকটা। হাত তুলে দেখাল পথের ধারের এক গুচ্ছ পাইন গাছ। 'ওগুলোর ওপাশে গেলেই একটা শাদা বাড়ি দেখতে পাবেন। পথের মোড়ে, এক পাশে।'

লোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে ঘুরতে যাবে বোরিস, জিজ্ঞেস করল অ্যাটেনডেন্ট, 'মিলির বাড়ি যাচ্ছেন? বিশপের দিকে যেতে দেখলাম ওকে, তা ঘন্টা দুই তো হয়েছে। ফিরতে দেখলাম না।'

'ঘরে ঢুকে বসে থাকব,' হেসে বলল রোভার।

'হুঁ,' মাথা দোলাল অ্যাটেনডেন্ট। 'স্কাই ভিলেজে এখন শুধুই বসে থাকা। সবাই তা-ই থাকে। সীজন তো নয় এখন। বিশপে বোধহয় বাজার করতে গেছে মিলি। আসতে দেরি হবে।'

'হোক,' হেসে বলল রোভার 'এমনিতেই অনেক দেরি হয়েছে। সে-কি আজকালকের কথা! সেই ছোট বেলায় বাড়ি ছেড়েছি আমরা দুই ভাই, আমেরিকায় চলে এসেছি, তারপর থেকে আর মিলির সঙ্গে দেখা নেই।'

'তাই নাকি, তাই নাকি!' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'দেশী লোক, না? খুব খুশি হবে মিলি। এতদিন পর ছেলেবেলার বন্ধুদের দেখবে...'

'বন্ধু নই,' বাধা দিয়ে বলল রোভার। 'একেবারে এক পরিবার। ও আমাদের বোন, খালাত বোন। জানিয়ে আসিনি, সারপ্রাইজ দেব।'

'মিলি এখন সেটা পছন্দ করবে কিনা কে জানে,' হাসল লোকটা। 'দেখুন চেষ্টা করে। গত দু' হপ্তা ধরে খুব ব্যস্ত সে।'

'তাই?' বলল বোরিস।

'দেখা হলেই বুঝবেন,' লোকটার চোখে আলোর ঝিলিক।

এ-ধরনের লোক অনেক দেখেছে কিশোর। বেশি কথা বলে।

ফিরে এসে ট্রাকে উঠল দুই ভাই।

'বসে বসে ঘুমালে কি হবে,' ট্রাক ছাড়লে বলল মুসা। 'চোখ খোলা রাখে ব্যাটা!'

'কি আর করবে?' রবিন বলল। 'এখন অসময়। কাজ নেই কর্ম নেই, কিছু একটা করে সময় তো কাটাতে হবে। শীতের সময় তো কাজ করে কূল পায় না।'

গাঁয়ের পথ ধরে উঠেই চলেছে ট্রাক। একটা আইসক্রীম শপ পেরোল—দোকানটা খোলা, একটা ওষুধের দোকান পেরোল—ওটা বন্ধ। স্কাই ভিলেজের জেনারেল মার্কেটটা যেন মৃত, গিফট শপটাও।

'কি নিয়ে এত ব্যস্ত বোরিসের বোন?' অবাক হয়ে বলল মুসা। 'জায়গাটা তো মরে রয়েছে।'

'বোরিস আর রোভারের মুখে যা শুনলাম,' কিশোর বলল। 'ওদের এই বোনটি নাকি সব সময়ই ব্যস্ত থাকে। খালি কাজ আর কাজ। লাভজনক কিছু না কিছু খুঁজে বের করেই। দশ বছর আগে আমেরিকায় এসেই প্রথমে পরিচারিকার কাজ নিয়েছিল নিউ ইয়র্কের এক হোটেলে। ছয় মাসের মধ্যেই নাকি সমস্ত স্টাফদের ইনচার্জ হয়ে গিয়েছিল। পরের ছয় বছরে টাকা জমিয়ে নিজেই একটা ছোট সরাইখানা খুলে বসল স্কাই ভিলেজে এসে। তার পরের বছর কিনে ফেলল একটা স্কি লিফট। সীজনের সময় নিশ্চয় খুব ভাল আয় হয় ওটা থেকে।'

'শুধু একটা চাকরি করেই সরাইখানা কেনার টাকা জমিয়ে ফেলেছিল?'

'না, একটা করেনি। পার্ট-টাইম আরও একটা করত। কিপটেমি করে খেয়ে-পরে যা বাঁচত, সেগুলো ব্যাংকে না রেখে অন্য লোকের ব্যবসায় খাটাত। মহিলা রিঅ্যাল বিজনেসম্যান, আই মীন, উওম্যান। ওই বোনকে নিয়ে খুব গর্ব করে বোরিস আর রোভার। এতদিন দেখা করেনি বটে, তবে চিঠি লেখালেখি চলে। ওদের ঘরে মিলানির অনেক চিঠি আছে, যত্ন করে সব রেখে দিয়েছে। আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার চিঠি পড়ে শোনায়। বোনের ছবিও আছে ওদের ঘরে। কতদিন আমাকে বলেছে, সময় পেলেই স্কাই ভিলেজে আসবে বেড়াতে। এবার পেল সুযোগ...'

'হ্যাঁ, মেরি আন্টি আর রাশেদ আংকেল বেড়াতে চলে যাওয়ায় আরকি। ক'দিন থাকবেন?'

'বলে তো গেছে দুই হপ্তা।'

'দারুণ হয়েছে,' মুসা বলল। 'আমরাও বেড়ানোর একটা ভাল সুযোগ পেলাম। স্কাই ভিলেজের কথা অনেক শুনেছি আমি, বহুদিন থেকেই দেখার ইচ্ছে। শুনেছিলাম, খুব সুন্দর। এখন তো তা-ই দেখছি।'

'হ্যাঁ,' রবিন একমত হল। 'ব্যস্ত মহাসড়ক থেকে দূরে। শহরের কোলাহল নেই, ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই...কিশোর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই যে ছড়াটা, খুব ভাল লাগে যেটা তোমার...কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার...'

'...নেই মানা, মনে মনে,' শেষ করল কিশোর। 'গান। ঘরে বসে থেকে থেকে যখন আর কিছু ভাল লাগে না তখন মনে মনে হারাই, কবির মতই, কিন্তু এখানে কল্পনায় হারাতে যাব কেন? বাস্তবেই হারাব। তবে কথা হচ্ছে, মিলানি চমক পছন্দ করে না বলল কেন অ্যাটেনডেন্ট? আসলে ঠিক তেমনি ভাবে চমকে দিতে আসেওনি বোরিস আর রোভার,' থামল এক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'আসার আগে ফোনে যোগাযোগের অনেক চেষ্টা করেছে, পারেনি। বাড়িতে পায়নি বোনকে। যাকগে, অত ভাবি না। আমরা তো আর মিলানির ঘরে থাকছি না, থাকব বাইরে

ক্যাম্প করে, তাঁবুতে। তেমন বুঝলে বোরিস আর রোভারও আমাদের সঙ্গেই থাকবে।'

উঠেই চলেছে ট্রাক। পথের ধারে এখন পাইনের জটলা। গাছগুলো পেরিয়ে অন্য পাশে বেরোতেই চোখে পড়ল একটা স্কি স্লোপ। পর্বতের পুব ধারে বিশাল একটা ধূসর ক্ষত যেন এখন, বরফে ঢেকে গেলে অবশ্য তখন অন্যরকম লাগে। কোনও গাছ নেই, ঝোপ নেই, এমনকি একটা আগাছাও নেই। যেন বিশাল রেজর দিয়ে জায়গাটাকে শেভ করে দিয়েছে কোনও মহাদানব। ঢাল বেয়ে ছুটে তীব্র গতিতে নিচে নামে স্কিয়াররা, গাছপালা থাকলে বাড়ি খেয়ে মরবে, সে-জন্যেই ওভাবে পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে যাতে কোনও রকম দুর্ঘটনা না ঘটে। ঢালের ধারে এক সারি ইস্পাতের টাওয়ার, তার লাগানো, প্রতি বিশ ফুট পর পর ওই তার থেকে ঝুলছে একটা করে বিশেষ চেয়ার।

পথের বাঁ-ধারে বড় একটা শাদা বাড়ির পাশে এসে গাড়ি থামাল বোরিস। বাড়িটা স্কি স্লোপের একেবারে ধার ঘেঁষে তৈরি হয়েছে। গেটের সামনে বড় সাইনবোর্ডঃ দি স্কাই ইন।

'ঘর-দোর তো বেশ পরিষ্কার রাখে,' বলল রবিন।

বাড়িটা কাঠের তৈরি। নতুন শাদা রঙ চকচক করছে বিকেলের রোদে। জানালার শার্সির কাচ এত পরিষ্কার, প্রায় চোখেই পড়ে না, মনে হয় ওখানে কিছু নেই। স্কাই ভিলেজের অন্যান্য বাড়িঘরের মত মিলানির বাড়িটা সুইস কিংবা অস্ট্রিয়ান স্টাইলে তৈরি হয়নি। সামনে চওড়া বারান্দা, ছড়ানো চত্বর। দরজার রঙ উজ্জ্বল লাল, বারান্দার রেলিঙের ধার ঘেঁষে বসানো সারি সারি ফুলের টবগুলো লাল আর নীল রঙের। বাড়ির বাঁ পাশে খোয়া বিছানো সুন্দর একটা পথ। ছোট একটা পার্কিং এরিয়া, তাতে দাঁড়িয়ে আছে ধুলো-ধূসরিত একটা স্টেশন ওয়াগন আর ঝকঝকে লাল একটা স্পোর্টস কার।

বোরিস আর রোভার নামল। লাফ দিয়ে তিন গোয়েন্দাও নামল পেছন থেকে।

'ভালই চালাচ্ছে, মিলি,' দেখতে দেখতে বলল বোরিস।

'সব সময়ই ভাল চালায় ও,' রোভার বলল। 'মনে নেই তোমার, দশ বছর বয়েসেই মায়ের চেয়ে ভাল পেস্ট্রি বানাত সে? ওর হাতের গরম চকলেট আর পেস্ট্রির স্বাদ এখনও জিবে লেগে রয়েছে আমার।'

হাসল বোরিস। স্কি স্লোপের ওপরে চূড়ার ওপাশে সূর্য ডুবছে। বাতাস ঠাণ্ডা। 'চল, ভেতরে গিয়ে বসি। মিলি এসে দেখে চমকে যাবে। বিশ্বাসই করতে পারবে না আমরা এসেছি। ওর হাতের চকলেট আর পেস্ট্রির স্বাদ নেব আবার।'

বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল দুই ভাই। তিন গোয়েন্দা দাঁড়িয়ে

রইল যেখানে ছিল।

'তোমরা আসবে না?' ফিরে জিজ্ঞেস করল বোরিস।

'আমরা বরং ক্যাম্প করার জায়গায় চলে যাই,' রবিন বলল। 'অনেক দিন পর ভাইবোনে দেখা হবে, হয়ত কান্নাকাটিও শুরু হবে। আমরা থেকে আর বাধা হতে চাই না।'

বোরিস আর রোভার দু'জনেই হেসে উঠল।

'তোমরা কি আর আমাদের পর?' বলল বোরিস। 'তোমাদের কথা অনেকবার চিঠিতে লিখেছি, পড়ে পড়ে নিশ্চয় তোমাদের চেহারাও মুখস্থ হয়ে গেছে মিলির। দেখেই চিনে ফেলবে। সব সময় চিঠিতে অনুরোধ করে আমরা এলে যেন তোমাদেরও নিয়ে আসি।'

এরপর আর কথা চলে না। সিঁড়ির দিকে এগোল তিন গোয়েন্দা। সামনের দরজায় তালা নেই। বিশাল এক ঘরে ঢুকল ওরা। চামড়ায় মোড়া পুরু গদিওয়ালা চেয়ার, আর একটা লম্বা সোফা পেতে রাখা হয়েছে। পিতলের তৈরি ল্যাম্পগুলো চকচক করছে। পাথরের ফায়ার প্লেসের ওপরে তাকে সাজিয়ে রাখা দস্তার তৈরি মগগুলোও ঝকঝকে পরিষ্কার। ডানে বড় ডাইনিং টেবিল। তার ওপাশে রান্নাঘরের দরজা। বাঁ-দিকের দেয়াল ঘেঁষে উঠে গেছে সিঁড়ি, ধাতব অংশগুলোতে এক কণা মরচে নেই, দোতলায় উঠেছে সিঁড়িটা। বাতাসে পোড়া কাঠ আর আসবাবপত্রের পালিশের গন্ধ। মৃদু আরেকটা গন্ধ পেল কিশোর, সুগন্ধ। তাতে তার মনে হল, এখনও খুব ভাল পেস্ট্রি বানায় মিলানি।

'মিলি?' গলা চড়িয়ে ডাকল বোরিস। 'মিলি, ঘরে আছ?' সাড়া দিল না কেউ।

'নেই,' বলল রোভার। ঘুরে ঘুরে ঘরের জিনিস দেখতে লাগল। চামড়ার সোফায় হাত বুলিয়ে হাসল। 'খুব সুন্দর। নাহ্, ভালোই আছে মিলি।'

ডানের একটা দরজার সামনে এসে থামল। ইংরেজিতে লেখা রয়েছেঃ 'ব্যক্তিগত। প্রবেশ নিষেধ।' ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা, ভেজান ছিল। ভেতরে উঁকি দিয়েই বলে উঠল রোভার, 'উঁ!'

'উঁ, কি?' জানতে চাইল মুসা।

'না, নিখুঁত কেউই না। এমনকি আমাদের বোন মিলানি রোজেনডালও নয়।'

রোভারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল তার ভাই। মাথা নাড়ল ধীরে ধীরে। 'কিশোর, কাণ্ড দেখে যাও। পরিচ্ছন্ন মিলির ছন্নছাড়া রূপ!'

'কারও ব্যক্তিগত অফিসে ঢোকা কি উচিত?' পেছন থেকে বলল মুসা। 'অনেকেই পছন্দ করে না। আমার মায়ের ডেস্কে হাত দিলে বাবার ওপরও রেগে

যায় না। হাতব্যাগে হাত দেয়া তো দূরের কথা।'

চেয়ার থেকে উঠছে কিশোর, এই সময় তার দিকে ফিরে তাকাল বোরিস। 'কিশোর, কি যেন গোলমাল হয়েছে!'

'কী?' দুই লাফে দরজার কাছে পৌঁছে গেল কিশোর। উঁকি দিল ছোট ঘরটায়। দরজার দিকে ফেরানো বড় একটা ডেস্ক, ওপরে কাগজের স্তূপ। কাছেই একটা ফাইল কেবিনেটের দুটো ড্রয়ার খোলা। ফাইল, ফোল্ডার আর কাগজপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের দোমড়ানো কাগজগুলো পড়ে আছে ওল্টানো ঝুড়িটার পাশে। ডেস্কের ড্রয়ারগুলো খুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে দেয়ালের কাছে। ডেস্ক চেয়ারের পেছনে জানালার চৌকাঠের নিচের জায়গাটায় স্তূপ হয়ে আছে খাম, ফটোগ্রাফ আর পিকচার পোস্টকার্ড। দেয়াল থেকে টেনে খুলে ফেলা হয়েছে একটা বুককেস। একটা পিন-ট্রে উল্টে পড়ে রয়েছে মেঝেতে, পেপার ক্লিপগুলো ছড়ানো।

'খোঁজা হয়েছে ঘরটায়,' কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে মুসা।

'দেখে তাই মনে হয়,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'হয় কেয়ারই করেনি লোকটা, কিংবা খুব তাড়াহুড়া ছিল। তাই এত বেশি অগোছাল।'

'এই, কি হচ্ছে ওখানে?' পেছনে গর্জে উঠল একটা কর্কশ কণ্ঠ।

ঘুরে দাঁড়াল সবাই।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা। হাতে শটগান।

দুই

'কি হল? জবাব নেই কেন?' ভীষণ ভঙ্গিতে বন্দুকের নল নাড়ল লোকটা। ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল মুসা।

কয়েক পা এগোল লোকটা। লম্বা, চওড়া কাঁধ, কালো ঘন চুল মাথায়। শীতল কঠিন চাহনি। অফিসের দরজার দিকে বন্দুকটা তাক করে রেখে ধমক দিল, 'চুপ কেন?'

'কে…কে আপনি?' বন্দুকের ওপর থেকে চোখ সরাল না রোভার।

জবাব দিল না লোকটা। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তোমরা কে? এখানে কি চাই? দেখছ না, প্রাইভেট লেখা রয়েছে? ওখানে…'

'থামুন থামুন!' লোকটার প্রশ্ন-বান থামানোর জন্যে হাত নাড়ল কিশোর। বড়দের ঢঙে গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনি এখানে কি করছেন, সেটা জানা দরকার আমাদের। আগে সেকথা বলুন।'

'কী?'

'এই ঘরটা সার্চ করা হয়েছে,' অফিসটা দেখিয়ে বলল কিশোর।

'পুলিশও জানতে চাইবে আপনি এখানে কি করছেন। আর শটগান হাতে ধমকই বা দিচ্ছেন কেন?'

কিশোরের কণ্ঠস্বর আর ভাবভঙ্গি দ্বিধায় ফেলে দিল লোকটাকে। বন্দুকের নল নামাল মেঝের দিকে। 'পুলিশ ডাকবে?'

'সেকথাই তো ভাবছি। তবে, আরও একটা কথা ভাবছি, মিস রোজেনডালের ফেরার অপেক্ষা করব কিনা?'

'রোজেনডাল?' হেসে উঠল লোকটা। 'কিছু...'

বাইরে দড়াম করে গাড়ির দরজা বন্ধ হল। চত্বর ধরে দ্রুত এগিয়ে এল জুতোর আওয়াজ। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল লম্বা এক মহিলা, হাতে জিনিসপত্রের প্যাকেট।

'মিলি!' বলে উঠল বোরিস।

স্থির হয়ে গেছে মহিলা। একে একে চোখ ঘুরে গেল বন্দুকধারীর ওপর থেকে বোরিস আর রোভারির দিকে।

'মিলি?' আবার বলল বোরিস, এবার কথাটা শোনাল অনেকটা প্রশ্নের মত।

'মিলি! ওভাবে ডাকার...' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল বন্দুকধারী। 'হায় হায়, বুঝতেই পারিনি! তোমরা নিশ্চয় বোরিস আর রোভার। রকি বীচ থেকে এসেছ। তুমি করে বলে ফেললাম, ভাই, কিছু মনে কোরো না। তোমাদের ছবি দেখিয়েছে আমাকে মিলি। এতবার করে জিজ্ঞেস করছি, নাম বললে না কেন? যদি গুলি করে বসতাম?'

'আপনি কি মিলির বন্ধু?' জিজ্ঞেস করল রোভার।

'হ্যাঁ, তা বলতে পার। মিলি, তোমার ভাইদের জানাওনি? লেক ট্যাহোইতে যাওয়ার আগেই তো তোমাকে বলেছি চিঠি লিখতে।'

'বোরিস? রোভার!' তাড়াতাড়ি টেবিলে প্যাকেটগুলো নামিয়ে রাখল মিলানি। সোনালি ঘন চুলের বেণিতে হাত ছোঁয়াল একবার। হাসল বিমল হাসি। 'ভাইয়েরা আমার! শেষতক এলে। বোনকে দেখতে ইচ্ছে হল।' দু'হাত বাড়িয়ে দিল বোরিসের দিকে।

এগিয়ে এসে মিলানির গালে চুমু খেল বোরিস।

'ইস, কতদিন পর...' রোভারের দিকে হাত বাড়াল মিলানি।

রোভারও এসে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে ভাইকে সরিয়ে চুমু খেল বোনের গালে।

'এত বড় হয়ে গেছ তোমরা! দেখে বিশ্বাসই হতে চায় না,' বলল মিলানি। 'ছবিতে দেখেছি, তা-ও চিনতে পারছি না কে বোরিস আর কে রোভার।' দ্রুত কথা বলছে, কথায় কোনরকম বিদেশী টান নেই।

হেসে উঠল দুই ভাই। যার যার নাম বলল। তারপর পরিচয় দিল তিন গোয়েন্দার।

'ও, তোমরাই,' হেসে বলল মিলানি। 'তোমাদের কথা অনেক লিখেছে আমার ভাইয়েরা।'

'খুব ভাল ছেলে ওরা,' বলল বোরিস।

জার্মানীতে কিছু বলে কিশোরের পিঠে আলত চাপড় দিল রোভার।

মুহূর্তে মিলির হাসি মুছে গেল। 'ইংরেজি বল।'

কিন্তু আবার জার্মান বলল রোভার।

'বুঝি, বুঝি,' জবাব দিল মিলানি। 'সবই বুঝতে পারছি। দেশী ভাষায় কথা বলে ঘরোয়া পরিবেশ চাইছ। কিন্তু ইংরেজিই বলতে হবে আমাদের।' বন্দুকধারীর কাছে গিয়ে ওর বাহুতে হাত রাখল সে। 'আমার স্বামী জার্মান বোঝে না। ওর সামনে আমরা কথা বলব, আর ও কিছু বুঝবে না, এ-তো হতে পারে না।'

'তোমার স্বামী?' ইংরেজিতেই বলল এবার রোভার।

'মিলি!' চেঁচিয়ে উঠল বোরিস। 'কবে? কখন...'

'গত হপ্তায়,' জবাব দিল মিলানির স্বামী। 'লেক ট্যাহোইতে বিয়ে করেছি আমরা। আমার নাম মিক কনর।'

স্তব্ধ নীরবতা।

'বোরিসভাই, পারেননি,' নীরবতা ভাঙল মুসা। 'বোনকে সারপ্রাইজ দিতে পারেননি। উনিই বরং আপনাদেরকে চমকে দিলেন।'

হেসে উঠল দুই ব্যাভারিয়ান। বোনকে জড়িয়ে ধরে 'গুড লাক' জানাল। বিয়ের আঙটি দেখাল মিলানি। বাঁ হাতের তৃতীয় আঙুলে পড়েছে, সোনার একটা সাধারণ আঙটি। ঠিকমত লাগেনি, সামান্য ঢিলে। আর এতই সাধারণ, ওয়েডিং রিং মনেই হয় না। সচরাচর পরার জিনিস।

ভগ্নিপতিকেও স্বাগত জানাল দুই ভাই

অসমাপ্ত রহস্য মোটেও পছন্দ নয় কিশোর পাশার। পরিচয়, হাসাহাসি আর চেঁচামেচির পালা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'মিসেস রোজে...সরি, কনর, ঘরের অবস্থা এসে দেখে যান। কে জানি কি খুঁজেছিল। পুলিশকে খবর দেয়া দরকার...'

হেসে উঠল মিলানি। 'তাই, না? বোরিস আর রোভার অবশ্য লিখেছে তোমরা

গোয়েন্দা।'

তাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করুক কেউ, এটা আরও পছন্দ করে না কিশোর। গম্ভীর হয়ে গেল।

'না না, রাগ কোরো না,' তাড়াতাড়ি হাত তুলল মিলানি। 'আমি শুনেছি তোমরা খুব ভাল গোয়েন্দা। ঠাট্টা করিনি। হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। খোঁজা হয়েছে। আমরা দু'জনে খুঁজেছি,' স্বামীকে দেখাল সে।

চুপ করে আছে কিশোর। কি খুঁজেছে জিজ্ঞেস করল না।

'চাবি, বুঝেছ, একটা চাবি হারিয়েছি। ওটা খুঁজে বের করা খুব জরুরী। তাই তন্ন তন্ন করে খুঁজছি।'

'আমরা আপনাদের সাহায্য করতে পারি,' যেচে পড়ে বলল মুসা। 'হারানো জিনিস খুঁজে বের করতে ওস্তাদ কিশোর...'

'হ্যাঁ,' মুসার সঙ্গে গলা মেলাল রবিন। 'কিশোর চেষ্টা করলে বের করতে পারবে।'

'থ্যাংক ইউ,' বলল কনর। 'তবে একটা চাবির জন্যে তোমাদেরকে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। বাড়িতেই আছে কোথাও। আমরাই খুঁজে বের করে নেব।'

'বেশ,' বলল কিশোর। 'দেখুন, পারেন কিনা। হয়ত বেরোবে চাবিটা। তা, আমরা তো আর দেরি করতে পারছি না; অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। তাঁবু খাটাতে হবে। জলদি না করলে রাতের আগে পারব না।'

'আমরাও যাই,' বলল বোরিস। 'শীঘ্রি আবার এসে দেখা করব, হ্যাঁ?'

'আরে না না, কি যে বল,' আন্তরিক হাসি ফুটল কনরের ঠোঁটে। 'মিলি, বিয়ের উৎসব তো আর করা হল না আমাদের। তোমার ভাইয়েরা যখন এসেই পড়ল, এইই সুযোগ। সেরে ফেলি, কি বল? আর দুই সম্বন্ধী গিয়ে বাইরে ক্যাম্পে রাত কাটাবে, এটাও কেমন দেখায়? খালি ঘর তো আছেই, ওখানেই থাকতে পারবে। এই উৎসবে আমাদের পেইং গেস্টদেরও শামিল করে ফেলব।'

প্রস্তাবটা মিলানির পছন্দ হল বলে মনে হল না। তার মুখ দেখে সেটা বুঝতে পারল বোরিস। প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল সে, তার আগেই বলে উঠল রোভার, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালই বলেছেন। আমরা ছাড়া মিলির আর কে আছে? তার বাবা, মানে আমাদের খালুও তো মারা গেছেন।'

'হ্যাঁ, মিলি বলেছে আমাকে,' কনর জানাল।

'বাবা নেই। আমরাই এখন মিলির একমাত্র আত্মীয়, তার হয়ে কথা বলতে পারি, কিছু করতে পারি।' বোনের দিকে চেয়ে জার্মানীতে কি যেন বলল রোভার।

'ইংরেজি, ভাই, প্লীজ,' বাধা দিল মিলানি। 'মিকের সম্পর্কে কিছু বললে,

আমাদের বিয়ের আগে বলতে পারতে। এখন আর ওসব আলোচনা করে কি হবে?'

'কিন্তু মিলি, একবারও বলোনি, আভাসও দাওনি তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ।'

'তোমাদেরকে বলার কোনও দরকার মনে করিনি। ভেব না। মিক ভালই রোজগার করে। আমার সঙ্গেই থাকবে এখন থেকে। তার নিজের আয় আপনাআপনিই আসবে, সেটা নিয়ে ভাবনা নেই। এখন আমার ব্যবসা চালাতেও সাহায্য করবে। ওসব এখন আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, তোমাকে ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।'

লাল হয়ে গেল রোভার। একেবারে চুপ।

ভাইয়ের সঙ্গে ওভাবে কথা বলা উচিত হয়নি, স্ত্রীকে এটা বোঝাতে গেল কনর। কিন্তু তাকে সুযোগ দিল না মিলানি। টেবিল থেকে প্যাকেটগুলো তুলে নিয়ে, দুই ভাইয়ের দিকে একবারও না তাকিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে।

'আমরা বরং চলেই যাই,' মুখ দেখেই বোঝা যায় মন খারাপ হয়ে গেছে বোরিসের।

'কি যে বল,' হাসিমুখে বলল কনর। 'এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন? মিলির মেজাজ খারাপ এখন। দেখ, খাবার টেবিলে সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাদের দেখে ও খুশিই হয়েছে, ভাব যা-ই দেখাক। তোমাদের সম্পর্কে কত কথা বলেছে আমাকে। আসলে অনেক দিন একা থাকতে থাকতে একঘরে স্বভাবের হয়ে গেছে, লোকজন বেশি পছন্দ করে না। আর বড়ও তো হয়েছে, তোমাদের ছোটবেলার সেই ছোট্ট মিলি-বোনটি আর নেই। তাই তোমাদের মুরুব্বিয়ানাটা ঠিক সইতে পারেনি। হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখ।'

গাল ডলল রোভার। 'আমিই একটা গাধা। বোন যে বড় হয়েছে, স্বভাব বদলেছে, একবারও ভেবে দেখিনি। বড় ভাই সাজতে গিয়েছিলাম।'

'বাদ দাও ওসব কথা। বললাম না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ঠিকই বলেছে কনর।

বাড়িটাকে হোটেল না বলে বরং আধুনিক সরাইখানা বলা ভাল। উত্তর পাশের বড় একটা ঘরে এনে নিজেদের মালপত্র রাখল বোরিস আর রোভার। মোট চারটে বেডরুম। দুটোতে দু'জন পেইং গেস্ট থাকে। তারমানে আর কোনও ঘর খালি নেই। উত্তর দিকে, বাড়িটার ডানপাশে কয়েকটা পাইন গাছের নিচে তাঁবু খাটাল তিন গোয়েন্দা। কনরই এই পরামর্শ দিয়েছে তাদেরকে। ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ডে যেতে বারণ করেছে, কারণ পানির অভাব। ওখানে একটা ঝর্না আছে বটে, কিন্তু বছরের এই সময়ে যেহেতু বরফ থাকে না, বরফগলা পানিও নামে না ঝর্না বেয়ে। কাজেই

সরাইখানার কাছাকাছি থাকাই ওদের জন্যে ভাল। যখন যা দরকার এসে নিয়ে যেতে পারবে। রাতে ছেলেদেরকে ডিনারের দাওয়াতও দিয়ে ফেলল কনর।

ডিনারের আগে গেস্ট দু'জনের সঙ্গে পরিচয় হল তিন গোয়েন্দার। মিস্টার ডোনার; রোগাটে হাড্ডিসর্বস্ব ছোটখাট একজন মানুষ, বয়েস পঞ্চাশ হতে পারে, বেশিও হতে পারে। পরনে হাফ প্যান্ট, হাইকিং বুট ঢলঢল করছে প্যাকাটির মত পায়ে। শক্ত করে পেঁচিয়ে বেঁধেছেন জুতোর ফিতে। মিস্টার কারসন হচ্ছেন ঠিক উল্টো। বয়েস কম, লম্বা, সুঠামদেহী। খাটো করে ছাঁটা ধূসর চুল। চেহারাও মোটামুটি আকর্ষণীয়।

রান্নাঘর থেকে ভাজা মাংসের প্লেট নিয়ে ঢুকল মিলানি।

নাখোশ হয়ে জিভ দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে মিস্টার ডোনার বললেন, 'গরু!'

'দয়া করে লেকচার দেবেন না, মাপ চাই,' হাত তুললেন মিস্টার কারসন। 'গরু আমার খুব ভাল লাগে। ভাজা হলে তো কথাই নেই। আপনার জ্বালায় তো মাংস খাওয়ার জো নেই, এমনভাবে বলেন, নিজেকে শেষে খুনী মনে হয়।'

'জন্তুজানোয়ারেরা আমাদের বন্ধু,' বললেন ডোনার। তাঁর ঘোলাটে নীল চোখ কারসনের ওপর নিবদ্ধ। 'বন্ধুরা একে অন্যের মাংস খায় না।'

মেজাজ ভাল হয়ে গেছে এখন মিলানির। ডোনারের দিকে চেয়ে হাসল। 'গরুকে বন্ধু ভাবার কোনও কারণ নেই। গিয়ে খুঁচিয়ে দেখুন না, শিং দিয়ে পেট ফুটো করে দেবে। গাইগুলো তো আরও খারাপ।'

'গাইয়েরা মেয়ের জাত,' মনে করিয়ে দিলেন ডোনার। 'তাদেরকে আরও বেশি শ্রদ্ধা করা উচিত।'

'ষাঁড়েরা সেকথা ভাবুক গিয়ে। আর আপনাকেও মাংস খেতে হবে না। নিরামিষ করেছি। মাখন আছে, গাজর আছে, বাঁধাকপি...'

'চমৎকার!' খুশি হয়ে ন্যাপকিন টেনে নিয়ে কোলের ওপর বিছালেন ডোনার, নিরামিষ ভোজনের জন্যে তৈরি হলেন।

কারসন আড়চোখে তাকিয়ে রয়েছেন কনরের হাতের ছুরির দিকে। গরুর ভাজা মাংস বড়বড় টুকরো করে কাটছে কনর।

'এই সীজনে হরিণ খাবার কথা কখনও ভেবেছেন?' কনরের দিকে চেয়ে বললেন কারসন। 'আজ বিকেলে বিশপের ওদিকে যাচ্ছিলাম। দেখি রাস্তার ওপরই হরিণ দাঁড়িয়ে আছে। দিলাম শ্যুট করে।'

'গুলি?' ভুরু তুলল রবিন।

'আরে, মিস্টার কারসনের কথা বল না,' তিক্ত কণ্ঠে বললেন ডোনার। 'হিংস্র মাংসাশী জানোয়ার। শিকারের আইন না থাকলে সত্যি সত্যিই গুলি করে বসত।

দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়েছে আরকি। বন্দুক তো আর চালাতে পারেনি, ক্যামেরা চালিয়েছে। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলেছে, সে-কথাই বলছে। আর শব্দচয়ন কি! শ্যুট, হাঁহ!'

ডোনারের কথায় কান দিলেন না কারসন। 'আমি একজন প্রফেশন্যাল ফটোগ্রাফার,' ছেলেদের জানালেন। 'জন্তুজানোয়ারের ছবি তুলতে বেশি ভালবাসি। অনেক ম্যাগাজিন আছে, ওসব ছবির জন্যে ভাল টাকা দেয়।'

'ছবি তুলে টাকা খাওয়া, আর ওদের মাংস খাওয়া একই কথা।'

'কি করে এক কথা হল?' প্রতিবাদ করলেন কারসন। 'আমি তো শুধু ছবি তুলি। কোনও ক্ষতি করি?'

ভাজা মাংসের গন্ধে নাক কুঁচকালেন ডোনার।

বড় একটা টুকরো কারসনের প্লেটে তুলে দিল কনর। 'মিস্টার ডোনার, হাওয়া বদল করতে এসেছেন,' মেহমানদের জানাল সে। 'এসেছেন ভাল জায়গায়ই। আমিও খুব প্রেরণা পাচ্ছি। প্রায়ই তিনি উঠে যান উঁচু এলাকায়। স্কি স্লোপের ওপরে একটা তৃণভূমি আছে, তার ওপরে বন, মাইলের পর মাইল। ভাবছি, শুধু শীতকালে ব্যবসা করব কেন? গরমকালেও করতে পারি। ওই বনে ট্যুরিস্ট নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি। বুনো পরিবেশে বন্য জানোয়ার দেখতে পছন্দ করে অনেকে। তারা আসবে। থাকাখাওয়ার ভাল ব্যবস্থা করতে পারলেই হল।'

সেদ্ধ তরকারি চিবুতে চিবুতে মুখ তুললেন ডোনার। 'বুনো পরিবেশ তাহলে আর বেশি দিন বুনো থাকবে না।'

'আমার তা মনে হয় না। কয়েকজন ট্যুরিস্ট এলে আর বনের এমন কি ক্ষতি হবে? পাখিরা মানুষ হরহামেশাই দেখে। এখানকার ভালুকেরাও দেখে।'

'ওগুলো তো এখন নেড়ি কুত্তা হয়ে গেছে,' বলে উঠলেন কারসন। 'ডাস্টবিনে খাবার খুঁজতে আসে। কালরাতেও এসেছিল...'

'ময়লা ছড়িয়ে নোংরা করে দিয়ে গেছে চত্বর,' কথাটা শেষ করে দিল কনর।

'ওদের কি দোষ?' ভালুকের পক্ষ নিলেন ডোনার। কি শুকনোই না যাচ্ছে এ-বছরটা। বনের মধ্যে নিশ্চয় খাবারের অভাব হয়েছে, তাই গাঁয়ে এসেছে খাবার খুঁজতে। এখানে কার অধিকার সব চেয়ে বেশি? বন আগে থেকেই ছিল, ভালুকেরাও ছিল। মানুষেরাই তো ওদের এলাকায় উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।'

'ওই বিশেষ ভালুকটা ছিল না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল কনর। 'ওটা একটা আস্ত শয়তান। আর না এলেই ভাল করবে।'

'বর্বরের মত কথা!'

জোরে টেবিলে চাপড় মারল মিলানি। 'থামুন তো আপনারা! খেতে বসলেই

খালি ঝগড়া। আজ রাতে মেহমান আছে আমাদের, দেখতেই পাচ্ছেন···মিক, তোমারও একটু বুঝেশুনে কথা বলা উচিত। অন্তত আজকে।'

অস্বস্তিকর নীরবতা। কি বলে আবার পরিবেশটাকে সহজ করা যায়, সেকথা ভাবছে কিশোর। তাঁবু খাটানোর সময় দেখেছিল, একটা জায়গা খোঁড়া হচ্ছে। মিলানির দিকে চেয়ে বলল, 'নতুন কিছু করছেন নাকি? সরাইয়ের পেছনে মাটি খুঁড়ছে দেখলাম। নতুন বাড়ি তুলবেন?'

'না,' কনর জবাব দিল। 'সুইমিইং পুল।'

'সুইমিং পুল?' বোরিস অবাক। 'এই এলাকায় সুইমিং পুল? এই ঠাণ্ডার দেশে?'

'দুপুর বেলা সাংঘাতিক গরম পড়ে। তাছাড় ঠাণ্ডা পানি থাকবে না, গরম করার ব্যবস্থা হবে। বনের ভেতর থেকে ঘেমে এসে গোসল করতে ভালই লাগবে লোকের। ওপরে ছাওনি তুলে দেব শীতকালে। ঠাণ্ডা বরফে স্কিইং করে এসে গরম পানিতে গোসল, কি আরাম হবে ভাব একবার!'

'বড় বড় কল্পনা আপনার, তাই না?'

কারসনের কথার ধারটা কিশোরের কান এড়াল না।

'বিরক্ত হচ্ছেন নাকি?' প্রশ্ন করল কনর।

কারসন জবাব দেয়ার আগেই বাড়ির পেছনে ঝনঝন করে পড়ল কি যেন। তারপর হুড়মুড় শব্দ। নিশ্চয় ডাস্টবিন উল্টে পড়েছে।

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল কনর। এগিয়ে গেল সিঁড়ির নিচের ছোট আলমারির দিকে।

'নাআ!' চেঁচিয়ে উঠলেন ডোনার।

নিষেধ শুনল না কনর। আলমারি থেকে বন্দুক বের করে ঘুরল।

'না না!' লাফ দিয়ে উঠে রান্নাঘরের দিকে দৌড় দিলেন ডোনার।

পেছনে দৌড় দিল কনর। তাদের পেছনে ছুটল বোরিস, রোভার আর তিন গোয়েন্দা। ওরা রান্নাঘরে ঢুকতে ঢুকতে টান দিয়ে পেছনের দরজা খুলে ফেলেছেন ডোনার। চেঁচাতে লাগলেন, 'হেই হেই, ভাগ! পালা! যা, যা!'

হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে হালকা মানুষটাকে সরিয়ে দিল কনর।

পলকের জন্যে দেখল ছেলেরা, বড়, কালো একটা ছায়া দৌড়ে চলে যাচ্ছে স্কি স্লোপের ধারে গাছগুলোর দিকে।

বন্দুক তুলে ট্রিগার টিপে দিল কনর। বুমম করে গুলি ফুটল না। ফট করে উঠল, তারপর মৃদু একটা শিস।

'ধুর!' বিরক্ত হয়ে বলল কনর।

'মিস করেছেন, না?' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ডোনার।

রান্নাঘরে ফিরে এল কনর। 'আপনি···আপনি না···'

'···ধরে চাবকাতে ইচ্ছে করছে আমাকে? হি-হি!' আকর্ণ বিস্তৃত হল ডোনারের হাসি।

কিশোরের হাত ধরে টানল মুসা। বের করে নিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। খাবার টেবিলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ফিসফিস করে বলল, 'বন্দুকটা দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ট্র্যাংকুইলাইজার গান। ভারি অদ্ভুত! ঘরে শটগান থাকতে ওই জিনিস নিয়ে তাড়া করল কেন?'

তিন

স্লীপিং ব্যাগের ভেতরে ঢুকে অন্ধকারে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। 'তিন গোয়েন্দা আরেকটা কেস পেল!'

তাঁবুতে তার পাশে শুয়েছে রবিন। এক কনুইয়ে ভর দিয়ে গা তুলল। 'চাবিটা কি খুঁজব আমরা?'

'না। ডিনারের পর বোরিস আর রোভারের সাথে কথা হয়েছে আমার। মিলানির স্বামীর ব্যাপারে তদন্ত করতে বলল আমাকে। লোকটাকে নাকি সুবিধের লাগছে না ওদের।'

শব্দ করে হাই তুলল মুসা। 'আমার কাছেও লাগেনি। খালি কথায় কথায় বন্দুক বের করে।'

'আর ভালুক তাড়াতে ট্র্যাংকুইলাইজার গান বের করে,' তার কথার পিঠে বলল কিশোর। 'শটগান রাখা স্বাভাবিক, কিন্তু অন্য অস্ত্রটা কেন রেখেছে? বন্দুকের ব্যাপারে কোনও মাথাব্যথা নেই বোরিস আর রোভারের, ওরা ভাবছে সুইমিং পুলের কথা। ওদের ভয়, মিলানি একটা ছাগলকে বিয়ে করেছে। কাজ-কর্ম যে কিচ্ছু বোঝে না। বড় বড় বেহুদা পরিকল্পনা করে টাকা নষ্ট করবে শুধু শুধু, ফতুর করে দেবে ওদের বোনকে। ঠিকই বলেছে। সরাইখানাটায় আছেই মোটে তিনটে গেস্টরুম, তার জন্যে এতবড় এক সুইমিং পুল কেন?

'বোরিস আর রোভার আরেকটা ব্যাপারে চিন্তিত। মিক কনরের কোনও কাজ নেই, চাকরি-বাকরি করে না। ওদের মতে, ওর বয়েসী একজন লোকের অবশ্যই কোনও না কোনও কাজ করা উচিত, যাতে পয়সা আসে। ঘরে মালপত্র গোছানোর সময় নাকি কনরকে জিজ্ঞেস করেছিল ওরা। কনর জবাব দিয়েছে, পৈত্রিক সূত্রে অনেক টাকা পেয়েছে সে। কাজ করার দরকার নেই। রিনোতে দেখা হয়েছে

মিলানির সঙ্গে, পরিচয় হয়েছে, বিয়ে করবে ঠিক করেছে। পার্কিং লটে লাল স্পোর্টস কারটা যে দেখলাম, ওটা নাকি তার। নেভাডার নাম্বার প্লেট লাগানো। কাজেই রিনোর কথাটা বোধহয় মিথ্যে বলেনি।'

'কি করব তাহলে?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'রিনোতে গিয়ে তার পড়শীদের সঙ্গে আলাপ করব?'

'দরকার নেই। রবিন, তোমার বাবা রিনোতে কাউকে চেনেন?'

'রিনো? না, ওখানকার কারও কথা বলতে শুনিনি বাবাকে। তবে বলে দেখতে পারি, মিক কনরের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে।'

'ঠিক আছে। কাল সকালে ফোন কোরো।' ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁবুর কানা তুলে বাইরে তাকাল কিশোর। সরাইখানার সমস্ত জানালা অন্ধকার, একটা ছাড়া। 'মিলানির অফিসে মিক কনর।'

মুসাও বেরোলো ব্যাগ থেকে। কিশোরের মতই তাঁবুর কানা উঁচু করে তাকাল।

জানালায় পর্দা না থাকায় কনরকে দেখা যাচ্ছে। জানালার দিকে পেছন করে ডেস্কের সামনে বসেছে। কাগজ গুছিয়ে ফাইল রাখছে।

'অবাক লাগছে,' মুসা বলল। 'কাজটা করার কথা মিলানির। পরিচ্ছন্নতা সে-ই ভালবাসে।'

'মিলানি হতাশ করেছে আপনাকে,' বলল কিশোর। 'বোরিস আর রোভারকেও। ওদের দেখে খুশি হয়নি মহিলা। দেশী ভাষায় কথা বলতে চায়নি। কথা তেমন একটা বলেওনি, স্বামীটাই তো যা বলার বলল।'

গরম শার্ট আর জিনসের প্যান্ট মুসার পরনে। অন্ধকার হাতড়ে জুতো খুঁজে বের করে পায়ে গলাল। 'খিদে লেগেছে আমার। কনর তো জেগেই রয়েছে। গিয়ে বলে দেখি, এক গেলাস দুধ আর মিলানির হাতের একআধটা পেস্ট্রি দেয় কিনা।'

'এখনই আবার খাবে?' বলে কিশোরও জুতো খুঁজতে শুরু করল।

রবিনও বেরিয়ে এল ব্যাগ থেকে। 'আমিও যাব।'

'এই, থাম!' হঠাৎ বলে উঠল কিশোর।

স্থির হয়ে গেল মুসা আর রবিন। তাঁবুর পেছনে মৃদু আওয়াজ—চাপা গোঙানি আর ফোঁসফোঁসানির মিশ্রণ।

'ভালুক!' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা।

মট করে একটা শুকনো ডাল ভাঙল। খচমচ করে উঠল কি যেন, বোধহয় জানোয়ারটার পায়ে লেগে গড়িয়ে গেল একটা পাইনের মোচা। দেখা গেল ওটাকে। তাঁবুর দিকে ফিরে থামল। জানালার আলোর পটভূমিতে দেখল ওটাকে

ছেলেরা। ভালুকই। বিশাল। ওদের দিকে ফিরে নাক টানল।

'যা যা, ভাগ!' বলল বটে, গলায় জোর নেই মুসার।

নড়ল না ভালুকটা। ছেলেদের দিকে চেয়ে রয়েছে। ওরাও চেয়ে রয়েছে ওটার দিকে। কেউ নড়ছে না। অবশেষে তিন কিশোর আর তাঁবুর প্রতি আগ্রহ হারাল জানোয়ারটা। একবার নাক ঝেড়ে রওনা হল সরাইয়ের পেছন দিকে।

'খাইছে!' চেপে রাখা নিঃশ্বাস ফোঁস করে ছাড়ল মুসা। 'এত বড়!'

'খাবার খুঁজতে গেল,' গলা কাঁপছে রবিনের।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই ধুড়ুম করে উল্টে পড়ল ময়লা ফেলার ড্রাম। লাফিয়ে উঠতে দেখা গেল কনরকে। সে দরজার কাছে পৌঁছার আগেই সরাইয়ের পেছনে জ্বলে উঠল তীব্র নীল-শাদা আলো। মুহূর্ত পরেই শোনা গেল একটা বিচিত্র বুনো চিৎকার, তারপর আরেকটা চিৎকার—মানুষের!

হুড়োহুড়ি করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল তিন গোয়েন্দা। বাড়িটার মোড় ঘুরেই দেখল, স্কি স্লোপের দিকে ছুটে চলে যাচ্ছে একটা ছায়ামূর্তি। সরাইয়ের দক্ষিণে গাছের জটলার ভেতরে ডাল ভাঙার শব্দ হল, পাতা সরার সড়াৎ সড়াৎ। অন্ধের মত ওগুলোর ভেতর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে কেউ।

পেছনের দরজার ওপরের আলো জ্বলল। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। ট্র্যাংকুইলাইজার গান হাতে লাফ দিয়ে বেরোল কনর। ছেলেদের দিকে তাকিয়ে রইল এক মুহূর্ত, তারপর ফিরল ছড়িয়ে পড়া ময়লার দিকে। অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল মুখ থেকে।

ময়লার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে মিস্টার কারসন। গায়ে বাথরোব, পরনে পায়জামা। এক পায়ে স্লীপার আছে, আরেকটা গিয়ে পড়েছে দূরে। ক্যামেরাটা পড়ে রয়েছে তাঁর পাশে, ভেঙে চুরমার।

'কে একাজ করল...?' চেঁচিয়ে বলল কনর।

'অতিথি এসেছিল,' বলল কিশোর। পড়ে থাকা ফটোগ্রাফারের ওপর ঝুঁকল। 'ভালুক। মনে হয় ব্যথা পেয়েছেন, মিস্টার কারসন।'

চার

বন্দুক রেখে বেহুঁশ কারসনের পাশে বসে পড়ল কনর। 'কি হয়েছে, দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোরের দিকে ফিরে।

'একটা ভালুককে দেখলাম আমাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে যেতে,' রবিন জবাব দিল। 'বাড়ির পেছন দিকে যেতে দেখলাম। ড্রাম উল্টে পড়ার শব্দ হল। আলো

দেখলাম। ভালুকটাই বোধহয় চেঁচিয়ে উঠল। আর তারপরই শুনলাম মানুষের চিৎকার।'

সরাইয়ের প্রতিটি ঘরে আলো জ্বলেছে। দরজায় দেখা দিল মিলানি। 'মিক, কি ব্যাপার?'

'কারসন। ফ্ল্যাশগান জ্বেলে ভালুকের ছবি তোলার চেষ্টা করেছিল। মার খেয়ে এখন বেহুঁশ। ডাক্তারের কাছে নিতে হবে।'

মিলানির পেছন থেকে বেরিয়ে এলেন ডোনার। ঘাড়ের কাছের পাতলা কয়েকটা চুল এলোমেলো। বাথরোব উল্টো করে পরে এসেছেন। 'এত গোলমাল কিসের?'

বোরিস আর রোভারও চত্বরে বেরিয়ে এল।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল বোরিস।

গুঙিয়ে উঠলেন কারসন। বাঁকা করে হাঁটু তুলে নিলেন বুকের কাছে, তারপর কষ্ট করে উঠে বসলেন।

সিঁড়িতে গিয়ে ধপ করে বসল কনর। চেহারায় ভয়, একই সঙ্গে স্বস্তির লক্ষণ। 'ঠিক আছেন আপনি?' কারসনকে জিজ্ঞেস করল।

মুখ বাঁকালেন ফটোগ্রাফার। ঘাড় ডললেন। 'কেউ···কেউ···'

'বেঁচে যে আছেন এই যথেষ্ট। খালি রদ্দাই তো মেরেছে। মাথায় থাবাটাবা মারলে গেছিলেন।'

উঠে এসে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন কারসন। 'হ্যাঁ, বোধহয় রদ্দাই মেরেছে।' মাথা ঝাড়া দিয়ে যেন পরিষ্কার করতে চাইলেন ভেতরটা। 'তবে ভালুক নয়, অন্য কিছু। চুপে চুপে এল পেছন থেকে।'

'আর কে আসবে মারতে? ভালুকই। ফ্ল্যাশগানের আলো দেখে ভয় পেয়ে মেরেছে থাপ্পড়।'

'না, ভালুকটা ছিল সামনে। জানালা দিয়ে ওটাকে দেখে, তাড়াতাড়ি ক্যামেরা নিয়ে বাইরে এলাম। আমিও ক্যামেরার শাটার টিপলাম···ব্যস, পেছন থেকে ধ্যাপ!' মিলানির পাশে ডোনারকে দেখে জ্বলে উঠল কারসনের চোখ। 'আপনি, আপনার কাজ! কি মনে করেছিলেন? আপনার দোস্তের ক্ষতি করব?'

উঠে গিয়ে কারসনের হাত ধরল কনর। 'এত উত্তেজিত হবেন না। চলুন, ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

'নিকুচি করি ডাক্তারের। পুলিশকে দরকার আমার, পুলিশ!'

'মিস্টার কারসন,' এগিয়ে এল কিশোর। 'দ্বিতীয় আরেকটা ভালুক হয়ত এসেছিল। আপনার চিৎকার শুনেই আমরা দৌড়ে এসেছি। আরেকটাকে দৌড়ে

যেতে শুনলাম স্কি স্লোপের দিকে, ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে গেল।'

'ভালুকে মারেনি আমাকে!' কড়া চোখে ডোনারের দিকে তাকালেন কারসন।

'তবে কি আমি মেরেছি? আমি ছিলাম ঘুমিয়ে। মিসেস কনরকে জিজ্ঞেস করুন। উনি হলে ছিলেন। আমাকে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছেন।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল মিলানি। 'হ্যাঁ, মিস্টার কারসন। একটা আওয়াজ শুনে তাড়াতাড়ি ড্রেসিংগাউন পরে বেরিয়ে এলাম। সিঁড়ির ওপরে এসে দেখলাম মিস্টার ডোনার দরজা খুলে বোরোচ্ছেন।'

'খুব দ্রুত ঘটে গেছে সব কিছু,' বলল কনর। 'মিস্টার কারসন, আপনার ভাগ্য ভাল, মাথায় যে মারেনি। তাহলে মরেই যেতেন।'

'সে-তো আমিও বলি। কিন্তু থাবা মারেনি, মেরেছে রদ্দা। ভালুক আবার রদ্দা মারতে শিখল কবে থেকে?'

'আসুন, ভেতরে আসুন, ডাক্তার ডাকি,' কারসনের গোঁয়ার্তুমিতে রেগে যাচ্ছে কনর।

'ডাক্তার লাগবে না আমার, কতবার বলব!' চেঁচিয়ে বললেন কারসন। 'পুলিশ ডাকুন। একটা সাংঘাতিক ক্রিমিন্যাল ঘোরাঘুরি করছে এদিকে।'

'ঠিকই বলেছেন,' খোঁচা মারলেন ডোনার। 'ভাল লোকেরা তো এত রাতে থাকে বিছানায়, ঘুমায়। ফ্ল্যাশগান আর ক্যামেরা নিয়ে কাউকে জ্বালাতে বেরোয় না।'

'আমার ক্যামেরা!' হঠাৎ মনে পড়ল যেন কারসনের। 'হায় হায়, গেল!' ঝুঁকে তুলে নিলেন ভাঙা দুটো টুকরো। ফিল্মটা বেরিয়ে ঝুলছে। 'সেরে দিয়েছে!' বলেই আড়চোখে তাকালেন ডোনারের দিকে।

'দোষটা কার?' ভুরু নাচালেন ডোনার। 'হাত থেকে ফেলে দিলে ক্যামেরা তো ভাঙবেই। পুলিশ ডাকতে বলছেন তো? ডাকাই উচিত। ওদের সঙ্গে আমারও কিছু জরুরী কথা আছে। আমি শুতে যাচ্ছি। পুলিশ এলে আমাকে খবর দেয়ার অনুরোধ করছি।' কারসনকে আরও রাগিয়ে দিয়ে গটমট করে চলে গেলেন জন্তুপ্রেমিক।

'মিস্টার ডোনার ঠিকই করেছেন,' বলল কনর। 'আমাদের সবারই শুতে যাওয়া উচিত।' তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরল। 'আজ রাতে আর তাঁবুতে থেক না। ভালুকগুলো খেপেছে। রাতে আবার কি করে বসে ঠিক নেই।'

'ভালুক নয়!' চেঁচিয়ে উঠলেন কারসন।

'তাহলে কে? হঠাৎ করে কার মাথায় ভূত চাপল? রাতবিরেতে লোকের ঘাড়ে এসে রদ্দা মারার এত শখ হল কার? এখনও বলুন, ডাক্তার ডাকব কিনা? আর

শেরিফকে ডাকলে কি হবে? এসে আপনাকে পরামর্শ দেবেন, রাতের বেলা একা বাইরে না বেরোতে। নাকি?'

কথাটা ঠিক। কারসনও সেটা বুঝলেন। 'বেশ! পুলিশ ডাকার দরকার নেই। তবে ডাক্তারও আমার লাগবে না।' সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে, ঘাড় ডলতে ডলতে ঢুকে গেলেন রান্নাঘরে।

পনের মিনিট পর, স্লীপিং ব্যাগগুলো তাঁবু থেকে সরাইখানার লিভিং রুমে নিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। ওপর তলায় খুটখাট আওয়াজ পুরোপুরি থেমে যাওয়ার পর অন্ধকারে মুসা বলল, 'কারসনের কপাল সত্যি ভাল। ঘাড়ে ভালুকের থাবা খেয়েও এখনও বেঁচে রয়েছে।'

'আমিও তাই ভাবছি, সেকেণ্ড,' বলল কিশোর। 'ভালুকই যদি হবে, ঘাড়ে একটা আঁচড়ও লাগল না কেন? নখের?'

'মানুষটা কে তাহলে?' রবিনের প্রশ্ন। 'সরাইখানার কেউ হতে পারে না। কনর তখন ছিল অফিসে, আমরা দেখেছি। মিলানি আর মিস্টার ডোনার, একে অন্যের অ্যালিবাই। কে তাহলে?'

'হয়ত বাইরের কেউ। ভোর হলেই বেরোবে। গিয়ে খুঁজব গাছের জটলার ভেতরে। শিশিরে ভেজা মাটি, পায়ের ছাপ থাকবেই। কিংবা অন্য কোনও চিহ্ন। দেখলেই বোঝা যাবে, মানুষ, না ভালুক?'

পাঁচ

কিশোরকে ডেকে তুলল মুসা। 'গেছে তোমার চিহ্ন!'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল কিশোর। ঘরের ভেতরে এখনও আবছা অন্ধকার।

আড়মোড়া ভেঙে রবিনও উঠে বসল। 'গেছে মানে?'

'আমি বললে তো বিশ্বাস করবে না,' মুসা বলল। 'চল, নিজের চোখে দেখবে।'

মুসার সঙ্গে রান্নাঘরে এসে ঢুকল অন্য দুই গোয়েন্দা। জানালার কাছে এসে বাইরে তাকাল।

'ইন্টারেসটিং,' আনমনে বলল কিশোর।

'স্রেফ পাগলামি!' রবিন বলল।

পেছনের পুরো চত্বর ঝাড়ু দিচ্ছে মিলানির স্বামী।

'গাছতলায়ও দিয়ে এসেছে,' মুসা জানাল। 'শব্দ শুনে উঠে এসে দেখি, দিচ্ছে। তারপর গিয়ে ডেকে তুললাম তোমাদের।'

'হুম্‌ম্‌!' মাথা দোলাল কিশোর। 'মিস্টার কারসনের হামলাকারীর সমস্ত চিহ্ন মুছে দিচ্ছে। ভারি অদ্ভুত!' দরজা খুলে মোজা পায়েই চত্বরে বেরোল। হেসে বলল, 'গুড মরনিং।'

চমকে উঠল কনর। কিশোরকে দেখে হাসল। 'মরনিং। রাতে ঘুম ভাল হয়েছিল?'

'একেবারে মরে গিয়েছিলাম। তা, আপনি এত সকালে?' ইশারায় কনরের হাতের ঝাড়ুটা দেখাল কিশোর।

'কি আর করব, নতুন চাকরি যখন নিয়েছি,' বলতে বলতে গিয়ে উল্টে থাকা ড্রামটা তুলে সোজা করে রাখল কনর। ঝাড়ু দিয়ে জমানো ময়লাগুলো তুলে রাখতে লাগল ওটার মধ্যে। 'ভালুকগুলো জ্বালাল। নইলে কি আর এত ভোরে উঠতাম। নাস্তা সেরেই আবার গিয়ে কাজে লাগতে হবে. সুইমিং পুলটা যত জলদি বানানো শেষ হয়, বাঁচি। যাও, জুতো পরে এস। দেখাব।'

জুতো পরে এল তিন কিশোর।

ততক্ষণে সব ময়লা ড্রামে ভরে ফেলেছে কনর। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে চলল সরাইয়ের পঞ্চাশ ফুট পেছনে পুল যেখানে খোঁড়া হচ্ছে সেখানে।

'বিশপে দু'জন লোক ঠিক করে এসেছি,' জানাল কনর। ভারি যন্ত্রপাতি নিয়ে আসবে ওরা। খোঁড়ার জন্যে। আমি শুধু সাইডগুলো খুঁড়ে আকারটা ঠিক করে দিচ্ছি। কয়েক বছর লেগে যাবে কোদাল দিয়ে একলা কাটতে গেলে।'

'কতটা গভীর হবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'দশ ফুট?'

'বারো।'

'কিনারে?'

'একই রকম।'

'ও-মা, তাহলে লোকে নামবে কিভাবে? ঝপ করে একেবারে গভীর পানিতে?'

'সাঁতার যারা জানে না, তারা নামবে না। আমি যা করব, সব কিছুতেই নতুনত্ব থাকবে। আইডিয়াটা কেমন?'

'কি জানি!' মাথা চুলকাল মুসা।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল বোরিস আর রোভার।

'এই যে, ভেঙেছে ঘুম,' ওরা কাছে এলে বলল কনর। 'পুলটা কি রকম হবে ছেলেদের বোঝাচ্ছিলাম।'

বোরিস বলল, 'একা একা খুঁড়ছেন···'

'আরি, আবার আপনি আপনি কেন?' বাধা দিয়ে বলল কনর। 'আমি তো শুরু

থেকেই তুমি তুমি করছি। আর তাছাড়া সম্পর্কে তোমরা আমার বড়, আমারই বরং আপনি বলা উচিত। তুমি করে বলবে, আর শুধু মিক। নো মিস্টার-ফিস্টার,' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল মিলানির স্বামী।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' আগের কথার খেই ধরল বোরিস। 'কাজটা খুব কঠিন। আমরাও তোমাকে সাহায্য করব...'

'আরে না না, দরকার নেই,' হাত নেড়ে বলল কনর। 'ছুটি কাটাতে এসেছ, কাটাও। আবার কষ্ট করে...'

'কষ্ট কি বলছ, মিক,' রোভার বলল। 'মিলির স্বামীকে সাহায্য করব না তো কাকে করব? আর বসে থেকে থেকে ছুটি কাটানো যায় নাকি? কিছু একটা করতেই হয়। তুমি যা-ই বল, আমরা হাত লাগাবই।'

দুই ভাই কাজ করবেই, মানা করলেও শুনবে না, বুঝতে পেরে কিভাবে কি করতে হবে বোঝাতে শুরু করল কনর।

তিন গোয়েন্দা ফিরে চলল সরাইখানার দিকে।

'থাকার ব্যবস্থাটা পাকাপাকি করে নিল আর কি দুই ভাই,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'পুল খোঁড়া শেষ না হলে যায় কি করে?--এমন ভাব দেখাবে এখন।'

'লোকটার মাথা-টাতা ঠিক আছে কিনা সন্দেহ আছে আমার,' বলল মুসা। 'সুইমিং পুলের কোনও কিনারেই ঢালু থাকবে না, এটা কি করে হয়? সবাই কি আর ঝাঁপ দিয়ে পড়বে নাকি সাঁতার কাটতে? আর ঢাল না থাকলে উঠতেও অসুবিধে হবে।'

'সিঁড়ির ব্যবস্থা করবে হয়ত...' কথাটা শেষ করল না রবিন।

নাস্তা বিশেষ জমল না সে-সকালে। সবাই কেমন উত্তেজিত। কারও সঙ্গে কথা বললেন না কারসন, এমনকি ডোনারের দিকেও তাকালেন না একবার। খুব রুক্ষ কণ্ঠে মানা করে দিলেন ডোনার, তিনি ডিম খাবেন না। মিলানিকে ভাজা মাংসের প্লেট নিয়ে ঢুকতে দেখে আতঙ্কিত হলেন। মিলানি প্রায় কিছুই খেল না। বসে বসে তার ঢলঢলে বিয়ের আঙটিটা আঙুলে ঘোরাল। আর বার বার সবাইকে অনুরোধ করল আরও কিছুটা খাবার নিতে। বোরিস, রোভার, আর কনর, দ্বিতীয়বার কেউই প্লেটে খাবার তুলল না। প্রথমবারে যা নিয়েছিল, শেষ করে উঠে চলে গেল সুইমিং পুলের কাজ করতে। এক টুকরো কেক তুলে পকেটে ভরে উঠে পড়লেন ডোনার, বেরিয়ে চলে গেলেন ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ডের দিকে। মিলানিকে দায়সারা একটা 'ধন্যবাদ' দিয়ে কারসনও উঠলেন। জানালেন, বিশপে যাবেন, জরুরী কাজ সারতে।

পড়ে থাকা খাবারগুলোর দিকে বিষণ্ন চোখে তাকাল মিলানি। 'কারোই খিদে

নেই। রান্না খারাপ হল?'

'মোটেই না,' বলল কিশোর। 'মেরিচাচীর চেয়ে কম ভাল রাঁধেননি।'

'মেরিচাচী?···ও, হ্যাঁ, খুব নাকি ভাল মহিলা। বোরিস আর রোভারকে খুব পছন্দ করেন।'

'আর তাঁর সামনে খেতে বসে না খেয়ে উঠে যায় কার সাধ্য?' নিজের বুকে থাবা মারল মুসা। 'আমার এই শরীরখানা দেখছেন না, অর্ধেক মেরিআন্টির দয়াতে।'

হেসে উঠল রবিন। 'খালি কিশোরকেই মোটা বানাতে পারলেন না, এটা আন্টির দুঃখ। আগে নাকি বেশ মোটাসোটা ছিল কিশোর, ছোটবেলায়। দর্শকরা তো নামই দিয়ে ফেলেছিলঃ বেবি ফ্যাটস্।'

'বেবি ফ্যাটসু?' ভুরু কোঁচকাল মিলানি। 'নামটা শুনেছি।'

'হ্যাঁ, মোটো খোকা। শুনে থাকলে, টেলিভিশনেই শুনেছেন। খালি শোনেননি, দেখেছেনও। মোটো খোকার অভিনয় করত তো তখন কিশোর পাশা। একটা হাসির ছবিতে, মিনি সিরিজ।'

'বোরিস আর রোভার কিন্তু কখনও এসব কথা লেখেনি আমাকে। তোমরা তিনজনে খুব ভাল ছেলে, চালাক ছেলে, গোয়েন্দা, এইই খালি লিখেছে। যা-ই হারাক, ঠিক খুঁজে বের করে ফেলতে পার।'

সুযোগটা ছাড়ল না কিশোর, সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'তাহলে মক্কেল হয়ে যান না আমাদের?'

'মক্কেল?'

'হ্যাঁ। অনেকের কাছ থেকেই ফিস নিই আমরা, তবে আপনার কাছ থেকে নেব না। হাজার হোক, বোরিস আর রোভারের এত আদরের বোন, আমাদেরও বোন। বড় আপা। আর আপনার রান্নাও ভারি চমৎকার।'

'হ্যাঁ, এই খাবারের বিনিময়ে কিছু করে দিতে পারলে খুশি হব,' মুসা বলল। 'আপনি না খাওয়ালে তো দু'হপ্তা ধরে খাওয়া লাগত শুধু টিনের খাবার। ওসব কি আর মুখে রোচে? রান্না করা তাজা খাবারের স্বাদই আলাদা।'

'থ্যাংক ইউ,' হাসল মিলানি। 'বেশ, মক্কেল হতে আপত্তি নেই। আমার চাবিটা খুঁজে বের করে দিতে পার। তাড়াহুড়ো করে লেক ট্যাহোইতে চলে গিয়েছিলাম। তখন আমার মনের অবস্থা বুঝতেই পারছ। কোথায় যে চাবিটা লুকিয়ে রেখে গেছি, মনেই করতে পারছি না। বেশি চালাকি করতে গিয়ে নিজেই ফাঁদে পড়েছি।'

'চাবিটা দেখতে কেমন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ছোট,' বলে তর্জনী আর বুড়ো আঙুল ফাঁক করে দেখাল মিলানি। ঠিক বোঝা গেল না চাবিটা কত বড়, কি রকম। 'আমার সেফ ডিপোজিট বক্সের চাবি।'

'বুঝতে পারছি, জরুরী জিনিস,' বলল মুসা। 'কিন্তু ওটা নিয়ে এত সমস্যা কিসের? ব্যাংকে গিয়ে বলুন, হারিয়ে ফেলেছেন। আরেকটা দেবে ওরা। ডুপ্লিকেট তো থাকেই ওদের কাছে।'

'হ্যাঁ,' মুসার কথায় সায় জানিয়ে বলল রবিন। 'এটা কোনও ব্যাপারই না। আমার বাবাও একবার চাবি হারিয়ে ফেলেছিল। ব্যাংকে গিয়ে বলতেই আরেকটা দিয়ে দিল। তবে, নতুন চাবি, ডুপ্লিকেট নয়। বাক্সের তালাটাই বদলে ফেলেছিল ওরা। আপনার বেলায়ও ওরকম কিছুই করবে। চাবি, ছোট জিনিস, হারাতেই পারে।'

'কিন্তু গিয়ে বলতে আমার খুব খারাপ লাগছে,' বলল মিলানি। 'বিশপে ওরা আমাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। মাঝে মাঝে প্রশংসা করে সামনেই বলে ফেলে, আমি নাকি খুব হুঁশিয়ার মহিলা। আমাকে বিশ্বাসও করে খুব। স্কি স্লোপটা কেনার জন্যে টাকা চাইতেই সঙ্গে সঙ্গে ধার দিয়ে দিল। না, ভাই, আমি গিয়ে বলতে পারব না, ওরকম গাধার মত একটা কাজ করে বসে আছি।'

'বেশ, তিন গোয়েন্দা আপনাকে সাহায্য করবে,' আশ্বাস দিল কিশোর। 'সাধারণত কোথায় চাবিটা রাখতেন আপনি?'

'ড্রয়ারের ডেস্কে, অফিসে। কিন্তু এখন...' হতাশ ভঙ্গিতে দুই হাত নাড়ল মিলানি। 'আসলে, বাড়ি খালি ফেলে চলে যেতে হয়েছিল। তাই ভেবেছিলাম, কোথাও লুকিয়ে রেখে যাই, চোরটোর ঢুকলে যাতে খুঁজে না পায়। সেই "গোপন" জায়গাটা যে কোথায়, আমিই এখন আর মনে করতে পারছি না।'

'খুঁজে বের করব আমরা,' চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল মুসা।

'অফিস থেকে শুরু করব?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ওখানে তো আর কোনও জায়গা বাদ রাখিনি,' মিলানি বলল। 'ওখানে নেই।'

'তবু, আরেকবার দেখি। বলা তো যায় না, হয়ত আপনাদের চোখ এড়িয়ে গেছে।'

'বেশ, দেখ।' টেবিল পরিষ্কার করতে শুরু করল মিলানি।

অফিসে এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। ফাইল, ফোল্ডার ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, জায়গায় জায়গায় কাগজপত্রের গাদা।

'এখানে অযথা সময় নষ্ট করব, কিশোর,' মুসা বলল। 'কোথাও খোঁজা বাকি রাখেনি ওরা। একটা পিন হারালেও পেয়ে যেত।'

'তা ঠিক।' ডেস্কের ওপরে উঠে বসল কিশোর। রান্নাঘর থেকে শোনা যাচ্ছে বাসন-পেয়ালা ধোয়ার শব্দ। কান পেতে শুনল। বলল, 'চাবি নাহয় না পেলাম, কাল রাতে কনর এখানে কি করছিল সেটা তো জানতে পারব। দেখা দরকার এত রাতে এখানে কি করছিল মিলানির স্বামী।'

ডেস্কের ওপরের কাগজের স্তূপ ওল্টাতে শুরু করল গোয়েন্দাপ্রধান। 'হুমম...একটা চিঠি বোরিসের, আরেকটা রোভারের...দুটোই বছর দুই আগে লেখা...ওদের সব চিঠি জমা করে রেখেছে মিলানি।'

'সারা রাত বসে নিশ্চয় পুরনো চিঠি পড়েনি কনর,' বুককেস থেকে একটা জমাখরচের খাতা টেনে বের করল রবিন। 'শুধু শুধু চিঠি পড়ার কষ্ট কেন করতে যাবে? ওদের সম্পর্কে কিছু জানার থাকলে দু'জনকে জিজ্ঞেস করে নিলেই পারে।'

'ঠিক, চিঠি পড়ার কোনও কারণ নেই,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর।

'এই, দেখ,' আরেকটা খাতা কিশোরের দিকে ঠেলে দিল রবিন। 'মিলানির সেভিংসের হিসেব।'

'কি ওটা, ব্যাংকের বই?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না, জমাখরচের খাতা। এক কলামে টাকা জমা রাখার অঙ্ক, আরেকটাতে খরচের অঙ্ক। তারপর যোগ-বিয়োগ করে যা বাকি থাকে, সেটাও লিখেছে স্পষ্ট করে।'

রবিনের হাত থেকে লেজারবুকটা নিল কিশোর। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় এসে থেমে গেল। 'শেষ লিখেছে গত হপ্তার আগের হপ্তায়,' আনমনে বলল সে। 'একশো পঁচাত্তর ডলার জমা করেছে। তারপর আর খরচও নেই, জমাও নেই। মোট জমার পরিমাণ এখন তেপান্ন হাজার সাতশো কুড়ি ডলার।'

'অনেক টাকা!' শিস দিয়ে উঠল মুসা।

'এত সম্পত্তির পরেও নগদ এত টাকা, সোজা ব্যাপার না,' বলল কিশোর। 'ধনীই বলতে হবে। চাবির জন্যে সে-কারণেই পাগল হয়েছে। রবিন, বাইরে কোনখান থেকে তোমার বাবাকে একটা ফোন করবে। রিনোতে খোঁজ নেয়া দরকার।'

'মিলানির টাকা মেরে দেয়ার মতলব করেছে কনর?' প্রশ্ন করল রবিন।

'হতেও পারে। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ, বোরিস আর রোভারকে সহ্য করতে পারছে না কনর। গায়ে পড়ে গিয়ে ওকে সাহায্য করছে দুই ভাই। আর ওই সুইমিং পুলটারও কোনও মানে বুঝতে পারছি না। ভোরে উঠে সারা চত্বরে ঝাড়ু দেয়ারই বা কি মানে? আর ওই ট্র্যাংকুইলাইজার গান?' লিভিং রুমে পায়ের শব্দ

শুনে চুপ হয়ে গেল কিশোর। দরজায় উঁকি দিল মিলানির মুখ। 'পেয়েছ?'

'না, আপনি ঠিকই বলেছেন,' জানাল কিশোর। 'এঘরে চাবিটা নেই।'

'অন্য ঘরে খুঁজতে হবে,' রবিন বলল। 'আচ্ছা, মিস্টার কারসন আর মিস্টার ডোনারের ঘরে খুঁজলে কি ওরা মাইণ্ড করবেন?'

'কি জানি। তবে, ঠিকই বলেছ, ওখানেও রাখতে পারি। আমি যখন যাই, কোনও গেস্ট ছিল না।'

'ঘরটার যা অবস্থা,' ছড়ানো কাগজপত্র দেখিয়ে বলল কিশোর। 'গুছিয়ে দেব?'

'না, আমিই পারব। তাছাড়া তোমরা বুঝবে না কোন জিনিসটা কোথায় রাখি।'

'বেশ,' দরজার দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল কিশোর। 'আচ্ছা, এখানে তো কোনও চেকবুক দেখলাম না। দু'চার দিনের মধ্যে কাউকে চেক দিয়েছেন?'

'চেক দিই না আমি। কিছু কিনলে ক্যাশ টাকা দিই।'

'যা-ই কেনেন?' অবাক মনে হল কিশোরকে। 'তারমানে অনেক টাকা রাখেন ঘরে। ডেঞ্জারাস! কখন কি ঘটে...'

'না, ঘরে বেশি রাখি না। ব্যাংকে আছে, সেফ ডিপোজিটে। দরকার হলেই গিয়ে খুলে নিয়ে আসি। কাজেই, বুঝতেই পারছ চাবিটা কত দরকার। শীঘ্রি একটা বিল দিতে হবে, টাকা লাগবে। ওদিকে সুইমিং পুলের জন্যে সিমেন্টের অর্ডার দিয়ে বসে আছে মিক। ওগুলো এলে টাকা দিতে হবে।'

'নগদ?'

'সেটাই সেফ মনে হয় আমার কাছে। চেকবুক রাখলে চুরি হয়ে যেতে পারে। আমার সই জাল করে টাকা তুলে নিতে পারবে চোর। অল্প কিছু রাখি বাড়িতে, বালিশের তলায়। তা-ও রাতে। দিনে রাখি সঙ্গে সঙ্গে।'

'আপনার এই সিসটেম অনেকেরই ভাল মনে হবে না,' বলল কিশোর। 'পুলিশও উচিত কাজ হচ্ছে বলবে না। অনেক ক্যাশ টাকা আছে ভেবে কেউ এসে যদি হামলা চালায় আপনার বাড়িতে, কি করবেন?'

হাসল মিলানি। 'সোজা গুলি করবে তাকে মিক।'

'আমারও তা-ই বিশ্বাস,' একমত হল মুসা।

ছয়

সারাটা সকাল চাবি খুঁজল তিন কিশোর। সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায়। পাওয়া গেল না।

দুপুরে খাবার টেবিলে জিজ্ঞেসই করে ফেলল কিশোর, 'চাবিটা এ-বাড়িতে রেখেছিলেন তো? নাকি বাইরে পড়েটড়ে গেছে কোথাও? ধরুন, ব্যাংকে ডিপোজিট বক্স খুলে ফিরে আসার সময়...'

'না। এ-বাড়িতেই রেখেছি।'

হতাশ ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিল মুসা। 'তাহলে কোথায়? এক ইঞ্চি জায়গাও বাদ রাখিনি। কোথায় লুকালেন?'

নীরবে মাথা নাড়ল শুধু মিলানি। এক প্লেট পনিরের স্যাণ্ডউইচ রাখল টেবিলে। ছেলেদের সঙ্গে লাঞ্চে যোগ দিল না সে, অফিসে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

'এত অস্থির কেন?' সেদিকে চেয়ে বলল রবিন। 'এটা এমন কি ব্যাপার? আরেকটা চাবি সহজেই জোগাড় করে নিতে পারে।'

জবাব দিতে পারল না কিশোর কিংবা মুসা। নীরবে খেয়ে চলল তিনজনে। খাওয়ার পরে যার যার প্লেট ধুয়ে টেবিলে সাজিয়ে রেখে বেরিয়ে এল পেছনের চত্বরে। চিন্তিত ভঙ্গিতে চোখ বোলাল একবার কিশোর। পরিষ্কার মাটিতে পায়ের ছাপ, পুলের দিকে যাতায়াতের চিহ্ন।

'এই, কিশোর,' হাত নেড়ে ডাকল বোরিস।

কাছে গেল তিন গোয়েন্দা।

কাজ করছে রোভার।

'কিছু জানলে?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল বোরিস।

'সারা সকাল চাবি খুঁজেছি। পাইনি। এখন গাঁয়ে যাব, রবিনের বাবাকে ফোন করতে। দেখি, কনরের কথা রিনোর ওরা কি বলে। কোথায় ও?'

স্কি স্লোপের দিকে দেখাল বোরিস। 'ওদিকে গেছে। বন্দুক আর একটা ন্যাপস্যাক নিয়ে গেছে সঙ্গে। বলে গেছে, ফিরতে দেরি হবে।'

ওখান থেকে সরে এল তিন গোয়েন্দা। ডানে মোড় নিয়ে পথে এসে উঠল। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল পেট্রল পাম্পটাতে। অ্যাটেনডেন্টকে দেখা গেল না, মনে হল, স্টেশনটা বন্ধ। চত্বরের এক কোণে টেলিফোন বুদ। ভেতরে ঢুকে, স্লটে পয়সা ফেলে ডায়াল করল রবিন। বেরিয়ে এল কিছুক্ষণ পর।

'পেলে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

''হ্যাঁ, বাবা বাড়িতেই আছে। বেরোবে একটু পর। জানালাম সব কথা। রিনোতে খোঁজ নেবে। কাল রাতে আমাকে একবার ফোন করতে বলল বাড়িতে।'

'গুড,' বলল কিশোর। 'চল, ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ডে যাই।'

আবার সরাইয়ের কাছে চলে এল ওরা। ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ডের পথ ধরে নামতে শুরু করল।

'দূর,' বিরক্ত হয়ে বলল মুসা। 'এবারের ছুটিটা সুবিধের লাগছে না। ভেবেছিলাম, ঘোরাঘুরি করব, পাহাড়ী নদীতে মাছ ধরব. হল না। কিছুই নেই। আমি বলে রাখছি, কুয়াশা যদি পড়া শুরু করে, আর থাকব না। সোজা রকি বীচে চলে যাব। সেখানেই ভাল।'

'আরে লাগবে, লাগবে, ভাল লাগবে,' রবিন বলল। 'কাল তো জায়গামত তাঁবু খাটাতে পারিনি, আর রাতে ঘুমিয়েছি ঘরে। আজ ভাল জায়গায় তাঁবু খাটাব। বাইরে থাকলে দেখবে ভাল লাগছে।'

কিশোর হাসল। 'ভালুককে ভয় লাগে না?'

'ভালুক কাল রাতে আমাদের কিচ্ছু করেনি। শুধু খাবার খুঁজতে এসেছিল।'

'মিস্টার কারসনের করেছে। কনরও উদ্বিগ্ন। ভোররাতে উঠেই ঝাড়ু দিতে লেগেছে...'

একটা মোড় ঘুরতেই ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ড চোখে পড়ল। ছড়ানো জায়গা। গোটা পাঁচেক গর্ত আছে, পাথরে বাঁধানো—ওগুলো চুলা, লাকড়ি দিয়ে রান্না করতে হয়। আর আছে রেডউডে তৈরি পাঁচটা পিকনিক টেবিল, বসে খাবার জন্যে। জায়গাটার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটা ঝর্না, প্রায় শুকনো। অতি ক্ষীণ পানির একটা ধারা বইছে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে। গ্রাউণ্ডের আরেক ধার থেকে একটা পথ এঁকেবেঁকে ঢুকে গেছে বনের ভেতরে।

মাথা চুলকাল মুসা। 'কনর ঠিকই বলেছে, পানির সমস্যা। এখানে যদি থাকি, সরাই থেকে পানি এনে খেতে হবে।'

'সরাইয়ের কাছাকাছিই থাকতে চাই যতটা সম্ভব,' বলল কিশোর। 'কনরের ওপর কড়া চোখ রাখা দরকার। মিস্টার কারসনকে কে মারল...'

'নিশ্চয় কনর নয়,' বাধা দিয়ে বলল রবিন। 'ও তখন অফিসে বসে ছিল।'

'না, সে মারেনি। তবে রহস্যময় কিছু একটা ঘটছে সরাইটাতে। কী, সেটা জানার চেষ্টা করতে হবে।'

পেছনের ঝোপে খসখস শব্দ হল। পাঁই করে ঘুরল তিনজনে।

'চমকে দিয়েছি, না?' বলল একটা হাসিহাসি কণ্ঠ। 'সরি।'

বুনো লাইলাক গাছের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল মানুষটা। পেট্রল

পাম্পের অ্যাটেনডেন্ট। ময়লা, দোমড়ানো কাগজ দ্রুতহাতে ভরছে একটা চটের বস্তায়।

'ভালুকের ভয়, না?' হাসছে মিটিমিটি। 'শুনলাম, কাল রাতে নাকি ভীষণ ভয় পেয়েছ।'

'কে বলল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মিস্টার কারসন। সকালে পেট্রল নিতে এসেছিল। দেখি, ঘাড় নাড়তে পারছে না। জিজ্ঞেস করলাম। সব কথা বলল। তার ঘাড়ে নাকি কে রদ্দা মেরেছে। ভীষণ রেগেছে ভদ্রলোক।'

রবিন বলল, 'মিস্টার কনরের ধারণা, ভালুকে মেরেছে।'

'আশ্চর্য! তখন থেকেই ভাবছি আমি কথাটা। ভালুক ওরকম করে মারে না। তবে বলাও যায় না কিছু শিওর হয়ে। সবগুলোই যে এক রকম হবে তার ঠিক কি? আর এ-বছর গাঁয়ে ভালুকও যেন বেশি বেশি ঢুকছে। শুকনোর দিনে খাবারের জন্যে ঢোকে সব সময়ই, তবে এবারের মত নয়। ভয়ের কিছু নেই। ওদেরকে না ঘাঁটালে ওরাও কিছু বলে না।'

ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ডের ওপর চোখ বোলাল অ্যাটেনডেন্ট। 'দুই জোড়া খাটাশ এসেছিল গত হপ্তায়। দেখেছ কি অবস্থা করেছে? কাগজ, কমলার খোসা···দূর! বাড়িতে বোধহয় খোঁয়াড়ে থাকে বেটাবেটিরা!'

'গ্রাউণ্ড পরিষ্কারের দায়িত্ব কি আপনার?' জানতে চাইল রবিন।

'না, তা নয়। কেউ করতে বলে না আমাকে, ইচ্ছে করেই করি। পরিষ্কার না দেখলে লোকে থাকতে চাইবে না, আর লোক না এলে আমার তেল বিক্রি হবে না। অফ-সীজনে, মানে মে-র পর থেকে তুষার পড়া শুরু না হওয়া পর্যন্ত তাহলে না খেয়ে মরব।'

'তাই?'

'আমার নাম মরিসন,' জানাল অ্যাটেনডেন্ট। 'গ্রসেটমার মরিসন। লোকে দুটো নামের একটাও ডাকে না। আরে বাবা শক্ত লাগলে ছোট করে নে। না, তা-ও না। সহজ আরেকটা নাম রেখেছে, বাচাল। আচ্ছা, তোমরাই বল, ওই নামে আমার মত মানুষকে ডাকার কোনও মানে হয়? কত কথাই তো বললাম, কিন্তু একটা বেশি কথা বলেছি? সবগুলো কাজের কথা নয়? আমাকে কেন বাচাল বলে?'

'কি জানি?' না হেসে পারল না মুসা। নিজেদের পরিচয় দিল, 'আমি মুসা আমান। ও কিশোর পাশা। আর ও রবিন মিলফোর্ড।'

ওদের সঙ্গে হাত মেলাল মরিসন। অনেক কথা বলে বোঝানর চেষ্টা করল, যে

ওদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হয়েছে। তারপর বলল, 'এখানে তাঁবু খাটানর কথা ভাবছ নাকি? সরাইখানার কাছ দিয়ে আসার সময় দেখলাম পাইন গাছের নিচে তাঁবু ; নিশ্চয় তোমাদের?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'কাল রাতে শুয়েছিলাম, পরে অবশ্য ভালুকের জ্বালায় গিয়ে ঘরে ঘুমাতে বাধ্য হয়েছি। ভালুকগুলো এসে ডাস্টবিন ওল্টানর পর মিস্টার কনর বলল, ঘরে গিয়ে শুতে।'

হেসে উঠল 'বাচাল' মরিসন। 'ঘরের মধ্যে থেকেই ভালুকের ভয়ে কাবু। মনস্টার মাউনটেইনে গেলে কি করবে?'

'মনস্টার মাউনটেইন?' প্রতিধ্বনি করল যেন মুসা।

'ও, ভুলে গেছি, ম্যাপে তো ওটার নাম লেখা রয়েছে মনস্টার লফটি। তবে আমরা মাউনটেইনই বলি। শুরুতে, সেই ছোটবেলায় মাত্র পাঁচ ঘর বাসিন্দা ছিলাম আমরা এখানে। তখন মাউনটেইনই বলতাম।' উত্তর দিক দেখাল সে। উঁচু ঢালের ওপর একটা ওয়াচটাওয়ারের মাথা আবছা চোখে পড়ে। 'ওই টাওয়ারটা দেখছ? অনেক পুরনো, এখন বাতিল। পোড়ো। আগে অনেক ব্যবহার হত।'

একটা টেবিলে উঠে বসল মুসা। 'লফটিই হোক, আর মাউনটেইনই হোক, মনস্টার নামটা কেন?'

মুসার পাশে বসল মরিসন। 'খুলেই বলি তাহলে। আমরা যখন ছোট ছিলাম, বড়রা আমাদেরকে দৈত্য-দানবের কিচ্ছা শোনাত। বলত, ওই পর্বতে দেওদানো থাকে, ছেলেপিলে গেলেই ধরে কচকচিয়ে খায়। ওরা থাকে ওই পবর্তের গুহার মধ্যে।'

রবিন হাসল। 'মায়েদের ঘুম-পাড়ানি কিচ্ছা।'

'তা-ই,' মাথা দোলাল মরিসন। 'তবে আমরা বিশ্বাস করতাম। আর বড়রা যা বলতে বাকি রাখত, সেসব নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সেরে নিতাম। এই যেমন, দৈত্যদের দাঁতের আকার, নখের আকার, কি করে মানুষ ধরে, শরীরের কোন জায়গা থেকে কামড় মারতে শুরু করে; এই সব। বলতাম, আর নিজেরাই ভয় পেতাম। ভয় পেতে ভাল লাগত। তবে বড়রাও কম যেত না। তারা বলত, চাঁদনি রাতে গুহা থেকে বেরিয়ে আসে দানবেরা, ঘরে ঢোকার সুযোগ খোঁজে। ঢুকে একবার কোনও ছেলেকে ধরতে পারলেই, ব্যস, আর কোনও কথা নেই...' ছেলেবেলার কথা মনে করে এই বয়সেও শিউরে উঠল সে। হাসল। 'ভাবলে গায়ের রোম এখনও খাড়া হয়ে যায়...গল্প আরও আছে। এক বুড়ো ট্র্যাপার থাকত ওই পাহাড়ের মাথায়। কসম খেয়ে বলেছে সে, বিরাট পায়ের ছাপ দেখেছে বরফে, ছাপগুলো মানুষের পায়ের ছাপের মত। খালি পা। অদ্ভুত, না? তোমরাই বল,

বরফে খালি পায়ে হাঁটে কি করে মানুষ? পা জমে যাবে না? আর ট্র্যাপার তো দেখেছে শুধু পায়ের ছাপ, সন্ন্যাসী ব্যাটা নাকি দৈত্যটাকেই দেখেছে।'

'ছোটবেলায় নিজেরা ভয় পেয়েছেন তো,' হেসে বলল মুসা। 'এখন আমাদের ওপর পরীক্ষা চালাচ্ছেন। ভয় দেখাতে আপনার ভাল লাগে, না?'

'লাগে। তবে, এখন ভয় দেখাচ্ছি না। তোমরা সব কথা জানতে চাইলে, তাই...'

'আপনি বলুন,' অনুরোধ করল রবিন। মরিসনের নাম 'বাচাল' না রেখে 'স্টোরি-টেলার' বা 'গল্প-বলিয়ে' রাখা উচিত ছিল, ভাবল সে। টেবিলটার কাছে একটা বড় পাথরে বসল। 'দেও-দানব, তারপর সন্ন্যাসী...ছেলেবেলাটা দারুণ কেটেছে আপনার, না?'

'তা কেটেছে। তবে সন্ন্যাসী তো ছেলেবেলায় আসেনি। ও এসেছিল তিন...না না, বছর চারেক আগে। ঝোলা কাঁধে, লাঠি হাতে ভম-ভম করে কি সব বিচিত্র শব্দ করতে করতে বিশপের দিক থেকে পায়ে হেঁটে এল। বয়েস বেশি না, পঁচিশ-কি-ত্রিশ। তখন গরমের সময়। লোকজন কম এদিকে। রাস্তা দিয়ে তাকে আসতে দেখে এগিয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কি চায়? বলল, ধ্যানে বসার জন্যে ভাল একটা জায়গা চায়। নীরব, নির্জন কোনও জায়গা। স্কাই ভিলেজে গির্জা নেই। কোথায় থাকতে বলব? জিজ্ঞেস করলাম, ধ্যানে বসে কি করবে? বলল, তার সমস্ত চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে দিতে চায় মহাবিশ্বে । তারপর সেগুলো আবার জড়ো করে কি কি সব করতে চায়। ভাল বুঝলাম না। তবে এটুকু বুঝলাম, কোথায় তাকে থাকতে বলা উচিত।

'স্কি স্লোপের ওপরের একটা জায়গা দেখিয়ে দিলাম। লোকে খুব একটা যায় না ওদিকে। আমি একআধবার গিয়েছি গরমের সময়। ওখানে একটা মাঠমত আছে, লম্বা লম্বা ঘাস। তার পরে জঙ্গল। ভাবলাম, লোকটা গিয়ে মাঠে বসেই ধ্যান করুক। খোলা আকাশ চোখে পড়বে, খোলা বাতাসও আছে, তার চিন্তাভাবনাগুলো ছড়াবে ভাল।

'বিকেলের দিকে কৌতূহল আর চাপতে পারলাম না। কি করছে দেখতে গেলাম। দেখি, তারপুলিন, লোহা আর টুকিটাকি জিনিস কিনে নিয়ে গেছে গাঁয়ের দোকান থেকে। ঝুপড়ি বানানর জন্যে। তবে কোনও খাবার নেয়নি। ভাবলাম, নিরামিষভোজী সন্ন্যাসী, বুনো ফলমূল খেয়েই বাঁচবে।'

'বনের মানুষ!' বিড়বিড় করল রবিন। 'তারপর?'

'তারপর,' গাল চুলকাল মরিসন। 'আমার বিশ্বাস শেষমেষ পাগল হয়ে গিয়েছিল। এত একলা জায়গায় কথা না বলে চুপ করে বসে থাকলে পাগল না হয়ে

উপায় আছে? তা-ই হয়েছিল। ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা মাথা খারাপ করে দিয়েছিল তার। মাস তিনেক ছিল ওখানে। তারপর একদিন দৌড়ে নেমে এল, যেন পাগলা কুকুরে তাড়া করেছে। পেছন থেকে কত ডাকলাম, শুনলই না। হ্যারি বলেছে...ও. হ্যারিকে তো চেন না। দোকানদার। বাক্স গোছাচ্ছিল। সে নাকি আটকেছিল সন্ন্যাসীকে। একটা কথাই শুধু বলেছে সন্ন্যাসী, মাঠের ওপরে বনের ভেতরে দৈত্য থাকে। বলেই আবার দিল দৌড়, সোজা বিশপের দিকে।'

নিজের অজান্তেই কেঁপে উঠল একবার মুসা। 'এরপর আর আসেনি?'

'আরও আসবে? ছায়াও দেখিনি আর। বোধহয় ভাবনাচিন্তার সাথে সাথে নিজেকেও ছড়িয়ে দিয়েছে মহাবিশ্বে। কোত্থেকে যে বেরিয়ে আসে ওসব পাগল-ছাগলগুলো...হুঁহ!'

আকাশ ফুঁড়ে যেন উঠে গেছে বিশাল পর্বতের চূড়া। চিন্তিত ভঙ্গিতে সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। বিড়বিড় করল আনমনে, 'মনস্টার মাউনটেইন...ভয়াল গিরি...দা...,' ফিরল মরিসনের দিকে। 'দানব, মানে... দৈত্য...'

'আরে দূর,' জোড়ে হাত নাড়ল মরিসন। 'ওসব কিচ্ছায় কান দিও না। পাগল হয়ে গিয়েছিল তো, কল্পনা করেছে আর কি। কিংবা ভালুক দেখেই দৈত্য ভেবে দিয়েছে দৌড়। গরু কোথাকার। আজকালকার ছেলেছোকরাগুলোর যে কি হয়েছে! হতাশা, বুঝেছ, হতাশা! স্রেফ হতাশা! ওর বয়সে আমাদের দিনরাত কোনদিক দিয়ে কাটত টেরই পেতাম না। আর ওই গরুটা গিয়ে বসেছে ধ্যানে।' উঠে দাঁড়াল সে। 'তাঁবু খাটাতে চাইলে খাটাও। দানবের কথা মনেও এন না। তবে হ্যাঁ, ভালুককে এড়িয়ে চলবে। ওদেরকে না খোঁচালে ওরা কিছু বলবে না। আর, তাঁবুতে খাবার রাখবে না। খাওয়ার লোভেই আসে।'

চটের বস্তাটা কাঁধে ঝুলিয়ে গাঁয়ের দিকে রওনা দিল মরিসন। ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ডের কিনারে গিয়ে ফিরে তাকাল। 'আর জায়গাটা নোংরা করবে না, প্লীজ।'

'করব না,' কথা দিল মুসা।

পথে গিয়ে উঠল অ্যাটেনডেন্ট। কয়েক মিনিটেই হারিয়ে গেল মোড়ের ওধারে।

'ভয়াল গিরি,' রবিন বলল। 'সুন্দর একটা নাম রেখেছ, কিশোর। ভয় দেখানোর জন্যেই বাচ্চাদের ওই গল্প শোনাত বাবা-মায়েরা। দানব-টানব কিছু নেই। আর এটা সিয়েরা, হিমালয় নয় যে...'

'গহীন জায়গা এই পর্বতেও আছে,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'অনেক বড় জঙ্গল আছে, দুর্গম। সবখানেই ট্যুরিস্ট গেছে বলে মনে হয় না আমার।'

'কিশোর,' ভয়ে ভয়ে বলল মুসা। 'আমার রোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে! কি বলতে

চাইছ? সন্ন্যাসীর কথা বিশ্বাস হয়?'

'কেন হবে না? কত কিছুই তো ঘটে এই পৃথিবীতে, যার কোনও ব্যাখ্যা নেই। মরিসন মিথ্যে না বলে থাকলে, মানে, গল্পটা তার মনগড়া না হলে, ধরে নিতে পারি, বছর চারেক আগে এক যুবক সন্ন্যাসী এসেছিল। তৃণভূমির ওপরের বনে ঝুপড়ি বানিয়ে থেকেছিল। কিছু একটা দেখে ভয় পেয়ে দৌড়ে নেমেছিল...'

'চুপ!' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। 'কে জানি ওখানে!'

পাশেই খাঁড়ির ঢালে ঝোপের ভেতরে মৃদু খসখস শব্দ হল। নীরব নিথর বিকেলে ওই সামান্য আওয়াজই বিকট শোনাল ওদের কানে। ডালপাতা নড়তে দেখল ওরা।

পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে যেন মুসা। চেয়ে রয়েছে ঝর্নার ওধারের ঝোপটার দিকে। আজব একটা ছায়া দেখল বলে মনে হল তার।

বাড়ছে ডালপাতা নাড়ার শব্দ।

'কিছু রয়েছে ওখানে,' ফিসফিসিয়ে বলল রবিন। 'এদিকেই আসছে!'

সাত

এগিয়ে আসছে শব্দ।

ঘামছে তিন গোয়েন্দা। কল্পনায় ভাসছে নানারকম দৈত্য-দানবের ভয়াবহ চেহারা।

হঠাৎ থেমে গেল আওয়াজ। অস্বস্তিকর নীরবতা। ভাবছে ওরা, জীবটা কি হামলা চালাবে?

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন মিস্টার ডোনার। থমকে দাঁড়ালেন। 'আরে, তোমরা?'

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল মুসার। ফোঁস করে ছাড়ল চেপে রাখা নিঃশ্বাস।

'মিস্টার ডোনার!' বিড়বিড় করল কিশোর। শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে গলার ভেতরটা।

পায়ের ওপর ভার রাখতে পারল না বুঝি আর রবিন, একটা টেবিলে উঠে বসল।

এগিয়ে এলেন ছোট্ট মানুষটা। মাথায় ক্যানভাসের হ্যাট। অনেকক্ষণ রোদে রোদে ঘুরেছেন মনে হয়, নাক লাল। কপালে একটা আঁচড়। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'প্রকৃতির শান্তি নষ্ট করতে এসেছ।'

'যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন না!' বলল মুসা।

'ভয়? কেন? ভালুক?...জান, দারুণ একখান জিনিস দেখে এসেছি, বিরাট এক মৌচাক। মধু ভালুকের খুব প্রিয়।'

ঝোপ থেকে বেরিয়ে ডোনারের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল একটা স্কাংক। 'আরে, পিছে পিছে চলে এসেছিস।' জীবটাকে আদর করে কোলে তুলে নিলেন তিনি।

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'দুর্গন্ধ ছড়াবে তো!'

শাদা-কালো ছোট সুন্দর জীবটার নাকে আলতো টোকা দিলেন ডোনার। 'কি-রে, কি বলে? গন্ধ ছড়াবি নাকি?' মুসার দিকে তাকালেন। 'শত্রু কিংবা বিপদ না দেখলে গন্ধ ছড়ায় না ওরা।' আস্তে করে আবার জীবটাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'যা, চলে যা। পরে আবার দেখা করব। যা।'

ঝোপের দিকে কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকাল জীবটা। যাওয়ার ইচ্ছে নেই।

'যা, যা,' হাত নাড়লেন ডোনার। 'তোকে দেখে ভয় পাচ্ছে ওরা। গন্ধ যদি ছড়াস? যা, চলে যা।'

ঝোপে ঢুকে গেল জানোয়ারটা।

ঝর্না পেরিয়ে ছেলেদের কাছে চলে এলেন ডোনার। 'খুব সুন্দর জীব, না?'

'দেখতে তো সুন্দরই লাগে,' মুসা বলল। 'কিন্তু গন্ধ যখন ছাড়ে...'

'...নাক চেপে ধরে পালাতে হয়, না? হাহ্ হাহ্ হা!' থামলেন এক মুহূর্ত ডোনার। 'কয়েকটা পশু-পাখিকে খাওয়াতে বেরিয়েছিলাম...'

কোথা থেকে উড়ে এল একটা নীল জে। মাথার ওপর এক চক্কর দিয়ে এসে বসল ডোনারের কাঁধে। 'আবার এসেছিস? আর তো নেই...দেখি...' পকেট হাতড়ে কয়েকটা গমের দানা বের করে তালুতে মেলে ধরলেন। 'এই শেষ, আর নেই। খেয়ে চলে যা।'

পাখিটা দানাগুলো খেয়ে যেতে না যেতেই গাছ থেকে নেমে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এল একটা কাঠবেরালী। ডোনারের পা বেয়ে হাতে এসে উঠল। 'আরি, তুইও আবার? আর মাত্র একটা বাদাম, ব্যস। তারপর চলে যাবি।' পকেট থেকে বাদাম বের করে দিলেন তিনি।

বিচিত্র ভঙ্গিতে সামনের দু'পা দিয়ে বাদামটা চেপে ধরে লাফ দিয়ে মাটিতে নামলো কাঠবেরালীটা। তারপর ওখানে বসেই খুঁটে খুঁটে খেতে শুরু করল।

'কিছুতেই আমার পিছ ছাড়তে চায় না,' হেসে বললেন ডোনার।

'নষ্ট করে দিচ্ছেন তো ওগুলোকে,' মুসা বলল।

'হ্যাঁ; কিছুটা যে করছি না, তা নয়,' স্বীকার করলেন ডোনার। 'তবে বেশি দিই না। নির্ভরশীল হবে না অন্যের ওপর।'

'চিড়িয়াখানায় এজন্যেই লেখা থাকে…'

'চিড়িয়াখানা!' তিন কিশোরকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ রেগে গেলেন ডোনার, হাসি চলে গেল মুখ থেকে। 'ওগুলো তো জেলখানা। ধরে এনে ভরে রেখে কি কষ্টই না দেয়…'

'কষ্ট কি? খাবার দেয়, রোগ হলে সেবা করে…'

'সেবা, না? সেবা! গর্তের মধ্যে ফেলে রাখে বড় বড় জানোয়ারগুলোকে। খাঁচায় ভরে রাখে। সময়মত কিছু খাবার ছুঁড়ে দেয়। রোগ হলে ট্র্যাংকুইলাইজার দিয়ে বেহুঁশ করে… সব আনন্যাচারাল! ওভাবে বাঁচতে অভ্যস্ত নয় জন্তুজানোয়ারেরা। সেবা-যত্ন নয়, টর্চার চালানো হয় ওদের ওপর। রীতিমত অত্যাচার।'

'আমারও সে-রকমই মনে হয়,' ডোনারের রাগ থামানোর জন্যে মোলায়েম গলায় বলল মুসা।

হয়ত কমত, কিন্তু কিশোরের কথায় তাঁর রাগ আরও বেড়ে গেল। কিশোর বলল, 'মিস্টার কনরও একটা ট্র্যাংকুইলাইজার গান রেখেছেন, ভালুক ধরার জন্যে…'

'ভালুক, না!' চেঁচিয়ে বললেন ডোনার। 'কেন রেখেছে, জানি না মনে করেছ? জানি, সব জানি। কিন্তু আমার প্রাণ থাকতে তাকে সফল হতে দেব না, এই বলে দিলাম।'

'কেন রেখেছে?' নরম গলায় জানতে চাইল কিশোর।

'কেন?' কিশোরের দিকে এমন ভাবে তাকালেন ডোনার, যেন সে তাঁর শত্রু। 'বলব না। বললে হয়ত বিশ্বাস করে ফেলবে আমার কথা। ট্র্যাজেডি আর ঠেকানো যাবে না তখন।'

আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না ওখানে মিস্টার ডোনার। ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ড পেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় উঠলেন। চলে গেলেন সরাইখানার দিকে।

'ডোনার কি বোঝাতে চাইলেন?' টেবিল থেকে নামল রবিন।

'বোঝাতে চাইলেন,' ধীরে ধীরে বলল কিশোর। 'কোনও একটা জানোয়ারকে ধরতে চায় কনর, না মেরে, ট্র্যাংকুইলাইজার গান ব্যবহার করে। নিশ্চয় ভালুক নয়? কারণ, তিনি বললেনঃ বললে হয়ত বিশ্বাস করে ফেলবে আমার কথা! তারমানে, সহজে কেউ বিশ্বাস করবে না, এমন কোনও জানোয়ারের কথা বোঝাতে চেয়েছেন তিনি।' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল গোয়েন্দাপ্রধান, 'কী সেই জানোয়ার?'

আট

সরাইয়ের দিকে হাঁটছে তিন গোয়েন্দা। এই সময় বিশপের দিক থেকে একটা ট্রাক আসতে দেখল।

'সুইমিং পুলের জন্যে সিমেন্ট এনেছে নিশ্চয়,' মুসা বলল।

মোড় নিয়ে মেইন রোড থেকে সরাইয়ের ড্রাইভওয়েতে নামল ট্রাক। গিয়ে থামল পার্কিং এরিয়ায়। দরজা খুলে নামল ড্রাইভার। কনর এগিয়ে এল। দু'জনে মিলে সিমেন্টের বস্তাগুলো বয়ে নিয়ে গিয়ে রাখতে লাগল পুলের পাশে একটা কাঠের আলম্বতে।

রোভার আর বোরিসকে দেখা যাচ্ছে না।

'অনেক সিমেন্ট,' বলল রবিন।

'সুইমিং পুলটাও অনেক বড়,' বলল মুসা। 'বড়, গভীর। সিমেন্ট যে আজই আসবে, একথা মিলানি জানে কিনা কে জানে। চাবি তো পাওয়া যায়নি। টাকা দেবে কোত্থেকে?'

'সুনাম আছে তার,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'বললে বাকিতেই দিয়ে যাবে। কিংবা হয়ত কনরই টাকাটা দিয়ে দেবে। পুলটা হচ্ছে তো তার ইচ্ছেতেই।'

সামনের দিকে সরাইয়ে ঢুকল ছেলেরা। লিভিং রুমটা শূন্য। ওপর তলায় রয়েছে দুই ব্যাভারিয়ান ভাই, গলা শোনা যাচ্ছে তাদের।

'মিলি!'-বাড়ির পেছন থেকে ডাকল কনর। 'এই মিলি! শুনে যাও তো একটু।'

রান্নাঘরে মিলানির পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। পেছনের দরজা খোলার শব্দ হল। নিঃশব্দে রান্নাঘরে এসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিল। সিংকের ওপরের জানালাটা খোলা।

ট্রাক ড্রাইভারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মিলানি। পরনে অ্যাপ্রন। ডিশ মোছার একটা তোয়ালে দিয়ে হাত মুছছে। স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'যা এনেছে, চলবে এতে?'

মাথা ঝাঁকাল কনর। 'চলবে।'

'বেশ।' ড্রাইভারের বাড়িয়ে দেয়া একটা কাগজ হাতে নিয়ে পড়ল মিলানি। স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'সব ঠিকঠাকমত পেয়েছ?'

'পেয়েছি।'

ড্রাইভারের দিকে তাকাল মিলানি। 'ইয়ে, একটা কথা, আজ তো আমার কাছে টাকা নেই, ঘরে নেই আরকি। আপনার বসকে গিয়ে বলবেন, আগামী হপ্তায়

দেব। হবে তো?'

'আরে, নিশ্চয় নিশ্চয়, কি যে বলেন, মিস রোজেনডাল...'

'এখন আমি মিসেস কনর,' শুধরে দিল মিলানি।

'ও, সরি, মিসেস কনর। এই বিলটায় সই করে দিন। তাহলেই হবে। সিমেন্টগুলো যে বুঝে পেয়েছেন...'

'সই করব?' অনিশ্চিত শোনাল মিলানির কণ্ঠ, দ্বিধা করছে।

'হ্যাঁ, শুধু একটা সই,' খুব ভদ্রকণ্ঠে বলল ড্রাইভার। 'বাকিতে মাল দিয়ে যাচ্ছি, অন্তত সই তো একটা নিয়ে যাওয়া দরকার, না কি বলেন? হাহ্-হা!'

'বেশ, সই করে আনছি।'

'না না, ঘরে যাওয়া লাগবে না এই যে, কলম আছে আমার কাছে। নিন,' একটা বল-পয়েন্ট কলম বের করে দিল ড্রাইভার।

স্বামীর দিকে তাকাল একবার মিলানি, তারপর ড্রাইভারের দিকে। কাঁধের তোয়ালেটা কনরের হাতে দিয়ে বিলের কাগজটা বিছাল ট্রাকের বনেটে।

ছেলেদের মনে হল, সই করতে অনেক সময় নিচ্ছে মিলানি।

লেখা শেষ করে কলমটা ড্রাইভারকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল মিলানি, 'চলবে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চলবে,' বিলের দিকে তাকালোও না লোকটা।

'এতক্ষণ অনেক কাজ করে এসেছি,' কৈফিয়ত দেয়ার মত করে বলল মিলানি। 'হাত কাঁপছে। তাই লেখাটা তেমন স্পষ্ট হল না।'

'তাতে কি? গাড়ি বেশি চালালে আমারও অনেক সময় হাত কাঁপে,' হাসিমুখে বলে, কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল ড্রাইভার। তারপর সীটে উঠে এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে পিছিয়ে আনতে লাগল ট্রাক।

'ইডিয়ট!' ট্রাকটা চলে যেতে ধমকে উঠল কনর।

'আগেই বলেছি, ওসব করতে চাই না,' বলল মিলানি। 'তুমি সই করলেই পারতে।'

'এখানে মিলানি রোজেনডালকে চেনে লোকে, মিক কনরকে নয়। আমাকে বাকিতে দেবে কেন? আর তুমি কথা একটু কম বলতে পার না? হাত কাঁপছিল না কি হচ্ছিল সেটা বলার কি দরকার ছিল ওকে?' এক সেকেণ্ড চুপ থাকল কনর, তারপর আবার বলল, 'ইডিয়ট!'

রাগ করে ঘুরল মিলানি। গটমট করে এগিয়ে এল রান্নাঘরের দিকে। কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল। ফিরে চেয়ে বলল, 'তুমি ইডিয়ট! তুমি আর তোমার ওই হতচ্ছাড়া গর্ত! ছাইপাঁশ ঘোড়ার ডিম কি করছ তুমি, তুমিই জান!'

'ঠিক করছি! তৃণভূমির ওপরের বনে আমি নিজের চোখে দেখেছি। ওখান

থেকে এখানেও নেমেছিল ওটা।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'নিজের চোখে না দেখলে কোন্ জিনিসটা বিশ্বাস করো তুমি? কিন্তু আমি জানি আমি কি করছি। আমার...'

'হয়েছে হয়েছে, আর বলতে হবে না। অনেকবার শুনেছি ওসব কথা। তোমার দূরদৃষ্টি আছে, তোমার কল্পনাশক্তি বেশি, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমি জানি, তোমাকে ছাড়া আমার আরও ভাল চলবে। ঝুঁকিটা আমি নিচ্ছি, তুমি নও। তোমার দূরদৃষ্টির ওপর থোড়াই ভরসা আমার।'

'যখন হবে, দেখ।'

'হলে তো ভালই,' আবার হাঁটতে শুরু করল মিলানি।

'খাইছে!' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। 'চল, চল।'

তাড়াতাড়ি আবার লিভিং রুমে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। চেয়ারে বসে পড়ল। খানিক পরেই সে-ঘরে ঢুকল মিলানি, থেমে গেল ছেলেদের দেখে। 'কখন এলে?'

'এই তো,' একটা ম্যাগাজিন নিয়ে পড়ার ভান করছিল কিশোর, টেবিলে রেখে উঠে দাঁড়াল। 'ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ডে গিয়েছিলাম। সুন্দর জায়গা। ওখানে মিস্টার ডোনারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অনেক আলাপ হল।'

মাথা ঝোঁকাল মিলানি। 'এক আজব লোক!'

'জন্তুজানোয়ারেরা তার ভক্ত। প্রমাণও দেখলাম। এমন ভাবে কথা বললেন ওগুলোর সঙ্গে, যেন ওরা তাঁর কথা বোঝে।'

'কি জানি, বাপু! পুরুষ মানুষ সব এক। মাথায় সবার—' কথাটা শেষ না করেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল মিলানি। ওপরে দড়াম করে বন্ধ হল একটা দরজা।

'কনর দম্পতির হানিমুন শেষ,' দু'হাত নাড়ল রবিন। 'গেছে টক্কর লেগে।'

কান চুলকাল মুসা। 'আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না! কি যেন একটা রহস্য রয়েছে! বিলে সই করতে দ্বিধা করল...আর কিসের ঝুঁকি নিচ্ছে?'

ফায়ারপ্লেসের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে কিশোর। 'স্বামীর কথা বিশ্বাস করছে না, মিলানি। তৃণভূমির ওপরের বনে কিছু একটা দেখে এসেছে কনর, সেটা এখানেও নেমেছিল।'

উঠে পায়চারি শুরু করল মুসা। ঝুলে পড়েছে দুই কাঁধ, মুখ নিচু করে রেখেছে। হঠাৎ মুখ তুলল, 'তারমানে বাচাল মরিসনের কথাই সত্যি?'

'ট্র্যাংকুইলাইজার গান,' মুসার প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিল না কিশোর, 'আর বনের ভেতরে একটা বিশেষ জীব। এখন বুঝতে পারছি, ওই গান কেন এনেছে

কনর।'

প্রায় আধ মিনিট স্তব্ধ নীরবতা।

তারপর নরম গলায় বলল রবিন, 'দৈত্য শিকারের জন্যে।'

'পাগলামি–পুরো পাগলামি!' মুসা বলল।

'হ্যাঁ, তা বলতে পার,' একমত হল কিশোর। 'তবে সেই চেষ্টাই করছে সে। শোন এখন, আগামীকাল আমরা কেন যাই না তৃণভূমির ওপরের বনে?'

'দৈত্য খুঁজতে!'

'এমনি গেলাম বন দেখতে,' প্রস্তাব রাখল কিশোর। 'বাইচান্স অদ্ভুত কিছু···বা কোনও চিহ্ন চোখে পড়েও তো যেতে পারে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুসার চেহারা। 'কিসের চিহ্ন?'

'ধর, বড় কোনও জানোয়ারের পায়ের ছাপ। সকালে ঝাড়ু দিয়ে চত্বরের ছাপগুলো মুছে দিয়েছে কনর, যাতে আর কেউ দেখতে না পায়। তবে ওটা ভালুক নয়, তাহলে মুছতো না–ভালুকের ছাপের কোনও গুরুত্ব নেই। অন্য কোনও জানোয়ার।'

দুই বন্ধুর মুখের অবস্থা দেখে হাসল কিশোর। 'মিস্টার ডোনার জানেন, জানোয়ারটা কি, কিন্তু তিনি বলবেন না। জিজ্ঞেস করলে এখন কনরও বলবে না। তবে তার সুইমিং পুলই ফাঁস করে দিচ্ছে সব। ওই গর্ত কেন খোঁড়া হচ্ছে, এখন জানি আমি।'

নয়

তাঁবুতে নয়, সে-রাতেও ঘরেই রইল তিন গোয়েন্দা। পরদিন সকালে উঠে স্লীপিং ব্যাগগুলো গুছিয়ে সিঁড়ির নিচের আলমারিতে ভরে রাখল। রান্নাঘরের টেবিলে একটা নোট রেখে দিল কিশোর–বোরিস আর রোভারের জন্যে–বনে ঘুরতে যাচ্ছে সেকথা জানিয়ে রাখল। তারপর টোস্ট আর দুধ দিয়ে দ্রুত নাস্তা সেরে বেরিয়ে এল সরাইখানা থেকে। সোজা রওনা হল স্কি স্লোপের দিকে। কিশোরের পিঠে বাঁধা ন্যাপস্যাক, মুসার কোমরের বেল্টে ঝোলানো পানির ক্যান্টিন।

শুরুতে স্কি স্লোপ বেয়ে উঠে চলল ছেলেরা। পায়ের নিচে আলগা পাথরের ছড়াছড়ি, নাড়া লাগলেই গড়িয়ে পড়ে। পাথরে পা পিছলে বার দুই পড়তে পড়তে বেঁচেছে রবিন। অবশেষে পাথুরে এলাকা শেষ হল, শুরু হল বন। এখানে এসে অগ্রগতি বেশ ভালই হল।

বাতাস এত পাতলা, বিশ মিনিট পর এমনকি মুসাও হাঁপাতে শুরু করল।

দাঁড়িয়ে গিয়ে একটা গাছে হেলান দিল। 'সরাই থেকে কিন্তু এত উঁচু মনে হয়নি।'

হেসে উঠল রবিন। 'আমাদের গ্রেট অ্যাথলেটেরও দম ফুরাল?'

'আমার ফুসফুসই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে,' মুসা বলল। 'আর হবে না-ই বা কেন? ওদু'টো সাগরের কিনারের বাতাস সইতে অভ্যস্ত...'

'আর বেশি যেতে হবে না,' মুসার চেয়ে জোরে হাঁপাচ্ছে কিশোর।

'হ্যাঁ, সেই আনন্দেই খুশি থাক।'

আবার উঠতে লাগল ওরা। পথ কোথাও কোথাও ভীষণ খাড়া। গাছের শেকড় ধরে ধরে বেয়ে উঠতে হচ্ছে। আরও দশ মিনিট পর একটা সমতল জায়গায় পৌঁছল ওরা। বন পাতলা ওখানে। এক সময় তা-ও শেষ হল। সামনে তৃণভূমি।

'অপূর্ব!' শব্দ করে হাঁপাচ্ছে কিশোর। চেয়ে রয়েছে সামনের দিকে।

লম্বা, সবুজ ঘাসে ঢেউ তুলেছে জোরালো বাতাস। ঘাসের মাঝে এখানে সেখানে মাথা তুলে রয়েছে বড় বড় পাথরের চাঁই। তুষারে ভিজে, তারপর রোদ খেয়ে ধবধবে শাদা। তৃণভূমির তিনদিক ঘিরে রয়েছে বড় বড় গাছের জঙ্গল। আর চতুর্থ দিকে, ছেলেরা যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে দেখতে পাচ্ছে বহুদূর পর্যন্ত খোলা, মাইলের পর মাইল। ঢালু হয়ে নেমে গেছে স্কি স্লোপ। অনেক অনেক নিচে। ওখানে একগুচ্ছ পাইন গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন ছবি। তার পরে মিলানির সরাইখানা। আর তারও পরে শুকনো, বালিতে ঢাকা আওয়েন ভ্যালি। ছেলেদের পেছনে, পশ্চিমে, আকাশ ফুঁড়ে যেন উঠে গেছে মাউন্ট লফটি-র পাথুরে মূল চূড়াটা। চূড়ার মাথায় এখনও জমে রয়েছে বরফ, কখনও গলে না, এমনকি এই গ্রীষ্মের গরমেও নয়।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ওরা। স্কি স্লোপের কিনার ধরে। ঘাসের ধারে নগ্ন মাটিতে চিহ্নটা রবিনের চোখে পড়ল প্রথম। সরাইখানা থেকে খুঁজেপেতে ওয়াইল্ডলাইফের ওপর লেখা ছোট একটা ম্যানুয়্যাল নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে। জন্তুজানোয়ারের পায়ের ছাপের ওপর লেখা অধ্যায়টা খুললো। অনেক রকম জানোয়ারের পায়ের ছাপের নকশা আঁকা আছে। একটা নকশার সাথে মিলিয়ে দেখল সে, ভালুকের পায়ের ছাপ।

'তাই তো থাকবে, আর কি আশা করতে পারি?' মাথা দুলিয়ে বলল মুসা।

'এই ছাপ খুঁজছি না আমরা,' কিশোর বলল।

'তাহলে কোন্ ছাপ খুঁজছি?'

'আলাদা কিছু। যা ম্যানুয়্যালে নেই।'

'আল্লাহ যেন কোনদিন ওই জিনিস না দেখায়!' হাত নাড়ল মুসা।

এত ওপরে সাধারণ বাতাসকেই লাগছে যেন ঝড়ো হাওয়া, শোঁ শোঁ করে

বয়ে যাচ্ছে ঘাসের ডগা নুইয়ে দিয়ে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে শিস কেটে। হঠাৎ ছেলেদের পেছনে ফুঁপিয়ে উঠল কে যেন।

প্রায় লাফ দিয়ে উঠল মুসা।

ফিরে তাকাল কিশোর। 'আরি!'

ছোট একটা ভালুকের বাচ্চা, বড় জোর কয়েক মাস বয়েস। এগিয়ে এসে মুসার জুতো শুঁকলো। মুখ তুলে হলুদ জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল তার দিকে।

'মা-টা কোথায়?' ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাল মুসা।

'ওই যে!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'দৌড় দাও!'

রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল মা-ভালুক। বাচ্চাটা ছুটে গেল একদিকে, ছেলেরা ছুটল আরেক দিকে। স্কি স্লোপের ঢালে আগে পৌঁছুল মুসা। বেয়ে নামার সময়-সুযোগ কোনটাই নেই। বসে পড়ে পার্কের স্লিপার বেয়ে নামার মত করে শাঁ করে নেমে এল প্রায় বিশ গজ। তার পেছনে কিশোর আর রবিন।

শুকনো পাথুরে পাহাড়ের ঢালে নেমে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসে শুনল, বাচ্চাটার তীক্ষ্ণ চিৎকার। নিশ্চয় মানুষের সঙ্গে খাতির করতে যাওয়ায় শাসন করছে তাকে মা।

'কান ডলছে নাকি?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মুসা।

'ধরতে পরলে কামড়ে আমাদের কান ছিঁড়ত,' বলল রবিন। 'বড় বাঁচা বেঁচেছি।'

চুপ করে বসে রইল ওরা। কিছুক্ষণ পর মায়ের গর্জন, বাচ্চার চিৎকার, কোনটাই আর শোনা গেল না। আবার উঠল ওরা। কিনারে মাথা তুলতেই চোখে পড়ল, ঘন বনের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে বড় ভালুকটা, পেছনে তার বাচ্চা।

পিঠ থেকে ব্যাগ খুলল কিশোর। 'আর বোধহয় আসবে না। তবে এখন থেকে সাবধান থাকতে হবে।' তিনটে ছোট যন্ত্র বের করল। তার নিজের তৈরি ট্র্যান্সমিটার। 'তিন দিকে ছড়িয়ে পড়ে খুঁজলে অল্প সময়ে অনেক বেশি জায়গা দেখতে পারব। কিন্তু যোগাযোগ নষ্ট করব না আমরা। কি খুঁজছি, কি যে দেখে ফেলব, কিছুই জানি না। যে-ই যা দেখি, সঙ্গে সঙ্গে অন্য দু'জনকে জরুরী সঙ্কেত দেব। ঠিক আছে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। কিশোরের হাত থেকে একটা যন্ত্র নিতে নিতে বলল, 'না দেখতে পেলেই বাঁচি।'

'যা বলি মন দিয়ে শোন,' মুসার কথা কানেই তুলল না গোয়েন্দাপ্রধান। 'এখানে, এই খোলা জায়গায় কিছু পাওয়ার আশা কম। আর ঘাসের মধ্যে থাকলেও খুঁজে পাব না, যা লম্বা আর ঘন। বনে ঢুকতে হবে।'

'উত্তর দিক থেকে শুরু করব আমরা। কারণ, সরাইয়ে নেমে থাকলে ওদিক দিয়েই নেমেছে ওটা। মুসা, তুমি পশ্চিমে যাবে। বড় সাদা পাথরগুলোর ধার দিয়ে এগোবে দক্ষিণে। রবিন, তুমিও দক্ষিণেই যাবে, তবে সোজা। মুসা ঘুরে যাবে। একটা জায়গায় গিয়ে দেখা হবে তোমাদের। আমি স্কি স্লোপের কিনার ধরে সোজা এগোব পশ্চিমে। কয়েক মিনিট পর পরই সিগন্যাল দেব আমরা, তাতে অন্তত বুঝতে পারব কে কতখানি দূরে রয়েছি। কিছু দেখতে পেলে "জরুরী" সিগন্যাল দেব। কি বল?'

'দেব,' ঠোঁট উল্টে মাথা কাত করে বলল মুসা। অজানা দানবের সামনে পড়ার কথা ভাবতে ভাল লাগছে না তার।

আবার ন্যাপস্যাকটা পিঠে বাঁধল কিশোর। তারপর ডানে ঘুরে রওনা হয়ে গেল। খানিকটা সরে ঘাসবনের ভেতর দিয়ে মুসাও চলল একই দিকে, পাথরগুলোর কাছে পৌঁছে মোড় নেবে। রবিন দাঁড়িয়ে রইল। দ্বিধা করছে। কান পেতে শুনেছে নির্জন পর্বতের ওপরে বাতাসের কানাকানি। তারপর হোমিং ডিভাইসটা শক্ত করে চেপে ধরে হাঁটতে শুরু করল দক্ষিণে।

চলতে চলতে একবার মাত্র পেছনে ফিরে তাকাল। গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেছে কিশোর। মুসাও প্রায় পৌঁছে গেছে বনের ধারে। যন্ত্রের একটা সুইচ টিপল রবিন, বিপ করে জবাব এল কিশোরের কাছ থেকে। আরেকটা বিপ, মুসার জবাব।

তৃণভূমির দক্ষিণে বনের কিনারে পৌঁছে থামল রবিন। ওপরে খোলা নীল আকাশ। সকালের উজ্জ্বল রোদ। উষ্ণ আবহাওয়া। কিন্তু বনের দিকে চেয়ে দমে গেল তার মন। ভেতরটা কেমন যেন বিষণ্ন, খুব ঘন গাছপালা। গাছের তলায় বিছিয়ে রয়েছে পাইন-নীডলের কার্পেট, বাতাসে ওগুলোর কড়া ঝাঁজালো গন্ধ।

মাথা ঝাড়া দিয়ে মনকে বোঝাল যেন রবিন—কোনও ভয় নেই—কিন্তু মন মানতে চাইল না। শেষে ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঢুকে পড়ল গাছপালার মধ্যে। মাটিতে চোখ রেখে এগোল আস্তে আস্তে। কয়েক সেকেণ্ড পর পরই থেমে কান পাতছে, অপরিচিত শব্দ শোনার জন্যে। চেঁচিয়ে উঠল একটা জে, কোথায় যেন লুকিয়ে রয়েছে পাখিটা, দেখা গেল না। মাথার ওপরের ডালে লাফালাফি করছে একটা কাঠবেরালী।

আরও খানিক দূর এগিয়ে দেখল ছাপটা। অনেকখানি জায়গায় মাটি সামান্য দেবে রয়েছে, ইতস্তত ছড়িয়ে দিয়েছে ওখানে পড়ে থাকা কিছু পাইন-নীডল।

যন্ত্রের সুইচ টিপল রবিন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এল উত্তর দিক থেকে। এক সেকেণ্ড পর আরেকটা বিপ, উত্তর-পশ্চিম থেকে। চিৎকার করে ডাকবে কিনা

ভাবল একবার। নাকি জরুরী সুইচ টিপবে? সিদ্ধান্ত নিতে পারল না সে। ছাপটা বড় কোনও ভালুকের হতে পারে—যদিও ভালুকের পায়ের ছাপের মত লাগছে না। কে জানে, এমন হতে পারে, জোরে ঘুরেছিল, তাতে চাপ লেগে অন্য রকম হয়ে গেছে চিহ্নটা। কিংবা এমনও হতে পারে কোনও ছোট জানোয়ার শুয়েছিল এখানে। শিওর হতে হলে এরকম ছাপ আরও আছে কিনা দেখা দরকার।

ঘন গাছপালার ভেতর দিয়ে এগোল রবিন। মাঝে মাঝে পরিষ্কার মাটি চোখে পড়ছে, পাইন-নীডল নেই। আগ্রহভরে দেখল ওসব জায়গায়, কিন্তু কোনও ছাপ নেই। আরও দুটো জায়গায় দেখল, পাইন-নীডল সরে গেছে ভারি কিছুর চাপে, তবে ওসব জায়গায় কার্পেট এত ঘন যে ছড়িয়ে যাওয়ার পরেও নিচের মাটি বেরিয়ে যায়নি। ফলে ছাপ পড়েনি।

এগিয়েই চলল রবিন। আরও ঘন হয়ে আসছে গাছপালা। আবছা হয়ে আসছে আলো। অবশেষে এক জায়গায় এসে আকাশ আর চোখেই পড়ল না, গাছের ঘন ডালপাতা চাঁদোয়া সৃষ্টি করেছে যেন মাথার ওপর। আকাশ ঢেকে দিয়েছে। আরও কিছু দূর এগোনোর পর সামনে উজ্জ্বল হল আলো। চলার গতি বাড়াল সে। হঠাৎ করেই বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে, ছোট্ট একটা খোলা জায়গায়। ঠিক তার পায়ের কাছেই বিশাল এক ফাটল।

এক কদম আগে বেড়ে নিচে তাকাল রবিন। ওপর থেকে বড় একটা গর্তের মত লাগছে। ফাটলটা প্রায় পঞ্চাশ গজ লম্বা, আর সবচেয়ে চওড়া জায়গাটা হবে দশ ফুট মত। দু'দিকের ধারই খাড়া। অদ্ভুত এই ফাটলের নিচে বরফ জমে রয়েছে, এই গরমেও গলেনি। ভৌগোলিক কারণটা জানা আছে তার। ভূমিকম্প। এরকম অদ্ভুত ভাবে ফেটে যায় মাটি, গভীর খাদের তলায় রোদ পৌঁছতে পারে না, ওখানে উত্তাপ বাড়ে-কমে না। ফলে শীতের জমা বরফ গরমেও গলে না, কারণ গরম যায়ই না তলায়।

বিপ করে উঠল রবিনের যন্ত্র। কিশোরের সিগন্যাল। তৃণভূমির উত্তরে রয়েছে এখন। আরেকটা বিপ শোনা গেল। যন্ত্রের কাঁটা পশ্চিম দিক নির্দেশ করল। দু'বার সুইচ টিপে জবাব দিল রবিন, কোথায় রয়েছে জানাল দুই বন্ধুকে। ইস্, এটা না হয়ে সঙ্গে এখন ওয়াকিটকি থাকলে বড় ভাল হত! কথা বলতে পারত একে অন্যের সঙ্গে।

ফাটলের কিনারগুলো দেখছে রবিন। শূন্য মাটির দেয়াল, একটা আগাছা জন্মায়নি, নিচের দিকে দেয়ালের মাটি ভেজা ভেজা। পিছিয়ে এল সে। দেখল, তার নরম স্নীকারেরও স্পষ্ট ছাপ পড়েছে মাটিতে। ফাটলের ধার দিয়ে কোনও জীব গেলে তার পায়ের ছাপ পড়বেই।

ফাটলের কিনার দিয়ে এগোল সে। মাটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

তার পেছনে, বাঁয়ে, মট করে একটা ডাল ভাঙল।

থমকে দাঁড়াল রবিন। কান পেতে রয়েছে। একেবারে চুপ। এক সেকেণ্ড পেরোল···দুই···তিন···কিন্তু ওই একটা শব্দের পর আর কিছুই শোনা গেল না। ভীষণ নীরবতা। পাখি ডাকছে না, কাঠবেরালীর হুটোপুটি নেই, এমনকি বাতাসও স্তব্ধ। সবাই যেন কিসের প্রতীক্ষা করছে নীরবে।

কিসের?

রবিনের পায়ের একটা পেশী নেচে উঠল। কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলল, 'ও কিছু না।' আস্তেই বলল কথাটা, কিন্তু নীরবতার মাঝে বড় বেশি জোরালো হয়ে কানে বাজল।

শুনছে সে। খুব কাছেই···একেবারে কাঁধের ওপর নিঃশ্বাস পড়ল কার!

ওটা যাতে চমকে না যায়, সে-জন্যে, ধীরে, অতি ধীরে মাথা ঘোরাতে শুরু করল রবিন। ঘাড়ে গরম নিঃশ্বাস লাগছে। তারপর আলতো ছোঁয়া লাগল কাঁধে, যেন তার কলার থেকে নাড়া দিয়ে একটা পোকা ফেলল কেউ।

কে যে প্রথম চেঁচিয়ে উঠল, বলতে পারবে না রবিন। সে, নাকি জীবটা? কালো চোখের তারার চারপাশে শাদা অংশের পরিবর্তে লালচে। বিশাল রোমশ একটা কাঁধ। কখন পিছিয়েছে রবিন, তা-ও বলতে পারবে না, টের পেল ফাটলের কিনার থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছে।

চিত হয়ে পড়েছে সে। শুধু আকাশ দেখতে পাচ্ছে, আর ফাটলের খাড়া দেয়াল।

ধপ করে বরফে বাড়ি লাগল দেহটা। আরেকটা চিৎকার। জ্ঞান হারাল রবিন।

দশ

চোখ মেলল রবিন। নড়ল না। অনেক ওপরে কোথাও ডেকে উঠল একটা পাখি।

উঠে বসল সে। একটা কাঁধ ব্যথা করছে। হাত-পা নেড়ে দেখল, ঠিকই আছে, ভাঙেনি। বরফের ওপর জমে থাকা নরম তুষারই বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে। হাড়-টাড় ভাঙেনি কিছু।

ওপরের খোলা নীল আকাশের দিকে তাকাল সে। মনে পড়ল লালের মাঝে কালো চোখের তারা, রোমশ কাঁধ, ঘাড়ে গরম নিঃশ্বাস···মনে পড়ল স্কাই ভিলেজে রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ায় দানব। বাচাল মরিসনের কথাঃ বাচ্চা ছেলেমেয়ে ধরে কচকচিয়ে চিবিয়ে খায়···

উঠে দাঁড়াল রবিন। কাঁটা দিল গায়ে। ভয়ে, না ঠাণ্ডায়, বলতে পারবে না। কয়েক ফুট দূরে পড়ে রয়েছে হোমিং ডিভাইসটা। ঠিক আছে তো, না নষ্ট হয়ে গেছে? এগিয়ে গিয়ে তুলল। সুইচ টিপতেই বিপ করে উঠল, ঘুরে গেল কাঁটা। না, ঠিকই আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

খাড়া দেয়ালের দিকে তাকাল রবিন। বেয়ে ওঠা অসম্ভব। সাহায্য ছাড়া কিছুতেই বেরোতে পারবে না এই গর্ত থেকে। জরুরী সুইচে চাপ দিতে গিয়েও থেমে গেল সে। জীবটা কি রয়েছে এখনও ওপরে? খাদের কাছাকাছি? তাহলে মুসা আর কিশোরকে ডেকে এনে ওদেরকেও বিপদে ফেলবে। ডাকার আগে বরং শিওর হয়ে নেয়া যাক।

ওপর দিকে মুখ তুলে চেঁচাল রবিন, 'এই, এই, আছ ওখানে? এই দৈত্য...'

সাড়া এল না। উঁকি দিল না কোনও বিকট মুখ।

আরও কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল রবিন। আবার ডাকল। না, নেই বোধহয়। চলে গেছে। চাপ দিল জরুরী সুইচে।

এক এক করে কাটছে মিনিট। সময় বড় দীর্ঘ মনে হচ্ছে। প্রতিটি মিনিট যেন একেকটি যুগ। পনের মিনিটের মাথায় খাদের কিনারে উঁকি দিল মুসার মুখ। ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'রবিন, তুমি ঠিক আছ?'

'আছি।'

কিশোরের মুখও দেখা গেল। 'ওখানে কি করছ?'

'পড়ে গেছি।'

'কিভাবে?' জানতে চাইল মুসা।

'আমি যা দেখেছি, দেখলে তুমিও পড়তে।'

'কি দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'জানোয়ার...মস্ত বড়! ওটা কি বলতে পারব না। পেছন থেকে এল...এই, ওসব কথা পরেও শুনতে পারবে। আগে তোল আমাকে।'

খাদের গভীরতা অনুমান করল কিশোর। 'দড়ি, দড়ি লাগবে। মুসা দৌড়ে যাও, আমার চেয়ে তুমি তাড়াতাড়ি যেতে পারবে। সরাই থেকে দড়ি নিয়ে এসগে।'

চলে গেল মুসা।

খাদের কিনারে বসে জিজ্ঞেস করল আবার কিশোর, 'কি দেখেছ, রবিন?'

জানি না, কিশোর। এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল সব...ঘাড়ে গরম নিঃশ্বাস পড়ল। কাঁধে আঙুল ছোঁয়াল। ফিরে চেয়ে দেখি কালো দুটো চোখ, চারপাশে লাল। রোমশ কাঁধ। আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম, ওটাও চেঁচিয়ে উঠল। কিভাবে যে

পড়ে গেলাম, বলতে পারব না।'

'ভালুক?'

'না।'

উঠে খাদের কিনারে হাঁটতে শুরু করল কিশোর, মাটির দিকে চোখ।

'কিশোর? আছ এখনও?'

'আছি। তোমার জুতোর ছাপ দেখতে পাচ্ছি। আর কোনও ছাপ আছে কিনা…রবিন!'

'কি হল?'

'তুমি শিওর, কোনও মানুষকে দেখনি? বিরাট কোনও মানুষ, খালি পা!'

'কি জানি…'

'বললে বিশ্বাস করবে না, রবিন, বিরাট একেকটা পা! মানুষের খালি পায়ের মত!'

মরিসনের গল্প মনে পড়ল আবার রবিনের। বরফে বিশাল পায়ের ছাপ নাকি দেখেছিল এক ট্র্যাপার। 'কিশোর…'

জবাবে মৃদু হুঁক করে উঠল গোয়েন্দাপ্রধান।

'কিশোওর!' চেঁচিয়ে ডাকল আবার রবিন।

জবাব নেই। কিছুক্ষণ পর ডাল ভাঙার শব্দ কানে এল তার। ঝাড়ু দেয়ার আওয়াজ হল। খাদের কিনারের মাটিতে পাতা ঘষছে।

'কিশোর, কি করছ?'

জবাবে আরও কিছুক্ষণ ঘষাঘষি। তারপর নীরবতা। বার বার কিশোরের নাম ধরে ডেকেও সাড়া পেল না রবিন। শঙ্কিত হয়ে উঠল। দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ঘাড়ের রোম। খাড়া দেয়াল বেয়ে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা চালাল। পারল না। ওঠা অসম্ভব।

আরও কয়েকবার কিশোরের নাম ধরে ডাকল রবিন। সাড়া না পেয়ে চুপ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর গোঙানি শুনে আবার ডাকল, 'কিশোওর?'

জবাব মিলল এবার।

'কি হয়েছে? কোথায় গিয়েছিলে?'

খাদের কিনারে উঁকি দিল কিশোর। 'যাইনি,' ঘাড় ডলছে। 'পেছন থেকে এসে মারল ঘাড়ে রদ্দা। বেহুঁশ হয়ে গেলাম, মিস্টার কারসনের মত। এই সুযোগে গাছের ডাল ভেঙে পায়ের ছাপগুলো মুছে দিয়ে গেছে কেউ। কোনও ছাপ আর দেখছি না এখন।'

এগার

'ভালুকে মারেনি, এটা শিওর,' বলল মুসা। দড়ি নিয়ে এসেছে। খাদ থেকে টেনে তোলা হয়েছে রবিনকে।

'তা-তো নিশ্চয়,' মাথা দোলাল কিশোর। 'আর ভালুক ডাল ভেঙে পায়ের ছাপও মুছে দেয় না। যা একেকখান পা, যদি দেখতে না···'

এমন ভাবে তাকাল মুসা, যেন রবিন আর কিশোর দু'জনেই পাগল হয়ে গেছে। 'কিসের পা?'

'খালি পা,' বলল রবিন। যেন এতেই সব কিছু বুঝে যাবে মুসা।

'প্রায় আঠার ইঞ্চি লম্বা,' যোগ করল কিশোর। 'মানুষের পায়ের মত।'

'আঠার ইঞ্চি লম্বা মানুষের পা?'

'মানুষ হোক বা না হোক, ভালুক যে নয়, তাতে কোনও সন্দহ নেই।'

দড়িটা আবার কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে বিড়বিড় করল মুসা, 'মনস্টার মাউনটেইন···তারমানে দৈত্য-দানবের পাহাড়···আছে বলেও মনে হচ্ছে···'

'দৈত্য-দানব আছে?' মুসার একেবারে কাঁধের কাছে শোনা গেল তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠ।

বুকের খাঁচায় তড়াক করে এক লাফ মারল মুসার হৃদপিণ্ডটা।

'সরি। চমকে দিয়েছি, না?' বললেন মিস্টার ডোনার। হাসি হাসি মুখ। নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছেন বনের ভেতর থেকে, ছেলেদের অলক্ষ্যে। 'পায়ের ছাপের কথা বলছিলে? কোথায় দেখেছ?'

'এখানেই,' জবাব দিল কিশোর। 'কেউ মুছে দিয়ে গেছে।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' মাথা ঝাঁকালেন ডোনার। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে একটা বর্ণও বিশ্বাস করেননি।

'ছাপ নিশ্চয় ছিল!' জোর দিয়ে বলল মুসা। 'কিশোর পাশা যখন দেখেছে বলছে, নিশ্চয় দেখেছে।'

হাসি হাসি ভাবটা দূর হয়ে গেল ডোনারের মুখ থেকে। 'নিশ্চয় ওই বাচাল ব্যাটা গল্প শুনিয়েছে···ওকে কয়েকটা ধমক দেয়া দরকার! এভাবে ভয় দেখায়, ওর লজ্জা পাওয়া উচিত। ···যাচ্ছি, এখুনি যাচ্ছি আমি।' সাংঘাতিক এক জরুরী ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছে যেন, এমন ভাব দেখিয়ে ঘুরে গটমট করে রওনা হয়ে গেলেন নিরামিষভোজী। কিছু দূর গিয়ে ফিরে তাকালেন। 'তাই বলে এখানে বিপদ নেই, তা কিন্তু নয়। ভালুক আছে, আরও নানারকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

সাবধানে থেক।' বলে হারিয়ে গেলেন বনের ভেতরে।

'কথাটা ঠিকই বলেছে,' একমত হল মুসা। 'দৈত্য-দানবের সঙ্গে টক্কর দিলে বিপদ হতেই পারে।'

'আরও একটা ব্যাপার বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন,' কিশোর বলল। 'আজব কোনও জীব সত্যি আছে এখানে। এবং সেটা তিনি জানেন। হুঁশিয়ার করেছেন সে-কারণেই। ভালুক আছে বলে নয়।'

'এখানে আর কি কাজ? চল আমরাও যাই,' বলল রবিন।

ফিরে চলল ওরা।

বনের অন্য পাশে তৃণভূমিতে বেরিয়ে দেখল, স্কি স্লোপের কিনারে পৌঁছেছেন মিস্টার ডোনার। ওরা সেখানে আসতে আসতে স্লোপের নিচে নেমে গেলেন তিনি।

'বেশি জোরে হাঁটছে,' বলল রবিন।

'নিচের দিকে নামা সহজ,' মুসা বলল। নামতে শুরু করল স্লোপ বেয়ে।

গোড়ায় নেমেই দেখা হয়ে গেল মিক কনরের সঙ্গে। ওপরে উঠছে। পিঠে বাঁধা ন্যাপস্যাক, কাঁধে ঝোলানো ট্র্যাংকুইলাইজার গান। ছেলেদের দেখে দাঁড়িয়ে গেল। কুঁচকে গেল ভুরু। 'কোথায় গিয়েছিলে?'

'ঘুরতে,' জবাব দিল মুসা।

'খাদে পড়েছিলে কে? ডোনার বলল,...' রবিনের ওপর স্থির হল তার চোখ। 'তুমি?'

রবিন কিছু বলার আগেই কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'খাদটার কথা জানেন আপনি?'

'জানব না কেন? ওটা গোপন কিছু নয়। গরমের সময় ট্যুরিস্ট এলে ওদের জন্যে একটা বড় আকর্ষণ হবে। ওরকম ফাটল খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। ওদিকে গিয়েছিলে কেন? বিপজ্জনক এলাকা, ভালুকের ছড়াছড়ি...'

'ভালুক?' কনরের চোখে চোখে তাকাল কিশোর। 'সে-জন্যেই ট্র্যাংকুই-লাইজার গান নিয়ে যাচ্ছেন? ধরবেন নাকি?'

'না। ভালুক ধরা বেআইনী। মারাও বেআইনী। বিপদে পড়লে কি করব? দু'দিক সামলানোর এই একটা উপায়ই বের করেছি আমি। বিপদ বুঝলে ঘুম পাড়িয়ে রেখে পালিয়ে আসব,' হাসল কনর। 'ভালুক মারলে পুলিশ ধরার আগেই ডোনার এসে ধরবে আমাকে। খুন করবে।' নিজের রসিকতায় নিজেই হা হা করে হেসে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল।

'ছোট্ট একটা ভুল করেছেন ডোনার,' চলতে চলতে বলল রবিন।

'হ্যাঁ,' বলল মুসা। 'তুমি খাদে পড়েছিলে একথা আমরা তাঁকে বলিনি। কি

করে জানলেন'?'

'হয়ত আমাকে তিনিই মেরেছেন,' বলল কিশোর। 'পায়ের ছাপও মুছেছেন। দেখে কিন্তু লোকটাকে ভয়ানক মনে হয় না, সাধারণ, নিরীহ একজন মানুষ। তবে তিনি আর কনর, দু'জনেই জানেন পাহাড়ের ওপরে দৈত্য আছে। আর সেটা কোনও কারণে গোপন রাখতে চাইছেন।'

সরাইখানার পেছনে চলে এল ছেলেরা।

সুইমিং পুলের গর্ত থেকে উঠে এল রোভার। হাত নাড়ল কিশোরের দিকে চেয়ে।

এগিয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। গর্তের নিচে বসে বিশ্রাম করছে বোরিস। 'কেমন বেড়ালে?' ওপরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল।

'দারুণ,' বলল কিশোর।

'মিস্টার ডোনার এত ভয় পেলেন কেন'?' জানতে চাইল রোভার। 'আমাদেরকে এসে বললেন, আর যেন কখনও ওদিকে তোমাদেরকে যেতে না দিই।'

'তার কথা শুনবেন?' হেসে জিজ্ঞেস করল মুসা।

হাসিটা ফিরিয়ে দিল রোভার। 'যা খুশি করোগে। শুধু, সাবধানে থেক।'

'হ্যাঁ, হুঁশিয়ার থাকবে,' বলল বোরিস। 'হো-কে?'

'ও-কে,' কথা দিল কিশোর। 'মিস্টার ডোনার কোথায়?'

'গাঁয়ের দিকে গেল। মিলি গেছে বিশপে, গাড়ি নিয়ে, কেনাকাটা করবে। মিস্টার কারসনও জানি কোথায় গেল, তার গাড়ি নিয়ে।'

'মিলি বলে গেছে,' রোভার জানাল। 'ফ্রিজে দুধ আর স্যাণ্ডউইচ আছে। তোমরা ফিরলে খেয়ে নিতে।'

'আমি এখুনি যাচ্ছি,' বলেই ঘুরল মুসা।

'খেয়েদেয়ে বাসন-পেয়ালা আর গেলাস ধুতে গিয়ে, সিংকের ওপরে, জানালার চৌকাঠের নিচের গোবরাটে মিলানির বিয়ের আঙটিটা দেখতে পেল কিশোর। আনমনেই বিড়বিড় করল, 'বেশি বড়। আঙুল থেকে কখন খুলে পড়েছে, টেরই পায়নি।'

গেলাস মুছতে মুছতে শুধু মাথা ঝোঁকাল মুসা। ধোয়া, মোছা জিনিসগুলো আবার আগের জায়গায় সাজিয়ে রাখছে রবিন।

আরেকটা গেলাস তুলতে গিয়ে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে লিভিং রুমের মেঝেতে চোখ পড়ল মুসার। হাত থেমে গেল। তোয়ালেটা টেবিলে ফেলে পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল জিনিসটা। পুরনো একটা ম্যানিব্যাগ। এক ধারের সেলাই

কেটে গেছে। সেটা বুঝতে পারেনি মুসা, কোণ ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলতেই ভেতর থেকে ছড়িয়ে পড়ল কিছু কার্ড আর কাগজ। 'দূর!' বলে নিচু হয়ে কুড়াতে লাগল ওগুলো।

'কার?' রান্নাঘর থেকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

বিজনেস কার্ড আর রেস্টুরেন্টের রশিদগুলোর মাঝে ড্রাইভিং লাইসেন্সটা পেল মুসা। 'মিস্টার কারসনের। ···খাইছে! গাড়ি নিয়ে গেছে, পুলিশে ধরলে তো হাজতে ঢোকাবে।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। একটা ছবি পড়ে রয়েছে মেঝেতে। সেটা দেখে থেমে গেল। নিচু হয়ে তুলে নিল।

'কার ছবি?' রবিনও বেরিয়ে এসেছে।

'মিলানি!'

কনর আর মিলানির একসঙ্গে তোলা ছবি। কোনও শহরের কফিশপ থেকে বেরিয়ে আসার সময় তোলা হয়েছে, চুরি করে, ওরা জানে না। হালকা রঙের শার্ট পরেছে মিলানি, তার ওপর সোয়েটার। মুখ কনরের দিকে ফেরানো। কনরের মুখ খোলা, স্ত্রীকে কিছু বলছে।

'এই ছবি মিস্টার কারসনের মানিব্যাগে কেন?' ছবিটা রবিনের হাতে দিল কিশোর।

'কাগজপত্রগুলো তুলে গুছিয়ে আবার ব্যাগে ভরে রবিনের হাত থেকে ছবিটা নিলো মুসা। 'স্কাই ভিলেজে তোলা হয়নি,' বলল সে। পেছনটা উল্টে দেখল, তারিখ আছে। 'গত হপ্তায় তুলেছে। লেক ট্যাহোইতে।'

শূন্য চোখে পরস্পরের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা।

'মিলানি কি আগে থেকেই চিনতো কারসনকে?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল রবিন। 'পুরনো বন্ধু? নাকি কনরের পরিচিত? ওদের বিয়েতে যোগ দিয়েছিল?'

'না!' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল কিশোর। 'আমরা যেদিন এলাম, সেদিনই শুনেছি, ওদের বিয়ের কোনও অনুষ্ঠান হয়নি। কারসন আর ডোনার বাইরের লোক। মনে নেই? কনর বলেছিলঃ এই উৎসবে আমাদের পেইং গেস্টদেরও শামিল করে ফেলব।'

ছবিটা ব্যাগে ঢোকাল মুসা। 'মিস্টার কারসন এখানে পেইং গেস্ট···লেক ট্যাহোইতে গিয়ে ছবি তুলেছে কনরদের···বেশি কাকতালীয় হয়ে যাচ্ছে না?'

মুসার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে বলল কিশোর, 'এটা কারসনের টেবিলে রেখে দেব। কিছুই বলব না। চোখ রাখব। দেখি, কি করেন?'

কারসনের ঘরটা বাড়ির উত্তর অংশে। ওটার পাশেই বড় ডাবলরুম, যেটা

এখন বোরিস আর রোভারের দখলে।

'দরজায় তালা নেই তো?' বলল রবিন।

'এখানে কোনও ঘরেই তালা থাকে না,' মুসা বলল। 'আগেই খেয়াল করেছি।'

ঘরটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পপলিনে তৈরি একটা অ্যানারাক অবহেলায় ফেলে রাখা হয়েছে চেয়ারের হেলানে। টেবিলের ওপর একটা চিরুনি।

ওয়ারড্রোবের দরজা খুলল কিশোর। অনেকগুলো শার্ট—কয়েকটা পুরনো, ময়লা, বাকিগুলো নতুন। নিচে পড়ে রয়েছে কালো একটা প্যান্ট। পাশে কারসনের সুটকেস।

ওটা তুলে এনে বিছানার ওপর রেখে খুলল কিশোর। কয়েক জোড়া মোজা, একটা পরিষ্কার আণ্ডারওয়্যার, কয়েক রোল ফিল্ম আর একটা বাড়তি ফ্ল্যাশার। একটা বইও আছে। নাম দেখে শিস দিয়ে উঠল মুসা। বলল, 'ফটোগ্র্যাফি ফর বিগিনারস!'

দ্রুত বইটার পাতা উল্টে চলল কিশোর। 'একজন পেশাদার ফটোগ্রাফারের সুটকেসে নবিসদের বই, অবাকই করে। পত্রিকাওয়ালারা ভালো ছবি না হলে নেয় না, আর তেমন ছবি তোলা দক্ষ ফটোগ্রাফারের কাজ। নবিস দিয়ে হবে না,' বইটা বন্ধ করল সে। 'মিস্টার কারসন আর যা-ই হোন, ফটোগ্রাফার নন।'

মোজা আর আণ্ডারওয়্যার তুলে নিচে কি আছে দেখল রবিন। ছোট একটা বহু-ব্যবহৃত নোটবুক পাওয়া গেল। পাতায় পাতায় অসংখ্য নাম-ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর লেখা। বেশির ভাগই লেক ট্যাহোই-এর ব্যবসায়ীদের নাম-ধাম। খাতার একেবারে শেষ দিকে একটা পাতায় রয়েছে মিলানির নাম। আরও কিছু লেখা। পড়ে বড় বড় হয়ে গেল রবিনের চোখ।

'কিছু পেলে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এই যে, ওপরের একটা নম্বর, ক্যালিফোর্নিয়ার।' পড়ল রবিন। 'পি ডব্লিউ ইউ ওয়ান ওয়ান থ্রী। তার নিচে লেখা, মিস মিলানি রোজেনডাল, দা স্কাই ইন, স্কাই ভিলেজ, ক্যালিফোর্নিয়া।'

'নম্বরটা তো গাড়ির লাইসেন্স নম্বর বলে মনে হচ্ছে,' মুসা বলল।

'আর কিছু লিখেছে?' জানতে চাইল কিশোর।

নীরবে খাতাটা তার হাতে তুলে দিল রবিন।

'আশ্চর্য!' দেখে বলল কিশোর। 'অনেক কিছুই লেখা রয়েছে মিলানি রোজেনডালের নামে। সরাইখানা আর স্কি স্লোপের মালিক, পেমেন্ট ভালো দেয় বলে স্কাই ভিলেজে সুখ্যাতি···সব কথা। আর একেবারে নিচের লেখাটা দেখেছ?' আ পারফেক্ট পিজিয়ন!'

'পিজিয়ন?' মুসা বলল। 'ও-তো চোর-ডাকাতদের ভাষা। তাই না?'

'হ্যাঁ,' খাতাটা বন্ধ করে সুটকেসে রাখতে রাখতে বলল কিশোর। 'চোর-ডাকাতেরাই ওরকম করে কথা বলে। ওরা শিকারকে বলে "পিজিয়ন"।'

'তারমানে মিস্টার কারসন চোরের দলের কেউ, আর মিসেস কনর তার শিকার।'

'এখন শুধু এটুকু বলতে পারি, মিস্টার কারসন ফটোগ্রাফার নন,' কিশোর বলল। 'কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন এখানে...'

বাইরে এঞ্জিনের শব্দ। দৌড়ে বেরোল কিশোর। হল পেরিয়ে মিস্টার ডোনারের ঘরে ঢুকে জানালা দিয়ে দেখল এক নজর। ফিরে এল আবার কারসনের ঘরে। 'মিসেস কনর। গাড়ির লাইসেন্স নম্বর পি ডব্লিউ ইউ ওয়ান ওয়ান থ্রী।'

তাড়াতাড়ি সুটকেস বন্ধ করে আগের জায়গায় রেখে দিল রবিন।

বিছানার কুঁচকানো চাদর হাত দিয়ে ডলে সমান করল মুসা। কিশোরের দিকে তাকাল। 'মিসেস কনরকে জানাব নাকি সব কথা?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'এখন না। আগে কারসনের বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় হোক। রবিন, মনে আছে তো, আজ রাতে তোমার বাবাকে ফোন করতে হবে?'

বার

লিভিং রুমে একটা টেবিলে পুরনো কিছু ম্যাগাজিনের সঙ্গে কয়েকটা নতুন ম্যাগাজিন রাখছিল মিলানি, পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল, সামান্য চমকে উঠল বলে মনে হল। 'ওহ্, তোমরা...আমি ভেবেছি বাড়িতে কেউ নেই।'

'আপনার চাবিটা আবার খুঁজলাম আজ,' বলল কিশোর।

'অ্যাঁ? ও, হ্যাঁ, চাবি,' ভাঁজ পড়ল মিলানির কপালে। 'আজও পাওনি?'

'না,' রবিন জানাল। 'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়নি, কেউ ওটা নিয়ে গেছে? এখানে তো কোনও ঘরের দরজায়ই তালা থাকে না। যে কেউ ঢুকে নিয়ে যেতে পারে।'

'নিয়ে কি করবে? ওই চাবি শুধু মিলানি রোজেনডাল ব্যবহার করতে পারে। ব্যাংকের লোকেরা শুধু মিলানি রোজেনডালকে চেনে। ওই চাবি চুরি করে কারও কোনও লাভ হবে না। চুরি যায়নি। আমি লুকিয়েই রেখে গেছি কোথাও।'

'চুরি যায়নি?' মুসা বলল।

'না, এ-বাড়িতেই কোথাও আছে,' মাথা চুলকাল মিলানি। 'খালি যদি মনে করতে পারতাম...'

বাইরে আরেকটা গাড়ির শব্দ হল। খানিক পরে ঘরে ঢুকলেন কারসন। এক হাতে ক্যামেরার খাপ। নীরবে মিলানি আর ছেলেদের দিকে একবার মাথা নুইয়ে চলে গেলেন নিজের ঘরের দিকে।

'জানোয়ারের ছবি তোলা খুব কঠিন,' বলল কিশোর। 'অনেক ধৈর্য লোকটার। প্রায়ই আসেন নাকি এদিকে?'

'না, এই প্রথম এল,' মিলানি জানাল। 'পাঁচ দিন আগে এসেছে। চিঠি লেখেনি, ফোন করে রুম বুক করেনি। সোজা এসে উঠল। ঘরও খালি ছিল, জায়গা দিয়ে দিলাম।'

'মিস্টার ডোনারও মজার লোক,' কিশোর বলল। 'বেশির ভাগ সময়ই তো মনে হয় পাহাড়ের ওপরে কাটান। জন্তুজানোয়ারের সঙ্গে।'

'সত্যি কি ওগুলো ওর কথা বোঝে? আমার ভাবতে অবাক লাগে। তবে সে-ও এই পয়লাবার এল। বুনো জানোয়ারকে নাকি সাহায্য করতে এসেছে,' হেসে উঠল মিলানি। 'শুনলে হাসি পায়। আজব লোক, তবে ভালই। খাওয়ার ব্যাপারে শুধু জ্বালায়...'

রান্নাঘরে চলে গেল মিলানি।

টিন-বয়াম নামানোর খুটখাট আওয়াজ কানে এল ছেলেদের। নীরবে বেরিয়ে এল ওরা সরাই থেকে, পেট্রল স্টেশনে রওনা হল।

পাম্পের সামনে বিকেলের রোদে বসে ঢুলছে মরিসন। শব্দ শুনে চোখ মেলল। 'পাহাড়ে কেমন বেড়ালে?'

ঘুরিয়ে জবাব দিল মুসা, 'মিস্টার ডোনারের সঙ্গে কথা বলেছেন তাহলে।'

'আমি বলিনি,' ডোনারই বলে গেছে। ওর ধারণা, দৈত্যের গল্প শুনিয়ে আমেরিকার সমস্ত ছেলেছোকরার মাথা খারাপ করে দিচ্ছি আমি।' সরু হয়ে এল মরিসনের চোখের পাতা। 'সকালে পাহাড়ের ওপর কি দেখেছিলে?' ছুঁড়ে দিল যেন প্রশ্নটা।

'শিওর না,' রবিন বলল। 'বড় কিছু। কোনও ধরনের জানোয়ার।'

হতাশ হল মরিসন। 'তাহলে হবে হয়ত কোনও ভালুকটালুক। তুমিই ফাটলে পড়েছিলে, না?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'কাপড়ের অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ব্যথা পেয়েছ?'

'না। তবে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'তা-তো পাবেই। বনে-বাদাড়ে বেড়াতে গেলে আরও হুঁশিয়ার থাকা উচিত। দেখে তো মনে হয় বুদ্ধিমান ছেলে। ভালুককে খোঁচাতে গেলে কেন? তুমি তো ভয়

পেলেই, মিলানি রোজেনডালকেও অস্বস্তিতে ফেললে। ও, এখন তো আবার মিলানি কনর।'

'মিসেস কনর ঘাবড়ে গেছেন?' মুসা বলল। 'এইমাত্র দেখা হল। কই, তেমন তো মনে হল না।'

'হয়ত সামলে নিয়েছে। বিশপ থেকে ফেরার পথে পেট্রল নিতে থেমেছিল। তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করলাম। জানতে চাইলাম, তোমরা পাহাড় থেকে নামার পর তোমাদের সঙ্গে কথা হয়েছে কিনা। আর ওই কারসনটাও এসেছিল। একটা ব্যাপার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ, এখানে কি ঘটে না ঘটে সব খবরাখবর রাখার চেষ্টা করি আমি।'

'পেরেছি,' হাসল মুসা।

মিলানি বলল, 'তোমাদের পাহাড়ে যাওয়াটা তার স্বামীর পছন্দ নয়। কখন ভালুকে আবার কি করে বসে, সেই ভয়। বিয়ের পর স্বভাব বদলে গেছে মেয়েটার। সব ব্যাপারেই নার্ভাস। সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার। ডাস্টবিনে খাবার খুঁজতে এসেছিল ভালুক। এমন রাগাই রাগল মিলানি, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করল। চুলা থেকে গরম কড়াই তুলে ছুঁড়ে মারল জানোয়ারটাকে।'

অবাক হল রবিন। 'তাই? ভালুকের মত জানোয়ারকে...'

'কাজ হয় অনেক সময়। বেশি কাছে না গেলেই হল। ভয় পেয়ে পালায়।'

ঘড়ি দেখল রবিন। কিশোরের দিকে চেয়ে বলল, 'চারটে বাজে। বাবাকে বাড়ি পাওয়া যেতে পারে। এখনই ফোন করে দেখব নাকি?'

'দেখ।'

'সরাইয়ের ফোন খারাপ নাকি?' জানতে চাইল মরিসন।

'না, খারাপ না,' তাড়াতাড়ি বলল রবিন। 'এখানে এসে মনে হল, তাই ভাবলাম...'

'ও, আচ্ছা, কর গিয়ে,' হাত নেড়ে বুদটা দেখাল মরিসন। 'যাই, কিছু খেয়ে আসি। খিদে পেয়েছে। তোমার ফোন তুমি কর গিয়ে, আমি আমার নিজের চরকায় তেল দিতে যাই। অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো আমি একদম পছন্দ করি না।'

উঠে আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে রাস্তায় উঠল অ্যাটেনডেন্ট।

'ও-ব্যাটা যেদিন নাক গলানো বন্ধ করবে,' সেদিকে চেয়ে বলল মুসা। 'আমার হাতের তালুতে সেদিন চুল গজাবে।'

হেসে ফেলল রবিন। এগিয়ে গেল বুদের দিকে। পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এসে জানাল, রিনোর টেলিফোন বুকে মিক কনরের নাম নেই। ক্রেডিট অফিস খোঁজখবর করছে, তবে এখনও কোনও খবর পায়নি। মিস্টার মিলফোর্ড আশা

করছেন, কাল নাগাদ পাওয়া যেতে পারে। অন্য সূত্রেও খবর জোগাড়ের চেষ্টা করছেন তিনি।

নিরাশ মনে হল কিশোরকে।

'বাবা বলল,' রবিন আরও জানাল। 'সরাইয়ে থাকা-খাওয়াটা উচিত হচ্ছে না আমাদের। মিলানি বোরিস আর রোভারের বোন, আমাদের কিছু হয় না। পয়সা ছাড়া তার ওখানে আমাদের থাকাটা ভাল দেখাচ্ছে না।'

'আমিও তাই ভাবছি,' বলল কিশোর। 'তাঁবুতেই থাকব। আর খাবার কিনে খাব।'

সরাইয়ে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা। কনর দম্পতিকে জানাল তাদের সিদ্ধান্তের কথা। বাইরে থাকাটা উচিত নয়, ভালুকের ভয় আছে, এ-নিয়ে কিছুক্ষণ তর্ক করল কনর। কিন্তু কিছুতেই ছেলেদেরকে ঘরে থাকতে রাজি করাতে না পেরে শেষে বলল, সামান্যতম বিপদ দেখলেই যেন ডাক দেয়।

সূর্য ডোবার আগেই স্লীপিং ব্যাগ নিয়ে তাঁবুতে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। সরাই থেকে কিনে আনা কাঁচা খাবার খোলা আগুনে রান্না করে খেল। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল। নোটবুক আর কলম বের করে এই কেস সম্পর্কে কিছু পয়েন্ট লিখে রাখতে শুরু করল রবিন। কলম চালাতে চালাতে বলল, 'এযাবৎ যা যা জানলামঃ একজন লোক নিজেকে ফটোগ্রাফার বলে পরিচয় দিয়েছেন—আসলে তিনি ফটোগ্রাফার নন। মিসেস কনরের টাকার ব্যাপারেও তাঁর ভারি আগ্রহ। চুরি করে মিস্টার আর মিসেস কনরের ছবি তুলেছেন। অথচ, মিসেস কনর জানিয়েছে, আগে তার সঙ্গে পরিচয় ছিল না কারসনের, এই প্রথম এসেছেন সরাইখানায়।'

'এবং রাতের বেলা ঘাড়ে রদ্দা খেয়েছে,' যোগ করল মুসা। 'ফটোগ্রাফারই যদি না হবে, রাতের বেলা ভালুকের ছবি তুলতে গিয়েছিল কেন?'

'ফটোগ্রাফার বলে পরিচয় দিয়েছেন,' কিশোর বলল। 'হয়ত লোক দেখানর জন্যেই গিয়েছিলেন ছবি তুলতে। কারসনের কথা থাক। মিক কনরের কথা কি কি জেনেছি আমরা?'

'ও বলেছে তার ভাল আয়ের ব্যবস্থা আছে,' রবিন বলল। 'ট্র্যাংকুইলাইজার গান নিয়ে রোজই যায় পাহাড়ের ওপর। একটা গর্ত খুঁড়ছে, বলছে সুইমিং পুল বানাবে, আদপে ওটা পুল নয়।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'লোকটা আসলেই খারাপ কিনা, বোঝা যাচ্ছে না, যদিও বোরিস আর রোভার পছন্দ করতে পারছে না তাকে।'

'বাকি থাকল, মিস্টার ডোনার,' বলল মুসা। 'লোকটার মাথায় ছিট আছে।'

'আর দেখে মনে হয়, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না,' কিশোর বলল।

'অথচ আজ সকালে উনিই আমাকে মেরেছেন। পায়ের ছাপও মুছেছেন।'

'এখন কথা হল, দানবের পাহাড়ে সত্যি কি দানব আছে?'

'কিছু একটা দেখেছি আমি,' বলল রবিন। 'আবারও বলছি, ওটা ভালুক নয়। আর কিশোর ওটার পায়ের ছাপও দেখেছে।'

জুতো খুলতে খুলতে কিশোর বলল, 'যদি সত্যি দানব থাকে, আর কনর ওটাকে ধরতে পারে, তাহলে সাড়া পড়ে যাবে। এটাই চাইছে ও।' জিপার খুলে স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ল সে।

শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল রবিন আর মুসা। কিন্তু কিশোরের ঘুম এল না। অস্থির। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে শুনছে বাতাসের ফিসফিসানি, আর ছোট ছোট জীবের আনাগোনার মৃদু শব্দ। ফাটলটার কথা ভাবছে সে, ভাবছে ওটার কিনারে দেখা ছাপগুলোর কথা। তাহলে কি 'বাচাল' মরিসনের গল্প শুধু গল্প নয়? এর মাঝে সত্য কিছু রয়েছে? আরও মনে পড়ল, রেগে গিয়ে নাকি ভালুককে কড়াই ছুঁড়ে মেরেছিল মিলানি। কাল সকালে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, সত্যি সত্যি এমন একটা কাণ্ড করেছিল কিনা সে। নাকি মরিসন মিছে কথা বলেছে।

মাঝ রাতে কি মনে করে ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। তাঁবুর কানা তুলে তাকাল সরাইখানার দিকে। বাড়িটা অন্ধকার, নীরব। উড়ে এসে চিমনির ওপর বসল একটা কি যেন। মিনিট কয়েক একভাবে বসে রইল। তারপর 'হুউউ হুউউ' করে ডাকল পেঁচা।

চোখ মিটমিট করল কিশোর। চোখের ভুল, নাকি সত্যি দেখল? নিচতলায় আলো। নজর তীক্ষ্ণ করল। আবার দেখা গেল আলোটা। লিভিং রুমে নড়ছে।

'মুসা,' নিচুকণ্ঠে ডাকল কিশোর। 'এই মুসা?'

'কি-ক্কী হয়েছে···দানব···'

'কি ব্যাপার?' রবিনও জেগে গেছে।

'সরাইখানায় কে জানি ঘুরছে,' কিশোর বলল। 'হাতে টর্চ। ··· অফিসে ঢুকছে···'

ব্যাগ থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে যার যার জুতো খুঁজে নিয়ে পায়ে গলাল দুই সহকারী গোয়েন্দা। মুসা বলল, 'আমরা রেডি।'

তাঁবুর কানার নিচ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরোল তিন গোয়েন্দা। চত্বর ধরে পা টিপে টিপে এগোল অফিসের দিকে। জানালা খোলা। ওদের দিকে পেছন করে বসে আছে লোকটা। চিনতে পারল। কারসন। জানালার কাছে এসে উঁকি দিয়ে দেখল ওরা, একটা লেজারবুক ঘাঁটছেন তিনি। অফিস আর লিভিং রুমের মাঝের দরজাটা বন্ধ।

লেজারটা দেখা শেষ করে বুককেসে রেখে দিলেন কারসন। আরেকটার জন্যে হাত বাড়াতে গিয়েই স্থির হয়ে গেলেন। কান পাতল দরজার দিকে। পরক্ষণেই প্রায় ডাইভ দিয়ে গিয়ে লুকাল টেবিলের তলায়। নিভিয়ে দিল টর্চ।

জানালার নিচে বসে পড়ল তিন গোয়েন্দা। সুইচ টেপার শব্দ, আলো জ্বলে উঠল অফিসে। শোনা গেল কনরের কণ্ঠ, 'বললাম না, ভুল শুনেছ। কই, কেউ নেই এখানে।'

'আমি শুনেছি,' মিলানি বলল। 'সিঁড়িতে শব্দ, দরজা বন্ধ হতে শুনেছি। আর যদ্দূর মনে পড়ে, দরজাটা খোলাই রেখে গিয়েছিলাম...'

'বেশি কল্পনা করছ। মন আরেকটু শক্ত কর, স্নায়ুর জোর বাড়াও। ভয়ের কিছু নেই। রকি বীচের বলদ দুটোর সঙ্গে ভালই তো চালিয়ে যাচ্ছ। এত ভয় কেন? ওরা চিরকাল থাকছেও না এখানে।'

'কম করে হলেও এক হপ্তার বেশি থাকবে।'

'থাকুক। ব্যস্ত রেখেছি ওদের, অন্য কোনও দিকে নজর দিতে পারবে না। মন শক্ত কর, ভয় দূর কর, আমরা এখানে বসে গেছি, মানিয়েও নিয়েছি। এখনও কোনও ভুলচুক হয়নি। আর কি?'

'হয়নি, হতে কতক্ষণ?' মিলানির কণ্ঠের ধার কান এড়াল না কিশোরের। মনে হল, না মিছে কথা বলেনি মরিসন। কড়াই ছুঁড়ে ভয়ানক ভালুক তাড়ানো ওই মহিলাকে দিয়ে সম্ভব।

আলো নিভল, দরজা বন্ধ হল। ছেলেরা বসে রইল চুপ করে। কয়েক মিনিট পর আবার টর্চ জ্বলল। টেবিলের নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছেন কারসন, মাথা তুলে দেখল কিশোর। দরজার কাছে গিয়ে, আলো নিভিয়ে, নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে চলে গেলেন।

'ঘটনাটা কি?' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা। সে-ও মাথা তুলেছে।

তাকে চুপ থাকতে বলল কিশোর।

তাঁবুতে ফিরে এল তিনজনে।

'যা শুনলাম, সত্যি শুনলাম?' ঢুকেই বলল মুসা।

'আশ্চর্য!' বলল কিশোর। 'তবে কারসনের ব্যাপারটা নয়। মাঝরাতে চোরের মত এসে অফিসে ঢুকতে দেখে অবাক হইনি। আমরা জানি, মিসেস কনরের টাকার ব্যাপারে আগ্রহী তিনি।'

'ঠিক,' বলল রবিন। 'আমি ভাবছি, বোরিস আর রোভারকে ভয় কেন মিলানির? তার প্রিয় দুই ভাইকে?'

'সেটাই এখনও বুঝতে পারছি না,' কপাল ডলল কিশোর। 'নাহ্, কিছুই ঢুকছে না মাথায়। এতটা বোকা বনিনি আর কখনও!'

তের

ঘুম ভাঙল কিশোরের। বাইরে রোদ উঠেছে বটে, কিন্তু বাতাস এখনও কনকনে ঠাণ্ডা। পাখি গান গাইছে। ঘুমিয়ে রয়েছে মুসা আর রবিন, ওদের ডাকল না সে। ব্যাগ থেকে বেরিয়ে, জুতো পায়ে দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল তাঁবু থেকে : চত্বর পেরিয়ে চলে এল সরাইয়ের পেছনে। মাথায় পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে যেন রাতে শোনা কনর দম্পতির কথাগুলো।

বোরিস আর রোভারকে মিলানির ভয় কিসের?

পেছনের বারান্দার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াল কিশোর। সিংকে পানি গড়ানর শব্দ হচ্ছে, জানালা খোলা। মিলানি নিশ্চয় উঠে পড়েছে। কল্পনায় দেখল, দ্রুত নড়ছে তার সরু সরু আঙুলগুলো, নিখুঁতভাবে সারছে প্রতিটি কাজ—কিশোরের মেরি-চাচীর মত। এমনকি, বাসন-পেয়ালা ধোয়ার আগে মেরিচাচীর মতই আঙুল থেকে আঙটি খুলে রাখে মিলানি। নিয়মিত ব্যায়াম আর ডায়েট কন্ট্রোল মাঝে মাঝে বাড়িয়ে দেন মেরিচাচী, আঙটি তখন ঢলঢলে হয়ে যায় আঙুলে। জিনিসপত্র ধোয়ার সময় খুলে না রাখলে আপনিই খুলে পড়ে যায়। খুলে রাখেন সে-কারণেই।

সিঁড়িতে পা রাখতে যাবে কিশোর, এই সময় থেমে গেল পানি পড়ার আওয়াজ। 'কফি হয়নি?' কনরের কণ্ঠ।

'আর কয়েক মিনিট। সহ্য হচ্ছে না?'

'ভয় কমাও,' হুঁশিয়ার করল যেন কনর। 'শোন, বলদ দুটোকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে এসেছি। তোমাকে জ্বালাতে আসবে না। আর ছেলেগুলোকে ডেকে আন নাস্তার জন্যে। তারপর কয়েকটা লাঞ্চ প্যাকেট সাজিয়ে দিয়ে বলেকয়ে পাঠিয়ে দাও কোনও জায়গায় বেড়াতে। যেখানে খুশি যাক, তৃণভূমিতে ছাড়া। ওদিকে যেন কিছুতেই যেতে না চায়।'

'আমার ইচ্ছেতেই চলবে আরকি ওরা,' ঝাঁজাল কণ্ঠে বলল মিলানি।

'বুঝিয়ে বলতে পারলে ঠিকই শুনবে। সরাতেই হবে ওদেরকে, যেভাবেই হোক। ওপরে গিয়ে আরেকবার শেষ চেষ্টা করে দেখব আমি। মনে হয় হবে না। বাংকে গিয়ে ভাঁওতা দিয়েই কাজ সারতে হবে। হোমওয়ার্ক সেরে নেবে ভালমত।'

'আমি পারব না।'

'পারবে।' কর্কশ হয়ে গেল কনরের কণ্ঠ। 'অনেক কম টাকার জন্যে এরচে কঠিন কাজ করেছ, এটা পারবে না কেন? যাকগে ওসব কথা। স্যাণ্ডউইচ তৈরির কিছু আছে?'

'আছে।'

'গুড।'

অনেকখানি পিছিয়ে এল কিশোর। তারপর গলা ঝাড়া দিয়ে এগিয়ে এসে দুপদাপ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

'গুড মর্নিং,' কিশোরকে রান্নাঘরের দরজা খুলে ঢুকতে দেখে বলল মিলানি।

হাসিমুখে তার অভ্যর্থনা ফিরিয়ে দিল কিশোর। মিলানি নাস্তা করার অনুরোধ জানালে সবিনয়ে কয়েকবার না না করে রাজি হয়ে গেল। হাত-মুখ ধুতে উঠে এল ওপরতলায়। আবার নিচে নেমে এসে দেখল, রবিন আর মুসাও এসেছে, চোখ থেকে ঘুম যায়নি এখনও। নাস্তার জন্যে টেবিলে বসে গেছেন কারসন আর ডোনার।

নীরবে খাওয়া চলল। সবাই চিন্তিত। প্রত্যেকের মনেই যেন নিজস্ব কিছু ভাবনা রয়েছে।

নাস্তা শেষে কাপ-প্লেটগুলো ধোয়ার সময় হঠাৎ করেই যেন চমৎকার একটা আইডিয়া এল মিলানির মাথায়। হাসিমুখে ছেলেদের বলল, 'কাল তো গিয়েছিলে তৃণভূমির ওদিকে। আজও যাও, আরেকদিকে। বেড়াতে এসেছ যখন, দেখে নাও যতটা পার। কিছু স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে দিচ্ছি, দুপুরে খেতে পারবে। ফায়ার-টাওয়ারটা তো দেখনি, না? ওটাই দেখতে যাও আজ।'

'ফায়ার-টাওয়ার!' কিছুটা অবাক মনে হল রবিনকে। 'ও, ওয়াচ-টাওয়ারটার কথা বলছেন? তিন-চার মাইল হবে এখান থেকে।'

মাথা ঝোঁকাল মিলানি। 'তা হবে। ওপরে উঠলে চারদিকে সমস্ত উপত্যকাটা চোখে পড়ে। খুব সুন্দর। মাঝে মাঝে যখন কাজ থাকে না, কিংবা মন খারাপ লাগে, চলে যাই ওখানে। একা একা কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসি।'

'ভালই বলেছেন!' তাড়াতাড়ি বলে উঠল কিশোর, দুই সহকারী মানা করার আগেই। 'যাব।'

তার পরেও কি যেন বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল মুসা, টেবিলের তলা দিয়ে তার পায়ে লাথি মারল কিশোর।

কাপ-প্লেটগুলো নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল গিয়ে মিলানি। স্যাণ্ডউইচ বানাতে শুরু করল। প্যাকেট করে নিয়ে এসে রাখল ছেলেদের সামনে, টেবিলে। 'ব্যাগে ভরে নিয়ে যাও।'

তাকে ধন্যবাদ দিল কিশোর।

'খুব সাবধান,' হুঁশিয়ার করল কনর। 'ভালুক ওদিকেও থাকতে পারে। দেরি করবে না বেশি। বিকেলের মধ্যেই ফিরে আসবে।'

বোরিস আর রোভারকে নিয়ে সুইমিং পুলে কাজ করতে চলে গেল সে।

তাঁবু থেকে ন্যাপস্যাকটা বের করে এনে তাতে প্যাকেটগুলো ভরল কিশোর। ব্যাগটা পিঠে বেঁধে দুই বন্ধুকে নিয়ে রওনা হল টাওয়ারের দিকে।

পথের প্রথম মোড়টা ঘুরেই থেমে গেল মুসা। 'লাথি মারলে কেন? কিছু ঘটেছে?'

'সকালে স্বামী-স্ত্রীর কথা চুরি করে শুনে ফেলেছি,' বলল কিশোর। 'আমাদেরকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে কনর, যাতে নিরাপদে গিয়ে তৃণভূমিতে উঠতে পারে। আর মিলানি তার হোমওয়ার্ক করতে পারে।'

'হোমওয়ার্ক?' প্রতিধ্বনি করল যেন রবিন।

'জানি না। বাংকের ব্যাপারে কোনও কিছু হবে। আর কনর বলেছে, সে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে যাবে। কাজ হলে ভাল, নইলে বাংকে গিয়ে ভাঁওতা দিয়ে কাজ সারার চেষ্টা করবে দু'জনে। আমার মনে হয়, সেফ ডিপোজিট আর হারানো চাবিঘটিত কোনও কিছু।'

'আমরা একজন থেকে গেলেই পারি?' প্রস্তাব দিল মুসা। 'লুকিয়ে থেকে দেখব, কি করে?'

'বুঝতে পারছি না কিভাবে সেটা সম্ভব। কোনও বাধা আসুক, চায় না দু'জনে। আমরা তৃণভূমিতে যাই আজ, এটাও চায় না। বোরিস আর রোভার ভাবছে মিলানি বিপদে পড়েছে, আর সেজন্যে কনর দায়ী। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। যা করার দু'জনে মিলেই করছে। দু'জনেই কিছু লুকাচ্ছে। আমাদেরকে টাওয়ারে পাঠিয়ে বোধহয়...এখনও শিওর না আমি। জলদি কর, পা চালাও।'

'তাড়াহুড়োটা কেন?' জানতে চাইল রবিন।

'মিক কনরের তৃণভূমিতে ওঠা দেখতে চাই। সাথে বিনকিউলার নিয়েছি। রোজ ট্র্যাংকুইলাইজার গান আর ন্যাপস্যাক নিয়ে ওখানে যায় কনর। কি করতে যায়?'

'দৈত্য শিকারে,' বলল মুসা।

'না, আরও কোনও ব্যাপার আছে। বাংক আর হারানো চাবির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে। আমি দেখতে চাই, ওখানে উঠে কনর কি করে।'

'বেশ, চল,' বলল রবিন।

ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ড পেরিয়ে দ্রুত এগোল ওরা। আগে আগে চলেছে মুসা, মাঝে রবিন, পেছনে কিশোর—চারদিকে চোখ রাখতে রাখতে চলেছে। বলা যায় না, ভালুক বেরিয়ে আসতে পারে। ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ডে খানিক পর থেকে প্রায় খাড়া উঠে গেছে পথ। সোজা হাঁটতে পারছে না ওরা, সামনে ঝুঁকে শরীর বাঁকা করে উঠছে

ধীরে ধীরে।

টাওয়ারে পৌঁছতে পৌঁছতে দশটার বেশি বেজে গেল।

'দেরি হয়ে গেল কিনা কে জানে,' হাঁপাচ্ছে কিশোর। দম নেয়ার জন্যে থামল না। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল টাওয়ারে। রবিন আর মুসা অনুসরণ করল তাকে।

'খাইছে!' ওপরে উঠে বলল মুসা। 'সবই তো দেখা যাচ্ছে! সরাইখানা··· স্লোপ···তৃণভূমি···'

ব্যাগ থেকে বিনকিউলার বের করল কিশোর। চোখে লাগিয়ে দেখল কিছুক্ষণ। বলল, 'স্কি স্লোপ বেয়ে উঠছে কনর···অর্ধেক উঠেছে···'

তৃণভূমিতে উঠতে দশ মিনিট লাগল কনরের। সোজা এগোল অন্য প্রান্তের গাছপালার দিকে। আরও কয়েক মিনিট পর হারিয়ে গেল বনের ভেতরে।

বিনকিউলার নামাল কিশোর। 'মুসা, কাল তুমি যেদিকে গিয়েছিলে, সেদিকে গেল। বেশি ভেতরে গিয়েছিলে?'

'না, মাত্র কয়েক গজ। বনের ভেতর থেকে তৃণভূমিটা দেখতে পাচ্ছিলাম।'

'কনর বোধহয় বেশ ভেতরে ঢুকল। কেন যায় রোজ রোজ?' নিজেকেই করল প্রশ্নটা।

'বাংকের সাথে সম্পর্ক আছে বললে,' রবিন জানতে চাইল, 'কি সম্পর্ক? আর বনের ভেতরে আছেটাই বা কি?'

'গাছ,' জবাব দিল মুসা। 'অনেক গাছ। আর পাথর, কাঠবেরালী, পাখি, ভালুক···'

'ঝুপড়ি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'ঝুপড়ি?' মুসার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, সন্ন্যাসীর ঝুপড়ি। নিশ্চয় ওখানে যায় কনর।'

'ওটার সঙ্গে বাংকের কি সম্পর্ক?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'জানি না,' আনমনে মাথা নাড়ল কিশোর।

অনেক পথ হেঁটে এসেছে ওরা। খিদে পেয়েছে। টাওয়ারের ওপর বসেই স্যাণ্ডউইচ খুলে খেতে শুরু করল। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে দেখছে কিশোর। প্রায় এক ঘন্টা পর কনরকে বেরোতে দেখল বনের ভেতর থেকে।

'স্লোপ দিয়ে নামছে,' জানাল গোয়েন্দাপ্রধান। 'এবার আমাদের যাওয়ার পালা। সরাইয়ে গিয়ে বলব, বিকেলটা আমরা ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ডে কাটাব। রান্না করে ওখানেই ডিনার সারব। মিলানি বা কনর কিছু সন্দেহ করবে না। ওই সুযোগে

তৃণভূমিতে উঠে যাব আমরা, স্কি স্লোপের উত্তরে বনের ভেতর দিয়ে, ফলে কারও চোখেও পড়ব না। দেখতেই হবে, রোজ ঝুপড়িতে গিয়ে কি করে কনর!'

ওঠার চেয়ে নামা সহজ। সুতরাং যেতে যা সময় লেগেছিল, ফিরে আসতে লাগল তার চেয়ে কম।

ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ডে এসে দেখল, একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বেঁটে, টাকমাথা একজন লোক বসে আছে ঝর্নাটার কাছে। পাশে বসে ঝুড়ি থেকে প্লেট আর খাবার বের করছে একজন মোটা মহিলা।

'একেবারেই পানি নেই,' ছেলেদের দেখে বলল লোকটা। 'মাছ ধরতে এসেছিলাম এখানে।'

'এখন তো শুকনোর সময়,' রবিন জবাব দিল। 'পানিই নেই। মাছ আসবে কোত্থেকে?'

'রবার্ট,' মহিলা বলল স্বামীকে। 'এখানে থাকার দরকার নেই। চল, বিশপে চলে যাই।'

'ওই মোটেল-ফোটেলে থেকে টাকা খরচ করতে রাজি না আমি,' কড়া জবাব দিল রবার্ট। 'আমি এখানেই থাকব। খোলামেলা হাওয়া আছে, কোলাহল নেই, রাতে ঘুমটা অন্তত ঠিকমত হবে।' টাওয়ারটা দেখিয়ে ছেলেদের জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ,' রবিনই বলল। 'তবে পথ খুব খারাপ। খাড়া।'

শুনে খুশি মনে হল লোকটাকে। 'এই তো চাই। বসে থেকে থেকে আলসে হয়ে গেছি। শরীরটাকে খাটিয়ে নেয়ার সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, ছাড়ে কে।'

ওখান থেকে প্রায় দৌড়ে চলল ছেলেরা। পনের মিনিটে এসে পৌঁছল সরাইখানায়। লিভিং রুমে ঢুকে দেখল ফায়ারপ্লেসের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কনর। হাতে একটা কাগজ। 'ভালোই হয়েছে,' স্ত্রীকে বলল সে।

মাথা ঝোঁকাল শুধু মিলানি।

ছেলেদের দেখে কাগজটা দলা পাকিয়ে ফেলল কনর। দেশলাই বের করে আগুন ধরিয়ে কাগজটা ফেলে দিল ফায়ারপ্লেসে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দোতলায়।

'কেমন বেড়ালে?' জিজ্ঞেস করল মিলানি।

'চমৎকার!' জবাব দিল কিশোর।

'বলেছি না, ভাল লাগবে।' আর কিছু না বলে চেয়ার থেকে উঠে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল মিলানি।

তাড়াতাড়ি গিয়ে জ্বলন্ত কাগজটা বের করে আনল মুসা। জুতো দিয়ে চেপে

আগুন নেভাল। বেশির ভাগই পুড়ে ছাই, কয়েক ইঞ্চি বাদে। তবে যেটুকু রয়েছে, তা-ই যথেষ্ট। এক পলক দেখেই ওটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল সে। রবিন আর কিশোরকে ইশারা করে দরজার দিকে রওনা হল। সামনের বারান্দায় বেরিয়ে বলল, 'সই।' পোড়া টুকরোটা বের করে কিশোরের হাতে দিল। 'দেখ, বার বার নিজের নাম লিখেছে, মিসেস কনর।'

স্থির চোখে কাগজটা দেখল কিশোর। নীরব, চিন্তিত। হঠাৎ যেন প্রচণ্ড এক চড় খেয়ে সংবিৎ ফিরে পেল। 'জার্মান বলতে পারে না···বিয়ের আঙটি ঢলঢল করে···'

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল রবিন।

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। নামতে নামতে বলল, 'বোরিস আর রোভারের সঙ্গে কথা বলব!' ভীষণ উত্তেজিত মনে হচ্ছে তাকে। 'তারপর যত তাড়াতাড়ি পারি গিয়ে উঠব তৃণভূমিতে। বুঝে গেছি, সব বুঝে গেছি আমি!'

চোদ্দ

'কিন্তু কেন, কিশোর?' জিজ্ঞেস করল বোরিস। 'কেন সরাইয়ের কাছাকাছি থাকতে হবে?' মই বেয়ে পুলের গর্ত থেকে উঠে এসেছে সে, রোভার রয়ে গেছে নিচে।

'এখন সব বলার সময় নেই,' কিশোর বলল। 'যা বললাম। করুন। নইলে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।'

'হো-কে,' হাত নাড়ল বোরিস। 'যাও। আমি আছি।'

বারান্দায় ফিরে এল কিশোর। মিলানিকে বুঝিয়েছে রবিন আর মুসা, বাকি দিনটা কোথায় কিভাবে কাটাবে। রান্না করার জন্যে কাঁচা খাবার নিয়েছে একটা ঝোলায়। নামতে যাবে, এই সময় গাড়ি নিয়ে কোথা থেকে এসে হাজির হলেন কারসন। ডোনার বেরিয়ে এলেন গাছের জটলার ভেতর থেকে।

'বাহ্, সময় মতই হাজির,' নিচুকণ্ঠে বলল কিশোর। 'ওঁরা যে এই নাটকে কোন পার্ট করছেন বুঝতে পারছি না।'

'কিসের নাটক?' জানতে চাইল মুসা।

মুখ খুলতে যাচ্ছিল কিশোর, পেছন থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল কনর। 'কোথায় যাচ্ছ?' তার চোখে সন্দেহ।

'কেন, আপনার স্ত্রী বলেননি?' চেহারায় বোকা বোকা ভাব ফুটিয়ে তুলল কিশোর। 'ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ডে···'

'না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কনর। 'এখানেই থাকবে...' থেমে গেল। চেহারায় হলদে আভা।

চোখ মিটমিট করল কিশোর। বুঝল, কনরের মুখ থেকে রক্ত সরে যাওয়ায় হলদে হয়নি, আলোর রঙ বদলে গেছে। ফিরে তাকাল। ঘন ধোঁয়া ঢেকে দিচ্ছে সূর্যকে।

সরাইয়ের উত্তরে,ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ড ছাড়িয়ে, পাহাড়ের ঢালে লেগেছে দাবানল। ঘন কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ। উড়ে এসে এক কণা ছাই পড়ল কনরের চুলে।

'এদিকেই তো আসছে...' ফিসফিসিয়ে বলল কনর. খামচে ধরল বারান্দার রেলিঙ।

রাস্তায় এঞ্জিনের গর্জন শোনা গেল। ছুটে নামছে ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ডে পার্ক করে রাখা গাড়িটা। লাফ দিয়ে গিয়ে পথে নামল মুসা, পাগলের মত হাত নেড়ে থামানর ইঙ্গিত করল।

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল টাকমাথা লোকটা।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আর বল না!' চেঁচিয়ে জবাব দিল লোকটা। 'ভাবতেই পারিনি এত শুকিয়ে আছে গাছ...যেন পেট্রল...সিগারেটের গোড়া ছুঁয়ে ফেলেছিলাম। জ্বলে উঠল...ভাবতেই পারিনি...'

'রবার্ট, জলদি কর,' চেঁচিয়ে বলল তার স্ত্রী। 'চলে আসছে তো!'

সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্সিলারেটরে পায়ের চাপ দিল টাকমাথা, শাঁ করে ছুটে চলে গেল গাড়ি নিয়ে। এত বড় একটা সর্বনাশ যে করে এসেছে, সে-জন্যে সামান্যতম অনুতপ্ত বলে মনে হল না তাকে। গালিটা এসে গিয়েছিল মুসার মুখে, অনেক কষ্টে থামাল।

'বোরিস! রোভার!' চেঁচামেচি, ছুটোছুটি শুরু করল কনর। এক কোণে ফেলে রাখা কুণ্ডলী পাকানো একটা হোস-পাইপ তুলে নিয়ে আবার চেঁচিয়ে বলল, 'বোরিস, জলদি মইটা নিয়ে এস! ছাত ভেজাতে হবে।'

পাহাড় থেকে নেমে এল একটা ভীত হরিণ। অন্ধের মত ছুটল রাস্তা ধরে, স্কি স্লোপের দিকে। মানুষজনের দিকে খেয়ালই নেই।

'সর্বনাশ!' এত ঘাবড়ে গেছেন ডোনার, কণ্ঠস্বরই বদলে গেল; কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল গলা দিয়ে। 'হারামীরবাচ্চা, কোত্থেকে মরতে এসেছিল!' টাকমাথাকে গাল দিলেন তিনি। 'শয়তান! খুনী!' হরিণটার পেছনে দৌড় দিতে যাচ্ছিলেন, খপ করে তাঁর হাত চেপে ধরলেন কারসন। 'আরে, যাচ্ছেন কোথায়?'

একটা কাঠবেরালী নেমে পথের ধার দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটল স্কি স্লোপের দিকে। 'ছাড়ুন, ছাড়ুন!' চেঁচিয়ে উঠলেন ডোনার। 'দেখছেন না, মরবে তো ওগুলো! বাঁচাতে হবে না! আগুনের বাইরে নিয়ে যেতে হবে!'

'আগুন এদিকেই আসছে! বাঁচাবেন কি করে? আপনিও মরবেন।'

ঝাড়া দিয়ে হাত ছুটিয়ে কাঠবেরালীটার পিছু পিছু দৌড় দিলেন ডোনার।

ঘর থেকে ছুটে বেরোল মিলানি। 'মিক! মিইক, চল, সরে যাই।'

'নাআ?' কলের মুখে নল লাগিয়ে পানি ছিটানর ব্যবস্থা করে ফেলেছে কনর। 'বাড়িটা বাঁচাতে হবে।'

রোভার এসে মিলানির হাত ধরল। 'মিলিকে নিরাপদ জায়গায় রেখে আসা দরকার। এস, মিলি।' তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরে বলল, 'তোমরাও গিয়ে ট্রাকে ওঠ। জলদি।'

'এক মিনিট,' হাত তুলল কিশোর।

'কথা পরে,' মিলানির হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল রোভার। 'জলদি ট্রাকে ওঠ! আহ্, তাড়াতাড়ি কর!'

'কিন্তু আপনার বোন মিলানিকে খুঁজে বের করতে হবে তো!' প্রায় মরিয়া হয়ে বলল কিশোর।

'কি!' চমকে মহিলার হাত ছেড়ে দিল রোভার।

'মিসেস কনরও স্থির হয়ে গেছে। চেহারাও বোধহয় কিছুটা ফ্যাকাসে, তবে নিশ্চিত হতে পারল না কিশোর। আলোর রঙের কারণেও ওরকম দেখাতে পারে।

'মিলানি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রোভার।

হাত থেকে হোস পাইপ ছেড়ে দিল কনর। 'পাগল!'

ওর দিকে তাকালও না কিশোর। মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস কনর, মিলানি রোজেনডাল কোথায়? জলদি বলুন। কুইক!'

'আমি মিলানি রোজেনডাল,' জোর নেই মহিলার গলায়। 'এখন মিলানি কনর। যাই, এখানে থেকে আগুনে পুড়ে মরতে পারব না।'

'না!' লাফ দিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল কিশোর।

স্নায়ুর জোর আর রাখতে পারল না মহিলা। হঠাৎ দৌড় দিল তার গাড়ির দিকে।

'এই!' পেছনে ছুটলেন কারসন। 'শুনুন। একটা কথা শুনুন।' মহিলার কাঁধ ধরার জন্যে হাত বাড়ালেন।

তাঁর হাত এড়ানর জন্যে মাথা নিচু করে ফেলল মিসেস কনর। পুরোপুরি পারল না। মহিলার চুলে হাত পড়ল কারসনের। কাঁধ আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে

গিয়ে ধরলেন চুল। হ্যাঁচকা টান লেগে খুলে এল পরচুলা, বেরিয়ে পড়ল খাটো করে ছাঁটা কালো চুল।

'তুমি মিলি নও!' চেঁচিয়ে উঠল বোরিস।

রোভার দিল দৌড়। মহিলা গাড়ির দরজা ছুঁয়েছে, এই সময় পৌঁছে গেল তার কাছে। আটকে ফেলল। 'আমার বোন কোথায়?' মুখ দেখে মনে হল, ধরে মারবে এখুনি। কিন্তু সে ভদ্রলোক। সামলাল নিজেকে। আবার জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়, আমার বোন মিলানি কোথায়?'

গাড়ির গায়ে পিঠ রেখে এলিয়ে পড়ল মিসেস কনর।

'তৃণভূমির ওপরে ঝুপড়িতে না?' কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল মহিলা।

তাকে ছেড়ে দিল রোভার। ছুটল পাহাড়ের দিকে। পেছনে দৌড় দিল বোরিস আর তিন গোয়েন্দা।

পনের

ঘন ধোঁয়া, কিশোরের মনে হচ্ছে তার ফুসফুসই ফেটে যাবে। তৃণভূমিতে উঠে এসেছে ওরা। ওঠার পরিশ্রম, নিঃশ্বাসের কষ্ট, প্রচণ্ড উত্তেজনা আর সইতে পারল না সে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল লম্বা ঘাসের ওপর। বাতাস সাংঘাতিক গরম। দুই হাতে মুখ ঢেকে জোরে জোরে কয়েকবার দম নিয়ে মাথা তুলল সে। দেখল, তার মাত্র কয়েক গজ দূরে গাছের ডালে উঠে বসে আছে একটা কুগার। নাক উঁচু করে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করছে ঝাঁজাল বাতাসে। পারছে না। শেষে লাফিয়ে নেমে ছুটে গেল পশ্চিমে, বনের অন্য পাশে পাথুরে চূড়ার দিকে।

হাত ধরে কিশোরকে টেনে তুলল রোভার। 'ওঠো, জলদি কর! মিলি কোথায়, দেখাও!'

মুসা ছুটছে ঘাসের ওপর দিয়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে বনের দিকে। তার পেছনে রবিন, মুসার সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। আর তাদের সঙ্গে, আশপাশে, আগেপিছে চলেছে জন্তুজানোয়ারের দল। আগুনের ভয়ে ছুটে চলেছে জানোয়ারগুলো, নিরাপদ জায়গার খোঁজে। সে-এক বিচিত্র দৃশ্য!

দাঁড়িয়ে গেছে বোরিস। 'আরে তাড়াতাড়ি কর না!' ভাইয়ের দিকে চেয়ে বলে, ঘুরে আবার দৌড়াতে শুরু করল রবিন আর মুসার পিছনে।

উঠে হাত-পা ঝাড়ল কিশোর। হাত ধরে তাকে নিয়ে চলল রোভার।

কিশোরের মনে হচ্ছে পা-দুটো সীসার মত ভারি হয়ে গেছে তার। যেন গভীর

পানিতে ডুবে আছে। অক্সিজেনের স্বল্পতার জন্যে এরকম লাগছে। বনের মধ্যে ঢুকলে এই অবস্থা অনেকখানি দূর হয়ে যাবে।

মুসা আর রবিন বনের কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার অপেক্ষায়।

টলে উঠে আবার পাড়ে যাচ্ছিল কিশোর, ধরে রাখল রোভার। জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়? আর কত দূর?'

ঘাসের বুকে মাথা তুলে রাখা সাদা একটা পাথরের চাঁই দেখাল কিশোর। 'কনরকে ওদিক দিয়ে যেতে দেখেছি।'

মৃদু চিৎকার শোনা গেল। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছে কেউ। তারপর ভেসে এল দরজায় কিল মারার শব্দ।

'মিলি!' চেঁচিয়ে ডাকল রোভার।

মুসার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে ঢুকে ছুটে গেল একটা স্কাংক।

আবার শোনা গেল চিৎকার, আরও জোরে।

'আসছি আমরা, মিলি!' জবাব দিল বোরিস।

বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা। কিশোরের অনুমান ঠিক। এখানে বাতাস অনেকটা ভাল, তৃণভূমির তুলনায়। কিন্তু শ্বাস-কষ্ট পুরোপুরি ঘুচল না। খসখসে হয়ে গেছে গলা, কেশে উঠল মুসা। রবিনের মনে হচ্ছে, তার গলা টিপে ধরেছে কেউ।

'মিলি!' বোরিস ডাকল। 'কোথায় তুমি, মিলি!'

'এই যে এখানেএএএ!...জলদি বের করুওওওন!'

মুসা আর রবিনের পাশ দিয়ে তীরবেগে ছুটে গেল দুই ভাই। ঝোপঝাড় লতাপাতার পরোয়া করছে না। বিশালদেহী দুই ভালুকের মত দু'পাশে থাবা মেরে সরিয়ে দিচ্ছে ডালপালা। ওদের পেছনে টলতে টলতে এগোল তিন গোয়েন্দা। কিশোর আরেকবার পড়ল। রবিন একবার। দু'জনকেই টেনে তুলল মুসা। বনের অন্য পাশে পাহাড়ের গায়ে একটা খাঁজের মধ্যে দেখা গেল ঝুপড়িটা। ছয় বাই ছয় ফুট। তক্তার ওপর তারপুলিন দিয়ে ঢেকে তৈরি হয়েছে শক্ত বেড়া। ওপরে, ছাতের কাছাকাছি ছোট একটা জানালা। নাম নির্বাচন ঠিক হয়নি, 'ঝুপড়ি' না বলে 'ছোট কেবিন' বলতে পারত মরিসন। কিংবা কুঁড়ে।

জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে তারপুলিন। মোটা তক্তা দিয়ে তৈরি দরজা—ভালুক আর হিংস্র জানোয়ার যাতে ভেঙে ঢুকতে না পারে, সে-জন্যে বেশ শক্ত করে বানানো হয়েছে। পাল্লা পুরনো, কিন্তু নতুন কড়ায় ঝুলছে নতুন একটা ভারি তালা।

কাঁধ দিয়ে জোরে ধাক্কা মারল বোরিস।

এক ইঞ্চি নড়ল না পাল্লা।

'তালা ভাঙতে হবে,' বলতে বলতেই বড় দেখে একটা পাথর তুলে নিল রোভার।

'আগুন,' ভেতর থেকে শোনা গেল ভয়ার্ত মহিলা-কণ্ঠ, 'আগুনের গন্ধ পাচ্ছি! কোথায় লেগেছে?'

'নিচে, ক্যাম্পিং-গ্রাউণ্ডের ধারে,' পাথরটা তালুতে ওজন করে দেখছে রোভার, আন্দাজে বোঝার চেষ্টা করছে, এটা দিয়ে বাড়ি মারলে তালা ভাঙবে কিনা। 'ভয় নেই, একটু দাঁড়াও, এখুনি বের করে আনব তোমাকে।'

এক মুহূর্ত নীরব রইল মহিলা। জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমরা?'

হাসি ফুটল রোভারের মুখে। জার্মান ভাষায় দ্রুত কিছু বলল। মুসার মনে হল, জার্মান মেশিনগান থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ল ব্যাভারিয়ান।

পাথর দিয়ে তালায় বাড়ি মারতে শুরু করল রোভার।

বাতাস জোরাল। এদিকেও উড়ে আসছে ধোঁয়া, ঘিরে ফেলতে আরম্ভ করেছে ওদেরকে।

'জলদি কর!' ভাইকে বলল বোরিস। 'আরও জোরে...'

আবার বাড়ি মারার জন্যে পাথর তুলেই স্থির হয়ে গেল রোভার। পেছনে বিকট চিৎকার।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল সবাই। ওদের ওপরে, খাঁজের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বিশালদেহী এক জীব। মানুষের মত দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে, দু'হাতে থাবা মেরে তাড়ানর চেষ্টা করছে শ্বাসরুদ্ধকর দম-বন্ধ-করা ঘন ধোঁয়া। রবিনের দেখা সেই রোমশ জীবটা। ওপর দিকে মুখ করে আবার চিৎকার করল ওটা, আতঙ্কে দিশেহারা, বড় বড় শাদা চোখা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল।

'দৈত্য!' ঢোক গিলল রবিন।

'কি? কিসের শব্দ?' কেবিনের ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল মিলানি।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল রেখে সবাইকে হুঁশিয়ার করল কিশোর।

'চুপ, মিলি!' দরজায় মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলল বোরিস।

কিন্তু প্রতিটি শব্দ কানে গেল জীবটার। বিরাট মাথাটা নামিয়ে তাকাল পাঁচজন মানুষের দিকে, কেবিনটার দিকে। বোধহয় তার ধারণা হল, এই যে এত সব বিপদের জন্যে ওরাই দায়ী, বিশেষ করে পাথর-হাতে ওই মানুষটা। যত আক্রোশ গিয়ে পড়ল রোভারের ওপর।

দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে, হাতে পাথর নিয়ে পাথরের মতই স্থির হয়ে আছে রোভার।

গর্জন করে উঠল জীবটা। আতঙ্কিত চিৎকার নয়, আক্রমণের পূর্ব-সঙ্কেত। কাঁধ সামনে বাঁকিয়ে, দুই হাত গরিলার মত করে সামনে বাড়িয়ে আঘাত হানতে ছুটে এল ভীমগতিতে।

'খাইছে!' এক লাফে পাশে সরে গেল মুসা।

আর কারও দিকে নজর নেই জীবটার। সোজা ছুটে আসছে রোভারের দিকে।

শেষ মুহূর্তে ডাইভ দিয়ে পাশে মাটিতে পড়ল রোভার। জীবটা এসে পড়ল দরজার ওপর। ভয়াবহ ওই আঘাত সইতে পারল না পাল্লার তক্তা। মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। জীবটা ঢুকে গেল ভেতরে। ধাক্কায় শুধু পাল্লাই ভাঙল না, চৌকাঠ আর সেই সঙ্গে বেড়াও ভাঙল।

চেঁচিয়ে উঠল মিলানি। এমন চিৎকার জীবনে শোনেনি কিশোর। তীক্ষ্ণ তীব্র! ভীষণ আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে মহিলা, যেন মেরে ফেলা হচ্ছে তাকে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে জীবটার আরও ভয়ঙ্কর চিৎকার-হুঙ্কার-গর্জন।

'মিলি!' হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল রোভার।

'কেবিনের দিকে দুই কদম এগোল বোরিস। সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলল, 'মিলি...কিছু হবে না...মিলি, আমরা আছি...!' বলল বটে, কিন্তু নিজের কানেই বেখাপ্পা লাগল কথাগুলো।

'চুপ! একেবারে চুপ!' হুঁশিয়ার করল কে যেন।

ফিরে চেয়ে দেখল ওরা, বন থেকে বেরিয়ে ঢাল বেয়ে ছুটে নামছে মিস্টার ডোনার। কঠিন হয়ে উঠেছে চোয়াল, দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছেন। কাছে এসে হাত নাড়লেন, 'সরো, সবাই সরে যাও। দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক চুপচাপ! কেউ কিছু করবে না!'

কেবিনে ঢুকলেন তিনি।

ষোল

বন্ধ হয়ে গেল সব চেঁচামেচি।

'এই তো, লক্ষ্মী ছেলে!' শোনা গেল ডোনারের শান্ত, মিষ্টি কণ্ঠ। 'ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। কোনও ভয় নেই।'

মৃদু গর্জন শোনা গেল।

'জানি, জানি,' বললেন ডোনার। 'এস আমার সঙ্গে। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

গর্জন বদলে গেল, নরম ফোঁপানি আর গোঙানির মিলিত আওয়াজ বেরোচ্ছে

এখন।

'এস, বেরিয়ে এস,' ডাকলেন ডোনার। 'মেয়েদের ভয় দেখাও, লজ্জা নেই তোমার?' যেন দুষ্ট ছেলেকে তিরস্কার করছেন।

ভাঙা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন ডোনার। পেছনে বেরোল অদ্ভুত জীবটা—আধা-মানুষ, আধা-জন্তু। ডোনারকে অনুসরণ করছে প্রভুভক্ত কুকুরের মত।

'ওপরে উঠে যাব আমরা, বুঝেছ?' দৈত্যটাকে বললেন ডোনার। 'বন ছাড়িয়ে অনেক ওপরে। ওখানে আমরা নিরাপদ, কোন ভয় নেই। এস, যাই।...আবার ওদিকে ফিরছ কেন? এস!'

বনের দিকে এগোলেন তিনি, পেছনে জীবটা। হারিয়ে গেলেন ধোঁয়ার আড়ালে।

ছুটে গেল বোরিস আর রোভার। ভাঙা কেবিন থেকে বের করে আনল মিলানিকে। ছেঁড়া, মলিন পোশাক, শরীরে ময়লা। প্রায় জট পাকিয়ে গেছে চুল। দেখতে হুবহু মিসেস কনরের মত, শুধু চুলগুলো বাদে।

'বোরিসভাই?' ক্লান্তকণ্ঠে বলল মিলানি। 'রোভার ভাই? সত্যি তোমরা? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!'

'আমরাই, মিলি, আমরাই,' বোনের পাশে বসল রোভার। 'চল, তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের। দাঁড়াতে পারবে?'

মাথা ঝোঁকাল মিলানি। চোখে অশ্রু দেখা দিল, গড়িয়ে পড়তে শুরু করল গাল বেয়ে।

'ছিহ্, কাঁদে না, লক্ষ্মী বোন আমার!' মিলানির কোমর জড়িয়ে ধরে তাকে উঠতে সাহায্য করল বোরিস। 'আর কোনও ভয় নেই। আমরা তো এসে পড়েছি।'

'ওই...ওই দৈত্যটা...'

'ভয় নেই, মিস রোজেনডাল,' কিশোর বলল। 'ওটা চলে গেছে।'

ঠিকমতো সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল না মিলানি, কুঁজো হয়ে আছে। আশি বছরের বুড়ি হয়ে গেছে যেন। দু'দিক থেকে তাকে ধরে নিয়ে এগোল দুই ভাই।

ধোঁয়া আর বন যে কি করে পেরোল ওরা, বলতে পারবে না। তৃণভূমিতে এসে মনে হল, দীর্ঘ এক দুঃস্বপ্ন পাড়ি দিয়ে এসেছে। এখানে ধোঁয়া এখন প্রায় নেই বললেই চলে। কারণটাও বোঝা গেল।

খুব নিচু দিয়ে, প্রায় গাছপালার মাথা ছুঁয়ে চক্কর দিচ্ছে একটা বিমান: কারগো-প্লেনের মত মোটা পেট। উত্তরের যেখানটায় আগুন আর ধোঁয়া বেশি, তার ওপর একনাগাড়ে ছিটিয়ে চলেছে তরল রাসায়নিক পদার্থ।

'বোরেট বোমবার,' রবিন বলল। 'এদিক দিয়ে যেতে পারব না আমরা, ঘুরে

যেতে হবে।'

মোড় নিল মুসা। আগে আগে চলেছে। তৃণভূমি পেরিয়ে স্কি স্লোপের কিনারে পৌঁছে থামল। একবার নিচে তাকিয়েই বলে উঠল, 'খাইছে!'

'কী?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বুলডোজার,' হাত বাড়িয়ে নিচে দেখাল মুসা।

তার পাশে এসে কিশোরও দেখল। সরাইখানার চারপাশে খাল কাটছে, ফায়ার-ব্রেক—অনেকটা পরিখার মত। ওই পরিখা পার হয়ে গিয়ে ঘরে আগুন পৌঁছতে পারবে না।

পরিষ্কার অক্সিজেনে শ্বাস নিয়ে অনেকখানি সুস্থ হয়েছে মিলানি, সোজা হয়েছে। কিন্তু একলা হাঁটার শক্তি নেই শরীরে, এখনও দু'পাশ থেকে ধরে রেখেছে তাকে বোরিস আর রোভার। স্কি স্লোপের কিনারে এসে ওরাও সরাইখানার দিকে তাকাল। স্কাই ভিলেজের কেউ আর বাকি নেই, সবাই এসে জড় হয়েছে ওখানে, তবে আগুনের কাছ থেকে, বুলডোজার আর সরাইখানার কাছ থেকে দূরে।

এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঢেউ তুলল তৃণভূমির ঘাসে। বুক ভরে টেনে নিল ওরা খাঁটি অক্সিজেন! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আহ্, কি আরাম! আগুনের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে গেছে বোরেট বমবার। বদলে গেছে বাতাসের গতি, প্রকৃতি।

'আমার সরাই পুড়বে না,' বিড়বিড় করল মিলানি।

ঢাল বেয়ে নামার সময় প্রায় হাঁটতেই পারল না সে, অবশ্য হাঁটতে তাকে হলও না। বয়ে আনল তার দুই ভাই।

সরাইখানার ধারে কাজে ব্যস্ত ধাতব হেলমেট পরা কয়েকজন দমকল-বাহিনীর লোক। তাদের মধ্যে রয়েছে বাচাল মরিসন। ডাকা হয়নি তাকে, ইচ্ছে করেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। হোসপাইপ দিয়ে পানি ছিটাচ্ছে ঘরের দেয়ালে।

ফিরে চাইল মরিসন। মিলানিকে দেখে হাসল।

হাসিটা ফিরিয়ে দিল মিলানি। 'তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু।'

মুহূর্তের বেখেয়ালে পাইপের ওপর ঢিল হল মরিসনের আঙুল, হড়কে অনেকখানি নেমে গেল পাইপ, পানির তীব্র তোড়ে ঘুরে গিয়ে মুখটা ফিরল তার দিকে, চোখের পলকে ভিজিয়ে দিল শরীরের ওপরের অর্ধেকটা। তাড়াতাড়ি আবার পাইপের মুখ ঘোরালো সে। ঝাড়া দিয়ে মাথা আর মুখ থেকে পানি সরিয়ে হেসে বলল, 'পুরো গল্পটা শুনতে হবে। নিশ্চয় খুব মজার গল্প,' শুরু হয়ে গেল তার বকবক। 'অনেক চেষ্টা করলাম, লোকটার পেট থেকে একটা কথাও বেরোল না। বোমা মারতে হবে। আগে আগুনটা নিভিয়ে নিই, তারপর। যাবে কোথায়?

আটকে রয়েছে ভেতরে...'

'ভেতরে?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'কনর, কনর,' বললো মরিসন। 'জনাব মিক কনর। মিলানি রোজেনডালের "আচমকা" স্বামী। জামাই বাবাজী শুয়ে আছেন এখন ভেতরে। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিলো...'

মিলানিকে নিয়ে সরাইখানার বারান্দায় উঠল বোরিস আর রোভার। পেছনে তিন গোয়েন্দা। ভেতরে ঢুকল সবাই।

লিভিং রুমে একটা আর্ম-চেয়ারের হাতলে বসে আছে মিস্টার কারসন। তার পাশে একটা সোফায় বসা নকল মিলানি, শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল। শজারুর কাঁটার মত দাঁড়িয়ে আছে মাথার খাটো চুল। চোখ টকটকে লাল, অনেক কেঁদেছে, বোঝা যায়। তার পায়ের কাছে লম্বা হয়ে পড়ে আছে কনর। গভীর ঘুমে অচেতন।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

মিলানির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন কারসন। 'মিস রোজেনডাল?' নকল মিলানির দিকে ফিরলেন। 'আশ্চর্য! অবিশ্বাস্য! চুল ছাড়া সব এক...চেনার জো নেই...'

'ওর কি হয়েছে?' কনরকে দেখিয়ে আবার জিজ্ঞেস করল রবিন।

হাসলেন কারসন। 'গুলি করেছি। ওর বন্দুক দিয়েই।'

সতের

আগুন পুরোপুরি আয়ত্তে আনতে আনতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কয়েকজনকে পাহারায় রেখে ফিরে গেল দমকল-বাহিনী। আগুনকে বিশ্বাস নেই, আবার কোনখান দিয়ে উস্কে ওঠে ঠিক নেই, তাই কয়েকজন ফায়ার- ফাইটারকে রেখে যাওয়া হয়েছে। বনের ওপরে জায়গায় জায়গায় এখনও ধোঁয়া রয়েছে। বাতাসে তীব্র কাঠপোড়া গন্ধ।

সরাইখানার লিভিং রুমে অনেক মানুষ। লম্বা একটা সোফায় শুয়ে আছে মিলানি। গায়ের ওপর কম্বল। অনেকটা সুস্থ এখন। কথা বলার জন্যে তৈরি।

খবর পেয়ে এসে হাজির হয়েছেন একজন ডেপুটি শেরিফ। মিলানির কাছে একটা চেয়ারে বসে কারসনের দিকে চেয়ে ভুরু কোঁচকালেন।

গাম্ভীর্য দূর হয়ে গেছে, নকল ফটোগ্রাফারের মুখে এখন যেন চির-হাসি বিরাজমান। মহানন্দে ট্র্যাংকুইলাইজার গানটা ধরে রেখেছেন কনরের দিকে, ভাবখানা, আরেকবার ট্রিগার টেপার সুযোগ দিলে কৃতজ্ঞ হবেন। ওষুধের ক্রিয়া

কাটিয়ে উঠেছে কনর, চেয়ারে বসে জ্বলন্ত চোখে তাকাচ্ছে কারসনের দিকে। ডাইনিং টেবিলে কনুই রেখে হেলান দিয়ে চেয়ারে বসে আছে নকল মিলানি, চোখ বন্ধ। বিদ্যুৎ নেই, আগুনে পুড়ে লাইন নষ্ট হয়ে গেছে। মোমের আলোয় বড় বিষণ্ন দেখাচ্ছে তাকে, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত।

নোটবুক খুললেন ডেপুটি। কারসনের দিকে চেয়ে বললেন, 'আপনার বন্দুকটা সরান তো।'

'হাতকড়ি লাগান আগে হাতে,' কারসন বললেন। 'নইলে পালাবে। একবার চেষ্টা করেছিল, শরীরে ওষুধ ঢুকিয়ে ঠেকিয়েছি।'

'কেউ এখন পালাতে পারবে না,' কোমরের বেল্টে ঝোলানো পিস্তলে হাত দিলেন ডেপুটি। 'সরান ওটা।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে গিয়ে গানটা আলমারিতে রেখে এলেন কারসন। তবে আগের জায়গায় বসলেন না, ডাইনিং টেবিলের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গেলেন দরজার কাছে, পাল্লা লাগিয়ে দিয়ে ওখানে বসলেন।

'হ্যাঁ, ভাল হয়েছে,' বলে আরেকটা চেয়ার নিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের দরজার কাছে বসল বোরিস।

'পালানর সব পথ বন্ধ,' বলে মিলানির দিকে তাকালেন ডেপুটি। 'মিস রোজেনডাল, আপনার দুই ভাই জানাল, কনরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আপনার। কি হয়েছিলো, খুলে বলবেন?'

'কিডন্যাপার!' রেগে গিয়ে বলল রোভার।

'ডাকাত!' যোগ করল বোরিস।

'প্লীজ,' হাত তুললেন ডেপুটি। 'আপনারা থামুন। ওঁকে বলতে দিন। হ্যাঁ, বলুন, মিস রোজেনডাল। একেবারে গোড়া থেকে।'

কনরের দিকে তাকাল একবার মিলানি। কম্বলের কোণা মোচড়াল কয়েকবার। শুরু করল, 'সরাইয়ে এসে সব চেয়ে ভাল রুমটা ভাড়া নিল। ও নাকি আমার স্কি স্লোপ দেখতে চায়। দেখালাম। বলল, একটা নতুন কোম্পানির প্রেসিডেন্ট সে। কোম্পানিটা স্নোমোবাইল বানায়। তার কোম্পানিতে আমাকে টাকা খাটাতে অনুরোধ করল। রাজি হলাম না। সে-ও আর চাপাচাপি করল না। তবে গেলও না এখান থেকে। রয়ে গেল আরও তিন হপ্তা।

'তারপর একদিন, টাকা গুনতে দেখল আমাকে। দোকানের বিল মেটাতে যাব। ও আমাকে পরামর্শ দিলো, নগদ দেয়ার চেয়ে চেক দেয়া অনেক নিরাপদ। আমি বললাম, নগদেই সব কিছু কিনি আমি, লোকের কাছে বাকি চাইতে খারাপ লাগে। তাছাড়া আমার টাকা ব্যাংকের সেফ ডিপোজিটে নিরাপদেই রয়েছে। যখন

যা দরকার গিয়ে বের করে আনি। আর ওই বাক্সটা কেবল আমিই খুলি, আর কেউ হাত দেয় না, দেয়ার উপায় নেই। এমনভাবে ও আমার দিকে তাকাল না, কি বলব? বোঝাতে পারব না। অদ্ভুত দৃষ্টি! ভয়ই পেয়ে গেলাম।'

'তখনই চাবিটা লুকিয়েছিলেন, না?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ। গোলমাল করতে পারে, সন্দেহ হয়েছিল।'

'চাবিটা কোথায়?'

'সে-এক মজার কাণ্ড!' বোরিস বলল। 'আমাদেরকে বলেছে মিলি। তার বিছানার স্প্রিঙের নিচে টেপ দিয়ে আটকে রেখেছিল। আর ওই বিছানায়ই ঘুমিয়েছে বাটপার দুটো। কল্পনাই করেনি, ওদের নিচেই...'

রাগে বিচিত্র একটা শব্দ করে উঠতে গেল কনর, কিন্তু ডেপুটিকে পিস্তলে হাত দিতে দেখেই বসে পড়ল আবার।

'হ্যাঁ, বলে যান, মিস রোজেনডাল,' বললেন ডেপুটি।

'এর দু'তিন দিন পর,' বলল মিলানি। 'রান্নাঘরে কাজ করছিলাম, এসে ঢুকলো ও। ধমক দিয়ে বলল, চাবিটা না দিলে গুলি করে মারবে আমাকে। মাথা ঠাণ্ডা রাখলাম। ভেবে দেখলাম, চাবিটা দিলেও মারবে। তার চেয়ে না বলাই ভাল। যতক্ষণ না বলি, বাঁচিয়ে রাখবে।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন ডেপুটি। 'তারপর?'

'রাগেনি ও, শান্ত ছিল। হেসে বন্দুক নেড়ে বলল, তাড়াহুড়ো নেই ওর। বন্দুকের মুখে আমাকে নিয়ে গিয়ে ঢোকাল সন্ন্যাসীর কেবিনে। আগেই নতুন কড়া লাগিয়ে রেখেছিল। আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজায় তালা আটকে দিল। দু'দিন ওর দেখা পেলাম না, শুধু পানি আর রুটি খেয়ে কাটিয়েছি—ওগুলো আমার সঙ্গেই রেখে এসেছিল। তারপর রোজ যেত খাবার নিয়ে, রোজই জিজ্ঞেস করত চাবিটার কথা। বলিনি।'

'ক'দিন আটকে রেখেছিল আপনাকে?'

'ছয়...কি সাত দিন। ঠিক হিশেব রাখতে পারিনি। আজ ধোঁয়ার গন্ধ পেয়ে দাবানল লেগেছে বুঝে চিৎকার শুরু করলাম। আমার ভাইয়েরা আর এই ছেলেরা শুনল আমার চিৎকার। বের করে আনতে গেল। তারপর ওই জানোয়ারটা...ওহ্, কি সাংঘাতিক...' দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল মিলানি।

'খারাপ লাগছে?' কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রোভার।

'না, আমি ঠিক আছি,' মুখ থেকে হাত সরাল না মিলানি। 'কিন্তু তোমরা জানলে কিভাবে, আমি কোথায়?'

'কিশোর বুঝতে পেরেছিল,' জানাল বোরিস। 'আমরা তো ওই

মেয়েলোকটাকেই তুমি ভেবে বসে ছিলাম। বুঝতেই পারিনি, ও তুমি নও।'

'ঠিকই বলেছেন,' মাথা দোলাল কিশোর। 'চেহারা প্রায় এক। শুধু উইগ পরেছে, আর নাকের ওপর বোধহয় আরেকটা আলগা নাক লাগিয়ে নিয়েছে, চোখা করার জন্যে। ঠোঁটও বদলেছেন নাকি?' নকল মিলানির দিকে চেয়ে বলল সে, জবাবের অপেক্ষা করল না। 'যা-ই হোক, ধরা পড়েছেন আঙটিটার জন্যে। আর, সই।'

'আঙটি? সই?' ভ্রূকুটি করলেন ডেপুটি।

'হ্যাঁ, স্যার, মিস রোজেনডালের সই নকল করার জন্যে অনেক প্র্যাকটিস করেছে মিসেস কনর। প্র্যাকটিস করার পর আমাদের সামনে একটা কাগজ পুড়িয়ে ফেলেছে মিস্টার কনর, সবটা পোড়ার আগেই আগুন নিভিয়ে লেখা দেখে ফেলেছি আমরা। আর আঙটির ব্যাপারটা হল, মিসেস কনর বলেছে, সাত দিন আগে লেক ট্যাহোইতে তাদের বিয়ে হয়েছে। তার মানে তার আঙুলের মাপে কেনা হয়েছে আঙটিটা। তাহলে লাগে না কেন আঙুলে? সাত দিনেই এত ঢলঢলে? আমার চাচীর কথা মনে পড়ল। বেশি ডায়েটিং করে আর ব্যায়াম করে তিনি যখন রোগা হয়ে যান, তখন তাঁর আঙুলে আঙটি ঢলঢল করে। কিন্তু মাত্র সাত দিনে সেটা হয় না। প্রশ্নটা খোঁচাতে লাগল আমাকে। ভেবে দেখলাম, একটাই উত্তর, আঙটিটা অন্য কারও। আসল মিলানি রোজেনডালের, তাই না মিসেস কনর? মিসেস কনরই তো, নাকি তাতেও কোনও ঘাপলা আছে?'

'উকিলের সাথে কথা না বলে কোনও কথার জবাব দেবে না ও,' কড়া গলায় বলল কনর। 'আমিও চুপ থাকব।'

'তা থাকুন,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'আপনাদের হয়ে আমিই বলে দিচ্ছি।' ডেপুটির দিকে তাকাল সে। 'এখানে এসেই কনর দেখল, মিস রোজেনডালের সঙ্গে তার স্ত্রীর চেহারার আশ্চর্য মিল রয়েছে। চুল, আর সম্ভবত নাক-ঠোঁট ছাড়া—আজকাল রবারের নকল নাক আর ঠোঁট লাগিয়ে আরেকজনের মত করে নেয়া কিছুই না, জানেন ভাল করেই। মিল দেখেই আইডিয়াটা এল কনরের মাথায়…'

'আসবেই, শয়তান লোক তো,' বলে উঠলেন কারসন। 'ঠকবাজ আমার বোনকেও ঠকিয়ে এসেছে। গিয়ে কি মিষ্টি করেই না বুঝাল, তার একটা খনি আছে। আমার বোন কি হাজার দশেক ডলার ইনভেস্ট করবে? নিয়ে গিয়ে খনিটা দেখালও আমার বোনকে। টাকাটা দিয়ে দিল আমার বোন। পানির দরে বিশ বছরের বাতিল খনি কিনে রেখেছিল কনর, উকিলকে দিয়ে দলিল করল, আমার বোন দশ হাজার ডলারে তার কাছ থেকে কিনেছে ওটা। দলিল না পড়েই সই

দিয়ে দিয়েছিল আমার বোন, ফলে ব্যাটার বিরুদ্ধে কেসও করতে পারলাম না। করলে কিছু হত না। শয়তান!'

'আপনি তাহলে আসলেই ফটোগ্রাফার নন,' মুসা বলল।

হাসলেন কারসন। 'আমি ট্যাহোইতে একটা হার্ডওয়্যার দোকানের মালিক। কনর ঠকিয়ে যাওয়ার পর থেকে আমরা তার ওপর চোখ রাখতে থাকি। একদিন লেক ট্যাহোইর এক কফি শপে তাকে ওই মেয়েমানুষটার সঙ্গে ঢুকতে দেখে আমার বোন। ভাবে, মেয়েলোকটা কনরের নতুন শিকার। সঙ্গে ক্যামেরা ছিল, আড়ালে বসে থাকে আমার বোন। ওরা বেরনর সময় ছবি তুলে ফেলে। গাড়ির নম্বরও রাখে। আমাকে এনে দেয়। খোঁজ নিয়ে জানলাম, গাড়িটা স্কাই ভিলেজের মিস মিলানি রোজেনডালের। কনর আমাকে চিনতো না। সুবিধে হল। আমার বোনের ক্যামেরাটা নিয়ে, নেচার ফটোগ্রাফারের ছদ্মবেশে এখানে এসে উঠলাম।'

'মিস রোজেনডালকে সতর্ক করতে এসেছিলেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সতর্ক, সেই সঙ্গে কনরকে পাকড়াও করে জেলে ভরতে। কিন্তু এখানে এসে দেখি, মহিলাকে বিয়ে করে বসে আছে সে। নতুন মোড় নিয়েছে ঘটনা। বেকায়দায় পড়ে গেলাম। এক রাতে অফিসে ঢুকে কাগজপত্র সব ঘেঁটে দেখলাম। কনরের নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছেন মিস রোজেনডাল—এমন কোনও দলিল পেলাম না। বুঝতেই পারলাম না কোন্ শয়তানী করতে যাচ্ছে কনর।'

মাথা দোলাল কিশোর। 'আরও আগে থেকে আবার শুরু করা যাক। কনর এখানে এল, মিস রোজেনডালকে দেখল। টাকা আছে বুঝে তাঁকে ঠকানর চিন্তা করতে লাগল সে। প্রথমে ঠিক করতে পারল না, কিভাবে ঠকাবে। কোম্পানির জাল শেয়ার বিক্রির চেষ্টা করল, রাজি করাতে পারল না মিস রোজেনডালকে। নিরাশ হল না সে। স্ত্রীর সঙ্গে মিস রোজেনডালের চেহারার মিল দেখে আইডিয়াটা এল তার মাথায়, চট করে আসেনি, ধীরে ধীরে এসেছে। বুঝল, জিততে পারলে শুধু টাকা নয়, সরাইখানাটা সহ সব সম্পত্তিই হবে তার।

'সরাইখানায় রয়ে গেল কনর। মিস রোজেনডালের স্বভাব-চরিত্র জেনে নিতে লাগল, কিভাবে কি করেন বুঝে নিতে লাগল সব। চুরি করে তাঁর অফিসে ঢুকে কাগজপত্র আর লেজার ঘেঁটে জেনে নিল, টাকাপয়সা, সয়সম্পত্তি কি কি আছে।

'নিখুঁত পরিকল্পনা করল কনর। মিস রোজেনডালকে সন্ন্যাসীর কেবিনে বন্দি করে রেখে সেদিনই তাঁর গাড়ি নিয়ে চলে গেল লেক ট্যাহোইতে। নকল মিলানিকে নিয়ে ফিরে এল। স্কাই ভিলেজে রটিয়ে দিল, মিলানি রোজেনডাল তাকে বিয়ে করেছে। ঠিকঠাক মতই চলছিল সব কিছু, শুধু, সেফ ডিপোজিটের চাবিটা খুঁজে পাচ্ছিল না ওরা।

'বোরিস আর রোভার যে মিলানি রোজেনডালের বড় ভাই, জানত ওরা। তাই দু'জনকে হঠাৎ করে চলে আসতে দেখে ভীষণ চমকে গিয়েছিল। নিশ্চয় চাবি খোঁজার সময় মিস রোজেনডালের সমস্ত জিনিসপত্র ঘেঁটেছিল ওরা, বোরিস আর রোভারের ছবি দেখেছিল, তাদের পাঠানো চিঠি পড়েছিল।

'চমকে গেলেও সামলে নিয়েছিল কনর। কিন্তু নকল মিলানি পড়েছিল বিপদে। জার্মান বলতে পারে না, আর ইংরেজিতেও বিদেশী টান নেই। স্বামী জার্মান জানে না, মাইণ্ড করবে, এই দোহাই দিয়ে শুধু রোভার আর বোরিসকে ইংরেজি বলতে বাধ্য করেছিল।'

'নার্ভাস হয়ে থাকত সে-কারণেই,' মুসা বলল।

'স্বাভাবিক। ডিপোজিট বক্সের চাবিটা খুঁজে না পাওয়ায় আরও বেশি নার্ভাস হয়ে ছিল। আসল মিলানি বাকিতে কোনও জিনিস কিনতেন না, ফলে সে-ও কিনতে পারছিল না। ব্যাংকে গিয়ে চাবি হারিয়ে গেছে, একথা বলারও সাহস হয়নি। যদি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করে বসে? যদি সই ভালমত চেক করে? যদি তাদের কোনও প্রশ্নের ভুল জবাব দিয়ে বসে? সিমেন্ট নিয়ে আসার পর বিলে সই দিতে দ্বিধা করছিল, তাঁর কারণ, যদি কোম্পানির মালিক বুঝে ফেলেন সইটা নকল?

'ওদের দু'জনের কাজে আমরাও অনেক বাধা সৃষ্টি করছিলাম। এমনকি, মিসেস কনর মিস রোজেনডালের সই প্র্যাকটিস করতে পারছিল না আমরা ঘরে থাকায়, যদি কোনভাবে দেখে ফেলি, এই ভয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখেই ফেললাম, ওদের এত সতর্কতা সত্ত্বেও। আর আমাদেরকে সরিয়ে তৃণভূমিতে গেল কনর, যাতে আমরা না দেখি, তা-ও দেখলাম টাওয়ারের ওপর থেকে বিনকিউলার দিয়ে।'

বিষ দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল কনর।

নোটবুক বন্ধ করে মিলানির দিকে ফিরলেন ডেপুটি। তারপর তাকালেন নকল মিলানির দিকে। 'নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না, দু'জনের চেহারায় এত মিল…নাক আর ঠোঁট কি সত্যি বদলেছেন?'

নীরবে মাথা নোয়াল শুধু নকল মিলানি।

আবার আসল মিলানির দিকে ফিরলেন ডেপুটি। 'ট্র্যাংকুইলাইজার গান দেখিয়ে ধমক দিত আপনাকে কনর?'

'না। আসল বন্দুক। শটগান।'

'সিঁড়ির নিচের ওই আলমারিতে রাখে,' দেখিয়ে দিল মুসা।

দরজার কড়া নড়ল। উঠে চেয়ার সরিয়ে খুলে দিলেন কারসন। ভেতরে

ঢুকলেন ডোনার। হাতে-মুখে-কাপড়ে কালি, গায়ে ধোঁয়ার গন্ধ। দেখেই বোঝা যায়, ক্লান্ত। দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালেন। নকল মিলানির ওপর থেকে চোখ সরে গেল আসল মিলানির ওপর, বিস্ময় ফুটল চোখে। ডেপুটিকে দেখলেন। তারপর চাইলেন রান্নাঘরের দরজা আগলে বসা বোরিসের দিকে। 'বাহ্,' কথা বললেন অবশেষে, 'ভাল নাটক চলছে এখানে।'

'জটিল নাটক, মিস্টার ডোনার,' রবিন বলল।

'এই নাটকে ইনি কিভাবে জড়িত?' ডোনারকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডেপুটি।

'নাহ্, ইনি জড়িত নন,' বলল কিশোর। 'ইনি একজন শৌখিন প্রকৃতিবিদ। সত্যি সত্যি বেড়াতে এসেছেন। জন্তুজানোয়ারেরা তাঁর কথা বোঝে।'

'এবং শোনে,' ক্লান্ত হাসি হাসলেন ডোনার।

'তাই নাকি?' কথাটা যে বিশ্বাস করলেন না ডেপুটি, বোঝা গেল। 'তো, এখন দয়া করে কেউ কি বলবেন, ট্র্যাংকুইলাইজার গান দিয়ে কি করত কনর?'

'ভীষণ শয়তান লোক, তাই না?' হাসি মুছে গেল ডোনারের মুখ থেকে, রেগে যাচ্ছেন। 'গুলি করে যারা জানোয়ার শিকার করে, তাদের চেয়ে খারাপ। ভাবুন একবার, ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে নিরীহ একটা জীবকে ধরে এনে গর্তে পোরা…কি সাংঘাতিক!'

বুঝতে পারলেন না ডেপুটি। কেমন যেন বোকা বোকা হয়ে গেল চেহারা। 'আপনি…মানে…বলতে চাইছেন, কনর ভালুক ধরে আনতে চাইছিল?'

'না, ভালুক নয়,' মাথা নাড়ল মুসা। 'একটা…'

'কনরের ধারণা,' মুসাকে থামিয়ে বললেন ডোনার। 'পাহাড়ে দৈত্য আছে। একটাকে ধরে এনে গর্তে ভরতে পারলে অনেক দর্শক আসবে, টিকিট বিক্রি করে লালে লাল হয়ে যাবে সে।'

'লোকটা শুধু ঠকবাজ নয়,' তিক্ত কণ্ঠে বললেন অফিসার। 'বদ্ধ উন্মাদ!'

'তাই তো,' হেসে সায় জানালেন ডোনার। 'নইলে দৈত্য-দানব আছে, এ-কথা বিশ্বাস করে? আর সেটা ধরার জন্যে ট্র্যাংকুইলাইজার গান নিয়ে পাহাড়ে যায়?'

অবাক হয়ে ছোট্ট মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল তিন গোয়েন্দা।

আঠার

দু'দিন পর রকি বীচে ফিরে, বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করল তিন গোয়েন্দা।

'খবরের কাগজে আবার নাম উঠল তোমাদের,' বললেন পরিচালক। 'ফাইলে এনেছ, দেখতে পাচ্ছি। নাম কি রেখেছ কেসটার? দৈত্যের পাহাড়?'

'ভয়াল গিরি হলে কেমন হয়, স্যার?' বিনীত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'চমৎকার! খুব ভাল। ইংরেজিতে নাম রাখব টেরর মাউনটেইন,' কিশোরের পাল্লায় পড়ে ইদানীং কিছু কিছু বাংলা শিখতে আরম্ভ করেছেন পরিচালক। ভয়াল গিরি শব্দটা বুঝতে পারলেন। 'ফাইলটা দেখি,' হাত বাড়ালেন।

বিশাল ডেস্কের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল রবিন।

গভীর নীরবতার মাঝে কাটল কয়েকটা মিনিট, মাঝে মাঝে শুধু ফাইলের পাতা ওল্টানর মৃদু খসখস শব্দ। পড়া শেষ করে মুখ তুললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার, 'হুঁ, দানব তাহলে একটা সত্যি আছে?'

'নিজের চোখে দেখেছি, স্যার, আমরা,' বলল কিশোর। 'কিন্তু কে বিশ্বাস করবে আমাদের কথা? রোভার, বোরিস আর মিলানি রোজেনডালও দেখেছে। তারপরেও বিশ্বাস করতে চাইছে না। তাদের ধারণা, বড় কোনও ভালুক দেখেছে। ধোঁয়া ছিল তখন, উত্তেজনার মাঝে ভালুককেই দৈত্যের মত লেগেছে। কেউ জিজ্ঞেস করলে একথাই বলবে এখন। আর মিস্টার ডোনার তো মুখই খুলবেন না।'

কিশোর থামতে মুসা বলল, 'আমাদের সঙ্গে গোপনে আলাপ করেছেন, মিস্টার ডোনার। বলেছেন, যদি পত্রিকাওলাদের কিছু বলি, তিনি নেজে গিয়ে সাক্ষী দেবেন, ভালুক দেখেছি আমরা। তিনি একজন বয়স্ক সম্মানী মানুষ, নেচারালিস্ট, আর আমরা ছেলেছোকরা। কার কথা বিশ্বাস করবে লোকে?'

'তা ঠিক,' মাথা দোলালেন পরিচালক। 'তবে আমি বিশ্বাস করছি তোমাদের কথা। কিশোর, ফাটলের ধারে জীবটার পায়ের ছাপ কি মিস্টার ডোনারই মুছেছিলেন?'

'হ্যাঁ, স্যার, তিনি আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন। আসলে, জীবটাকে, বাঁচাতে চাইছেন তিনি।'

'ঠিকই করেছেন, মিস্টার ডোনার,' বললেন পরিচালক। 'নইলে, খবরটা শুনলেই মিক কনরের মত লোকেরা দলে দলে ট্র্যাংকুইলাইজার গান নিয়ে ছুটবে স্কাই ভিলেজে। তা জীবটা কি, কিছু বোঝা গেছে?'

'অনেকগুলো রেফারেন্স বই পড়েছি আমি,' রবিন জানাল। 'ক্যালিফোর্নিয়ার উপকথার ওপরও কিছু কিছু বই পড়েছি। গুজব রয়েছে, সিয়েরা আর কাসক্যাড রেঞ্জের পাহাড়ে নাকি অদ্ভুত পায়ের ছাপ দেখেছে মানুষ। হিমালয়ের তুষার-মানব ইয়েতির গল্প জানি আমরা, আমেরিকান সাসকোয়াচের কথা শুনেছি। অনেকেই নাকি দেখেছেও, কিন্তু প্রমাণ করতে পারেনি, সত্যি আছে ওসব জীব। আপনিও

জানেন সেসব গল্প।'

'আমরা যেটাকে দেখেছি,' কিশোর বলল। 'আমার বিশ্বাস সরাইয়ে খাবার খুঁজতে আসত ওটা, ভালুকের মত। মিস্টার ডোনারও তা-ই মনে করেন। আমার স্কাই ভিলেজে যাওয়ার দিন দুই আগে সরাইয়ের চত্বরে ওটার পায়ের ছাপ দেখেছিলেন। কনরও দেখেছিল। সেদিনই ট্র্যাংকুইলাইজার গানটা কিনে আনে সে। তার পরদিন থেকে শুরু করে সুইমিং পুলের নামে গর্ত খোঁড়া। ব্যাপারটা বুঝে ফেলেন ডোনার, সেদিন থেকেই তৃণভূমির ওপরের পাহাড়ে ঘোরাঘুরি শুরু করেন, জীবটাকে খুঁজে বের করে ওটাকে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে। তিনি বলেছেন, কয়েকবার সন্ন্যাসীর কেবিনটার পাশ দিয়ে গেছেন তিনি। কিন্তু ভেতর থেকে কোনও শব্দ হয়নি, ফলে বুঝতে পারেনি কাউকে ওখানে বন্দি করে রাখা হয়েছে।'

'দিন কয়েক ভোগান্তি ছিল বেচারি রোজেনভানের কপালে,' দুঃখ করে বললেন পরিচালক। 'ডোনার আর কি করবেন? তা কেমন আছে এখন মেয়েটা?'

'আমরা তো ভালই দেখে এসেছি,' হেসে বলল মুসা। 'যা চকোলেট আর পেস্ট্রি খাওয়াল না, স্যার…এখনও জিভে স্বাদ লেগে রয়েছে।'

তার কথার ধরনে কিশোর আর রবিন হেসে ফেলল। মিস্টার ক্রিস্টোফারও মৃদু হাসলেন। 'দেখি, পারলে যাব একবার। বলা যায় না, তোমাদের এই কেসের গল্প নিয়ে ছবিও করতে পারি। তাহলে শুটিংটা স্কাই ভিলেজেই করব।…আচ্ছা, রাতের বেলা ভালুকের ছবি তুলতে গিয়েছিল কেন কারসন? আর তাকে রদ্দাই বা মারল কে?'

'কারসন বোঝানর চেষ্টা করছিলেন,' জবাব দিল কিশোর, 'তিনি সত্যিই নেচার ফটোগ্রাফার। ভালুক দেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, পেছন থেকে এসেছিল সেই জীবটা। ফ্ল্যাশগানের আলোয় চমকে গিয়ে রদ্দা মেরেছিল। কারসনের এখনও ধারণা, পেছন থেকে এসে কনরই তাঁকে মেরেছে।'

'তোমরা তাকে বলনি?'

'বলার কোনও দরকার ছিল না,' হাসল রবিন। 'আর বললেও হয়ত বিশ্বাস করতেন্ না। খামোকা তাঁর কাছে বোকা সাজতে যাই কেন?'

'ঠিকই তো!' হঠাৎ যেন মনে পড়ল পরিচালকের। 'আমিই বা বোকা সাজতে যাই কেন? ছবি বানালেই আনতে হবে ওই দৈত্যের চরিত্র—নইলে ছবি জমবে না। আর আনলেই, যেহেতু পত্রিকায় উঠেছে…তার চেয়ে এই একটা গল্প নিয়ে ছবি নাহয় নাই বানালাম।' ফাইলটা তুলে রাখলেন আলমারিতে। 'রেখে দিই যত্ন করে, কি বল? বেঁচে থাকুক আমাদের ভয়াল গিরির আজব দৈত্যটা!'

ঃ শেষ ঃ

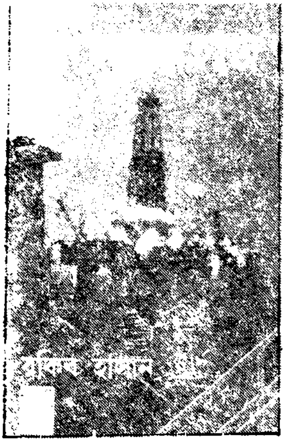

কালো জাহাজ

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ১৯৮৯

'অক্টোপাস!' গালে আঙুল রাখল রবিন মিলফোর্ড। 'নাম রেখেছে বটে!'

কেবিন ক্রুজারে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার পাশে রয়েছে তার দুই বন্ধু, মুসা আমান আর কিশোর পাশা।

'নামটা আমারও পছন্দ হচ্ছে না,' ছড়ানো নীল সাগরের মাঝে মাথা উঁচু করে থাকা সামনের পাহাড়ী দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা।

মিস্টার মিলফোর্ড হাসলেন। 'অয়েল ড্রিলিং প্ল্যাটফর্মের নাম তো একটা রাখতেই তবে। তবে অক্টোপাস না রেখে রাখা উচিত ছিল হাঙর। ওই প্ল্যাটফর্মটার মাত্র আধ মাইল দূরে বিখ্যাত শার্ক রীফ, ওইই যে,' হাত তুলে দেখালেন। 'জাহাজের গোরস্থান বলা চলে জায়গাটাকে। ওসব জাহাজ ডুবত অবশ্য অনেক আগে, পুরনো আমলে, আজকাল আর ডোবে না সহজে। অনেক উন্নতি হয়েছে জাহাজের। কিন্তু হাঙরেরা আছে আগের মতই। আর হাঙরের জন্যেই নাম হয়েছে শার্ক রীফ।'

গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'গেল তাহলে সাঁতার কাটা!'

কিশোর চুপচাপ। তাকিয়ে রয়েছে দক্ষিণের উঁচু দ্বীপগুলোর দিকে। সান্তা বারবারা চ্যানেলে পার হচ্ছে এখন কেবিন ক্রুজার। ওগুলোর মাঝে সব চেয়ে বড় তিনটে দ্বীপের নাম সান্তা ক্রুজ, সান্তা রোসা, আর স্যান মিগুয়েল। পাশাপাশি এমনভাবে রয়েছে ওগুলো, দূর থেকে দেখে আলাদা বোঝা যায় না, মনে হয় একটা। মাঝে চওড়া ফাঁক, তার পরে পুবে ছোট আরেকটা দ্বীপ, নাম অ্যানাক্যাপা। ওই ফাঁকের দিকেই ছুটেছে এখন বোট।

'এসে গেলাম!' উত্তেজিত শোনাল কিশোরের কণ্ঠ। মোড় নিয়ে সান্তা ক্রুজের পাশ দিয়ে এগোচ্ছে বোট। জুনের সেই বিকেলেও এখনকার মতই উত্তেজিত হয়েছিল সে, যখন তাদেরকে নিয়ে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

হাতে কাজকর্ম ছিল না। ছায়ায় বসে বলতে গেলে ঝিমোচ্ছিল তিন গোয়েন্দা, রবিনদের বাড়ির পেছনের আঙিনায়। এই সময় সেখানে এসে হাজির হলেন মিস্টার

মিলফোর্ড। বললেন, 'এই যে, ছেলেরা, তোমাদেরকেই খুঁজছি। আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে?'

'বেড়াতে?' পলকে সজাগ হয়ে উঠেছে মুসা।

'সান্তা বারবারায়। সাগরের মাঝে নতুন একটা অয়েল প্ল্যাটফর্ম খোলা হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু লোক তেল তোলায় বাধা দিচ্ছে। তার ওপর একটা রিপোর্ট তৈরি করতে বলেছেন আমাকে সম্পাদক সাহেব। সে-জন্যেই যাচ্ছি।'

পত্রিকার কাজে বাইরে যাওয়া তার জন্যে নতুন কোনও ব্যাপার নয়। লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা নামী পত্রিকায় কাজ করেন তিনি। প্রায়ই যান এখানে-ওখানে।

'বাবা,' রবিনকে বিশেষ খুশি মনে হল না। 'শুনেছি, অনেক প্ল্যাটফর্ম করা হয়েছে ওখানে। এই নতুনটার এমন কি বিশেষত্ব?'

'আছে,' প্রশ্নের জবাব দিয়েছে কিশোর। 'কাল রাতে টেলিভিশনে দেখিয়েছে। চ্যানেল আইল্যাণ্ডের বাইরে এই প্রথম একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হল। দ্বীপগুলোর কাছে এমন জায়গায় বসানো হয়েছে, খেপে গেছে প্রকৃতি-প্রেমিকরা। পাখি, জন্তুজানোয়ার আর গাছপালায় বোঝাই ওসব দ্বীপ। আশপাশের সাগরেও জীবনের ছড়াছড়ি। তেল তোলা শুরু হলে, পানিতে ছড়িয়ে পড়লে পানি দূষিত হয়ে যাবে। মাছ মরবে, জলজ গাছ মরবে, মরবে ওগুলোর ওপর নির্ভরশীল দ্বীপের অন্যান্য প্রাণী। প্রকৃতি-প্রেমিকেরা রেগেছে সে-কারণেই।'

মাথা ঝাঁকিয়েছেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'ঠিক। প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে বিরোধী পক্ষ। নৌকা নিয়ে টহল দিচ্ছে প্ল্যাটফর্মের চারপাশে। যাতে তেল তুলতে না পারে।'

'হ্যাঁ, শ'য়ে শ'য়ে নৌকা। তা আংকেল, কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'

'এখুনি।'

লাফ দিয়ে উঠে যার যার বাড়ি ছুটেছে কিশোর আর মুসা, ব্যাগ গুছিয়ে আনার জন্যে। রবিনের বাবার সঙ্গে যাবে, দু'জনের কারও বাড়ি থেকেই অনুমতি পেতে কোনও অসুবিধে হয়নি। বলতেই রাজি হয়ে গেছেন কিশোরের চাচা-চাচী আর মুসার বাবা-মা। দ্রুত ফিরে এসেছে রবিনদের বাড়িতে দু'জনে। তারপর, মোটর গাড়িতে করে আশি মাইল পথ পেরিয়ে, রকি বীচের উত্তরে সান্তা বারবারার এক মোটেলে এসে রুম ভাড়া নিয়েছে। মালপত্রগুলো ওখানে রেখে বন্দরে এসে উঠেছে এই কেবিন ক্রুজারে।

চওড়া চ্যানেল। মাঝে মাঝে অনেক প্ল্যাটফর্ম মাথা তুলে রেখেছে পানির ওপরে। ওগুলোর একধারে ছড়ানো ডেরিক, বিমানবাহী জাহাজের ডেকের মত

বিশাল, দেখতেও অনেকটা ওরকম।

'গোলমালটা কি ওখানে শুরু হয়েছে?' একটা প্ল্যাটফর্ম দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। সুযোগ পেয়ে শুরু করল লেকচার। 'যখন-তখন ভূমিকম্প হয় এখানে। প্ল্যাটফর্ম বসিয়ে তেল তোলা বিপজ্জনক। ওসবের তোয়াক্কা না করে তেল কোম্পানিগুলোকে তেল তোলা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিল সরকার। কিন্তু বিপদের কথা, আর ম্যারিন লাইফ নষ্ট হওয়ার কথা ভেবে বাধা দিতে এগিয়ে এল সান্তা বারবারার লোকেরা। তাদের কথা শুনল না সরকার। শেষে উনিশশো উনসত্তর সালের মস্ত একটা তেলের কুয়া বিস্ফোরিত হয়ে তেল ছড়িয়ে পড়ল সাগরের পানিতে, প্রায় দুই লাখ পঁয়তিরিশ হাজার গ্যালন তেল। বিরাট এলাকা জুড়ে সাগরের পানি নষ্ট হল, ধ্বংস হল অগণিত জলজ প্রাণী...'

'তাহলে এখনও প্ল্যাটফর্মগুলো আছে কিভাবে এখানে?' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার। 'এখনও সরানো হয়নি কেন?'

'ঠিক একথাই অনেকে বলছে, মুসা,' মিস্টার মিলফোর্ড বললেন। 'কিন্তু এতদিনেও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি সরকার, নেয়া খুব কঠিন। তেল এখন আমাদের দেশের জন্যে খুবই জরুরী। খনি যখন পাওয়া গেছে, যতটা সম্ভব নিঙড়ে বের করে নেয়া উচিত। আবার, প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখাও সমান জরুরী। কোনটাকে বাদ দিয়ে কোনটাকে রাখবে ভেবে ঠিক করতে পারছে না সরকার।'

তীব্র স্রোতের বিপরীতে, বড় বড় ঢেউ কেটে এগোতে গিয়ে ভীষণ দুলছে ক্রুজার। সান্তা ক্রুজ দ্বীপের পুব পাশ ঘুরে বেরিয়ে এল অবশেষে খোলা সাগরে।

'ওই যে,' হাত তুলে পশ্চিমে দেখাল কিশোর।

'অক্টোপাস!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'ওটার কথাই বলছ, না বাবা?'

সবুজ রঙ করা, ইস্পাতের মস্ত পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা প্ল্যাটফর্মটাকে দেখাচ্ছে সাগরের তল থেকে উঠে আসা বিরাট কোনও অচেনা দানবের মত। যতই এগোচ্ছে ক্রুজার, স্পষ্ট হচ্ছে প্রতিটি অংশ। তিন গোয়েন্দা দেখল, কয়েক স্তর ডেক রয়েছে ওটাতে। প্রতিটি ডেকের ভার বইছে মোটা মোটা থাম। সব চেয়ে ওপরের ডেকটাতে রয়েছে উঁচু একটা ক্রেন। কিশোর অনুমান করল, লম্বায় তিরিশ মিটার হবে প্ল্যাটফর্মটা, চওড়াও প্রায় একই সমান, আর সমুদ্র সমতল থেকে পঞ্চাশ মিটার মত উঁচু। চারপাশে ভাসছে অসংখ্য ছোট-বড় বোট, বিকেলের রোদে চকচক করছে ওগুলোর উজ্জ্বল শরীর, বিশাল প্ল্যাটফর্মটার কাছে যেন কতগুলো ছোট ছোট বামন।

'খাইছে!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। 'শ'খানেকের কম না।'

প্রায় সব ধরনের সব আকারের বোট রয়েছে—বেশির ভাগই বিরোধী দলের। কেবিন ক্রুজার, উঁচু সেইলবোট, ছোট ক্যাটাম্যারান, ঝকমকে সেমি-ইয়ট, মরচে পড়া পুরনো মাছধরা নৌকা, হালকা দ্রুতগতি বোট—গভীর সাগরে মাছধরা কিংবা বেড়ানর উপযোগী, তেল কোম্পানির মজবুত ওয়ার্ক বোট, এমনকি একটা বড় ইয়টও রয়েছে। প্ল্যাটফর্ম ঘিরে দূর দিয়ে চক্কর দিচ্ছে ওগুলো, যেন শ্বেতাঙ্গ ঘাঁটি আক্রমণের পাঁয়তারা করছে যোদ্ধা ইণ্ডিয়ানরা।

প্রায় প্রতিটি বোটের মাস্তুলে ঝুলছে নানারকম ব্যানার। লাউড স্পীকার আর বুল হর্ন দিয়ে স্লোগান দিচ্ছে প্রতিবাদীরা। তেল কোম্পানিকে গালাগাল করছে, এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলছে।

দলছুট হয়ে একটা মাছধরা নৌকা এগিয়ে গেল প্ল্যাটফর্মের দিকে। ব্রিজে দু'জন লোক। একজন হুইল ধরেছে, আরেকজন রেলিঙে পেট ঠেকিয়ে ঝুঁকে রয়েছে। দুজনেই গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে।

চেঁচিয়েই তাদের কথার জবাব দিল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো কয়েকজনঃ 'খবরদার, রিগের কাছে আসবে না!...এখানে কি? মাছ ধরতে যাও না কেন তোমরা? ...খাবে কি? বোট চালাবে কি দিয়ে? ...মাথামোটা বলদের দল...!'

লম্বা একটা ওয়ার্ক বোট—এটা কোম্পানির নয়—বেরিয়ে এসে মাছধরা নৌকাটাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল। বড় বড় অক্ষরে নাম লেখা রয়েছে বোটটার হুইলহাউসের দেয়ালে আর গলুইয়ের পেছনেঃ ডলফিন। নিচু কেবিনে লেখা রয়েছেঃ সেভ দ্য আইল্যাণ্ডস কমিটি। ওই বোটের কাছে ক্রুজার নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেনকে মিস্টার মিলফোর্ড।

ক্রুজার কাছাকাছি যেতে চেঁচিয়ে বললেন তিনি, 'কমিটি বোট! আমি রজার মিলফোর্ড। খবরের কাগজের লোক।'

ডলফিনের ডেকে দাঁড়ানো লম্বা, রোগাটে একজন লোক ফিরে তাকালেন। চোখে হর্ন-রিমড চশমা। গায়ে ভারি গলাবন্ধ সোয়েটার। বাতাসে উড়ছে লম্বা বাদামী চুল। দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরিয়ে একটা বুল হর্ন মুখে লাগিয়ে তিনি বললেন, 'হাল্লো! আসুন, কাছে আসুন।'

ঢেউয়ের মধ্যে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রাখা মুশকিল। মাঝে কিছুটা ফাঁক রেখে থামল বোট দুটো, মোটা দড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি একটার সঙ্গে আরেকটাকে বেঁধে ফেলল নাবিকেরা। রেলিঙের কাছে এসে মিস্টার মিলফোর্ড আর ছেলেদের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকালেন লম্বা ভদ্রলোক। 'আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, মিলফোর্ড,' আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। 'নিজের চোখে অবস্থা দেখে যান। কাণ্ড দেখেছেন! ঝড়ের সময় ওখানে ট্যাংকার থাকতে পারে না, ডোবে, না হয় মারাত্মক

রীফে লেগে ভেঙে চুরমার হয়। আর ওরকম একটা জায়গায় বানিয়েছে প্ল্যাটফর্ম! টিকবে?'

'এসে যখন পড়েছি, সব জেনে নেব একে একে,' বলে, ছেলেদের দিকে ফিরে হাসলেন মিলফোর্ড। 'তোমাদের জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে। ইনি মিস্টার জেমস কারটার, বিখ্যাত লেখক।'

'জেমস কারটার!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'রহস্য গল্প লেখেন যিনি!'

'আপনার সব বই পড়েছি আমি,' লেখকের দিকে চেয়ে বলল মুসা। 'দারুণ লেখেন, স্যার।'

'হ্যাঁ, খুব ভাল,' কিশোর বলল। 'নতুন গল্পের তথ্য জোগাড় করতে এসেছেন এখানে, স্যার?'

'না,' জবাব দিলেন কারটার। 'আমি কমিটির চেয়ারম্যান। পরিবেশ ঠিক রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব। কাজের চেয়ে সেটা জরুরী, তাই কাজ ফেলে রেখেই চলে এসেছি।' প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকালেন একবার। ফিরে চেয়ে হাসলেন। 'খালি আমার প্রশংসা করছ, তোমরাও কিন্তু কম বিখ্যাত নও। মিলফোর্ড টেলিফোনে বলল, রবিন, মুসা আর কিশোরকে সঙ্গে আনছে। তারমানে তিন গোয়েন্দা।'

'আমাদের নাম জানেন আপনি!' একসাথে চেঁচিয়ে উঠল তিন কিশোর।

'তোমাদের অনেক কেসের কাহিনী আমি পড়েছি। ভাল লেগেছে। অবাক হয়েছি তোমাদের বুদ্ধি দেখে, রোমাঞ্চিত হয়েছি দুঃসাহসের কথা ভেবে··· তোমাদের একটা কার্ড সংগ্রহে রাখতে পারলে খুশি হব।'

গর্বে আধ হাত ফুলে গেল তিন গোয়েন্দার বুক। পকেট থেকে কার্ড বের করে রেলিঙের ওপর ঝুঁকে বাড়িয়ে দিল কিশোর।

হাতে নিয়ে পড়লেন কারটার।

তাড়াহুড়ো করে দাড়িওয়ালা একজন লোক এসে হাজির হল সেখানে। মাথায় নেভাল অফিসারের পুরনো ক্যাপ, গায়ে ভারি জ্যাকেট। অনবরত রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, নোনা বাতাস লেগে শক্ত হয়ে গেছে মুখের চামড়া, বিরক্তিতে কুঁচকে রেখেছে। কালো চোখের তারায় রাগ। বিড়বিড় করে কিছু বলল কারটারকে।

গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লেন লেখক। ছেলেদের দিকে চেয়ে বললেন, 'পরিচয় করিয়ে দিই। ক্যাপ্টেন নরম্যান পেক। ডলফিনের মালিক। আর···,' থেমে গেলেন হঠাৎ। হাতের কার্ডটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে মুখ তুললেন। 'বয়েজ,' ধীরে ধীরে বললেন তিনি। 'একেবারে সময়মত এসে পড়েছ তোমরা। একটা রহস্যের সমাধান করতে হবে।'

দুই

'মারছে,' মুসা বলল। 'মিস্টার কারটার, আপনি রহস্য কাহিনী লেখেন। এই রহস্যের সমাধান আপনিই করছেন না কেন?'

'মুসা, আমি লেখক। রহস্য-লেখক আর রহস্য-ভেদীর মাঝে অনেক ফারাক,' শুকনো কণ্ঠে বললেন কারটার। 'সমস্যাটা তাজ্জব করে দিয়েছে আমাকে। অনেক ভেবেছি, সমাধান বের করতে পারিনি।'

মাথা কাত করে তাকাল কিশোর। সে-ও অবাক হয়েছে। এসেই একটা রহস্য পেয়ে যাবে, কল্পনাও করেনি। বলল, 'সাহায্য আশা করতে পারব, স্যার। তা সমস্যাটা যদি খুলে বলেন...'

নার্ভাস ভঙ্গিতে হাতঘড়ির দিকে তাকাল ডলফিনের ক্যাপ্টেন। 'বেশি সময় নেই, মিস্টার কারটার।'

'ঠিক আছে,' ক্যাপ্টেনকে বলে ছেলেদের দিকে ফিরলেন লেখক। 'এটাই আমাদের সমস্যা, বুঝেছ। আর দেরি করা যাবে না। এখুনি তীরে ফিরতে হবে আমাদের। ওখানে গিয়েই সব কথা বলব।'

'আরেক কাজ তো করতে পারেন,' মিস্টার মিলফোর্ড বললেন। 'ওদের নিয়ে যান না সঙ্গে করে। আমি এদিকে বিরোধীদের একটা ইন্টারভিউ সেরে ফেলি। ওরা থাকলেও আমার কোনও উপকারে আসছে না। তার চেয়ে...'

'ভাল বলেছেন,' এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন কারটার। 'ফেরার পথেই সব কথা জানাতে পারব ওদের।'

ছেলেরাও যাওয়ার জন্যে একপায়ে খাড়া। তবু রবিন বলল, 'বাবা, আমরা থাকলে তোমার সুবিধে হত না?'

'না, যাও তিনজনেই। পরে গল্পটা আমাকে শুনিও। হয়ত এ-ব্যাপারেও পত্রিকায় কিছু লিখতে পারব।'

নিচে উত্তাল সাগর। সাংঘাতিক দুলছে দুটো বোটই। ক্যাপ্টেন পেক আর কেবিন ক্রুজারের ক্যাপ্টেনের সহায়তায় রেলিঙ টপকে এক বোট থেকে আরেক বোটে চলে এল তিন গোয়েন্দা। বাঁধন খুলে দেয়া হল। নাক ঘুরিয়ে বিরোধীদের বোটগুলোর দিকে এগোল কেবিন ক্রুজার।

আরেক বোটে থাকা অ্যাসিসট্যান্ট চেয়ারম্যানের সঙ্গে রেডিওতে কথা বললেন কারটার। দলের নেতৃত্ব নেয়ার নির্দেশ দিলেন সহকারীকে। তারপর তীরের দিকে রওনা হল ডলফিন। বড় জোর ঘন্টাখানেকের পথ। শক্তিশালী এঞ্জিন বোটটার।

দেখতে দেখতে পেছনে ফেলে এল মস্ত প্ল্যাটফর্ম। ঢুকে পড়ল সান্তা ক্রুজার আর অ্যানাক্যাপার মাঝের চ্যানেলে।

'ওই যে, আরেকটা জাহাজ ফিরে যাচ্ছে,' হাত তুলে দেখাল রবিন।

প্রতিবাদের ব্যানার ঝুলছে মাস্তুলে। কয়েক মাইল দূরে রয়েছে জাহাজটা, কালো রঙ, ছোট্ট ব্রিজ।

'বারটি ব্রাদার্স!' কপালে হাত রেখে রোদ আড়াল করে দেখছেন কারটার। 'ডাইভার। অক্সনার্ড-এর লোক। বিরোধী দলে ঢুকতে চায়। ঢুকতে দেব কিনা ভাবছি। কোনও সংগঠনে মানিয়ে নিতে পারবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমার। আমাদের উদ্দেশ্য,- দল বেঁধে থাকব আমরা। একসঙ্গে প্রতিবাদ জানাতে যাব প্ল্যাটফর্মে, একসঙ্গে ফিরে আসব; তাতে জোর বাড়ে।'

'তাহলে একা ফিরে চলেছেন কেন?' জিজ্ঞেস না করে পারল না মুসা।

'বাধ্য হয়ে,' আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন লেখক। 'তেল নেই, প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। রহস্য এটাই।'

'বুঝলাম না, স্যার,' ছিটকে গালে এসে পড়া নোনা পানি মুছল রবিন।

'এই নিয়ে চার বার তেল ফুরাল ডলফিনের, এক হপ্তায়। থাকতে পারলাম না সে-জন্যেই। সাগরের যা অবস্থা, সারাক্ষণ এঞ্জিন চালু রাখতে হয়, বন্ধ করার জো নেই।'

'তাহলে,' ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'তেল বেশি নেয়ার ব্যবস্থা করলেই হয়।'

'ব্যবস্থা তো আছেই। শক্তিশালী এঞ্জিন এটার, দ্রুতগতি, বডিও শক্ত, সে-কারণেই ভাড়া নিয়েছিলাম। লীডিং বোট হিসেবে ভাল হবে ভেবে। ভালই চলে, তবে তেল খুব বেশি খায়। বার ঘন্টা যাতে চলে, সেভাবে হিসেব করেই রওনা হওয়ার আগে তেল নেয় ক্যাপ্টেন, ট্যাংক ভর্তি করে। কিন্তু এই হপ্তায় তিন বার ঘটেছে ঘটনাটা, দশ কি এগার ঘন্টা চলেছে। আজও সেই একই কাণ্ড।'

'আজও ট্যাংক ভরে নেয়া হয়েছিল?' জানতে চাইল মুসা।

'কানায় কানায়। স্টিক গজ দিয়ে মেপে দেখেছি।'

'তার মানে,' ধীরে ধীরে বলল কিশোর। 'তেলটা কিভাবে নষ্ট হয় সেটাই রহস্য?'

'ঠিক ধরেছ।'

দক্ষিণ-পশ্চিমে ছুটেছে বোট। আশপাশে দ্বীপ থাকায় খোলা সাগরের চেয়ে ঢেউ এখানে অনেক কম। সামনে, কালো জাহাজটার সঙ্গে দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে। মাইলখানেক দূরে এখন ওটা।

নীরবে কিছু ভাবল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'সব সময় কি একই রকম?

মানে, প্রতিবারেই কি একই পরিমাণ তেল নষ্ট হয়?'

'তা বলতে পার। ফেরার আগে প্রত্যেকবার মেপে দেখেছি, ফুয়েল গজ একই রীডিং দিয়েছে। প্রথমবার বন্দরে ফেরার পরেও কয়েক গ্যালন তেল বাকি ছিল। পরের দু'বার এক মাইল দূরে থাকতেই শেষ হয়ে গেছে। রেডিওতে বন্দরে খবর পাঠাতে হয়েছে, সাহায্যের জন্যে। এবার তাই বাড়তি ক্যানে করে কিছু তেল নিয়ে এসেছি।'

'স্যার,' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'জোয়ারের ব্যাপারটা হিসেবে ধরেছেন?'

'হ্যাঁ, সঙ্গে সঙ্গেই হিসেব করেছে ক্যাপ্টেন পেক। কোনও সম্ভাবনাই বাদ রাখেনি।'

'বাতাস আর স্রোতের বাধা?' মুসার প্রশ্ন।

'ধরা হয়েছে।'

'এঞ্জিনে কোনও গোলমাল?' আবার জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কিংবা ফুয়েল গজও খারাপ হতে পারে,' যোগ করল মুসা।

মাথা নাড়লেন কারটার। 'ওসব কথা শুরুতেই ভেবেছি। সব চেক করা হয়েছে। এঞ্জিনে কোনও গোলমাল নেই, ফুয়েল গজও ভাল। তেলের ট্যাংক কিংবা লাইনে কোনও ছিদ্র নেই। প্রপেলার আর শ্যাফটও ঠিক আছে।'

'জবাব তাহলে একটাই,' রবিন বলল। 'কেউ তেল চুরি করছে।'

'ঠিক বলেছ,' একমত হল মুসা। 'তা-ই ঘটছে।'

'কিভাবে?' কারটার বললেন। 'গত তিন দিন ধরে সারা রাত বোট পাহারা দিয়েছে ক্যাপ্টেন পেক আর আমার মালী। ডলফিনের ধারেকাছে কাউকে আসতে দেখেনি।'

গভীর ভাবনায় ডুবে রয়েছে কিশোর, একটা কথাও বলছে না। চ্যানেলের দিকে তাকিয়ে আছে। জাহাজ চলছে, দ্বীপগুলো দ্রুত পেছনে পড়ছে, খেয়ালই করছে না যেন। শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার কারটার, শুধু ডলফিনেই ঘটছে এই ঘটনা?'

'হ্যাঁ, কিশোর। আর এটাই আরও বেশি করে ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে। গাধা মনে হচ্ছে নিজেকে। একটা ব্যাপারে আমি শিওর, এটা কোনও অ্যাক্সিডেন্ট নয়।'

ঢোক গিলল মুসা। 'আপনার ধারণা...মানে...ডলফিনকে স্যাবোটাজ করছে কেউ?'

'তেল কোম্পানি...,' কথা শেষ করল না রবিন, তবে ইঙ্গিতটা পরিষ্কার।

'কেউ একজন করছে। তবে কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কিভাবে করছে, কেন?'

দ্রুত মূল ভূ-খণ্ডের কাছাকাছি হচ্ছে ডলফিন। মাইল খানেক দূরে সান্তা বারবারা বন্দর দেখা যাচ্ছে এখন। ডেকে বেরিয়ে এল ক্যাপ্টেন পেক। জানাল, 'তেল প্রায় শেষ!' ঝাঁজাল কণ্ঠ। 'আগের মতই।'

'কিন্তু,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'প্রথমবারের মত নয়।'

'সেটা জানা কি জরুরী?' জানতে চাইলেন কারটার।

'আপনি জানেন, স্যার, রহস্যের ক্ষেত্রে যে কোনও ছোট্ট পয়েন্টও ইমপরট্যান্ট।'

ট্যাংকে তেল ভরতে চলে গেল ক্যাপ্টেন।

বন্দরের দিকে এগিয়ে চলেছে বোট। আলোচনা চলছে তিন গোয়েন্দা আর কারটারের মাঝে। অবশ্যই তেল চুরির ব্যাপার নিয়ে।

বন্দরের দক্ষিণে ব্রেক-ওয়াটার, পাথরের দেয়ালে ঘেরা একটা প্রাকৃতিক বাঁধ। সাগরের পানি ঢুকেছে তাতে, কিন্তু দেয়ালের কারণে ঢেউ কম, স্রোতও নেই। পুব পাশে সাগরের মাঝে ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে তেল কোম্পানির কাঠের জেটি। বাঁধ আর জেটির মধ্যখান দিয়ে বন্দরে ঢোকার পথ। ওটাকেও বন্ধ করে দেয়ার অবিরাম চেষ্টা চালাচ্ছে যেন বালির চরা। একটা জায়গায় চরা কেটে সরু খালমত তৈরি করতে হয়েছে। জায়গাটা এত সরু, গতি কমাতে বাধ্য হল ক্যাপ্টেন; কমতে কমতে একেবারে থেমে যাবার উপক্রম হল বোট।

প্রবেশ-পথের বাঁয়ে পানির ওপরে উঠে লম্বালম্বি এগিয়ে গিয়ে বাঁধের দেয়ালে ঠেকেছে চরা, সৃষ্টি হয়েছে এক চিলতে চমৎকার সৈকত। সেখানে সাঁতারুদের ভিড়। বেশির ভাগই সারফার। পরনে কালো ওয়েটস্যুট। লম্বা সারফ বোর্ড নিয়ে পানিতে নামছে, শাঁ শাঁ করে ছুটে যাচ্ছে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে।

বন্দরের সীমানায় ঢুকেই ম্যারিনার দিকে এগোল ডলফিন। পানির নিচ থেকে কংক্রিটের দেয়াল তুলে মুড়ে দেয়া হয়েছে পশ্চিম তীর, জেটি তৈরি হয়েছে সেখানে।

'ম্যারিনার পার্কিং লটে আমার গাড়ি,' কারটার জানালেন। কাঠের সারি সারি ডক পেরিয়ে নিজের বার্থের দিকে এগোচ্ছে ডলফিন। 'বাড়ি রওনা হওয়ার আগে একবার তেল কোম্পানির জেটিতে যাব। আমাদের পিকেটাররা কি করছে দেখা দরকার।'

ঘাটে পৌঁছল ডলফিন। রাতে আর বেরোবে না। ক্যাপ্টেন বোটে রয়ে গেল। তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে নামলেন কারটার। চওড়া চত্বর ধরে দ্রুত এগোলেন বন্দরের উত্তরে। ম্যারিনা আর জেটির মাঝে ছোট আরও একটা সৈকত রয়েছে। সেখানে লোকের ভিড়—টুরিস্টই বেশি। যার যার কাজ বাদ দিয়ে তাড়াহুড়ো করে

এগোচ্ছে তেল কোম্পানির জেটির দিকে। জেটিতে মানুষের কোলাহল।

চেঁচিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করল অনেক লোক।

শঙ্কিত হয়ে উঠলেন মিস্টার কারটার। 'জলদি এস! নিশ্চয় গণ্ডগোল হয়েছে,' বলেই দৌড় দিলেন জেটির দিকে।

তিন

সামনে সান্তা বারবারার প্রধান সড়ক—ওটা থেকে বেরিয়ে সরু আরেকটা পথ তীর বরাবর এগিয়ে গিয়ে ঢুকেছে জেটিতে। ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল তিনটে ট্রাক, নানারকম পাইপ বোঝাই ওগুলোতে। তেল তোলার ড্রিলিং পাইপ। ড্রাইভার আর শ্রমিকেরা ফিরে চেয়ে আছে গেটের দিকে। ওখানে লোকের জটলা, হাতে প্ল্যাকার্ড আর ব্যানার। গেট জুড়ে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছে।

'বললাম না, গণ্ডগোল!' থেমে গেলেন কারটার। 'কিন্তু হল কি? ম্যানেজারের সঙ্গে তো কথা হয়েছিল, উল্টোপাল্টা কিছু করবে না। কোর্ট যা রায় দেবে তাই মেনে নেবে।'

'ওই যে, স্যার,' হাত তুলে দেখাল কিশোর। 'গণ্ডগোলের কারণ।'

ট্রাক আর পিকেটারদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে কালো, বড় একটা লিমুসিন গাড়ি। ওটা থেকে তিন মিটার মত দূরে বিরোধীদের সঙ্গে রাগারাগি করছে চওড়া-কাঁধওয়ালা এক লোক। পরনে পুরনো ছাঁটের স্যুট, মাথায় হলুদ শক্ত হ্যাট। চেঁচাচ্ছে, 'দেখ, শেষবারের মত সাবধান করছি তোমাদেরকে! ভাগ এখান থেকে! তেল তোলার জন্যে রাখা হয়েছে আমাকে, আর সেটা করে ছাড়ব। কয়েকটা মাছের থোড়াই পরোয়া করি আমি! মরুকগে না ওগুলো!'

'কিন্তু কারটারের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে আপনার!' জনতার মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে জবাব দিল কেউ।

'কথা রাখছেন না!' বলল আরেকজন।

'মাছের পরোয়া আপনি না করলেও আমরা করি,' বলল তৃতীয় আরেকজন। 'ওগুলো মরলে আমাদের ভীষণ ক্ষতি হবে।'

'কচু হবে!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল হলুদ হ্যাটপরা লোকটা। 'পাগলের সঙ্গে আমার কোনও কথা নেই। ভাল চাইলে...'

পিকেটারদের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজন। নোংরা ওভারঅলের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে ওয়েটস্যুট, পায়ে রবারের বুট। খোলা সাগরের রোদ আর বাতাসে প্রায়-চৌকোণা মুখের চামড়া লাল। মাথায় কালো উলের টুপি। দাঁত বের

করে হিঁসিয়ে উঠল সে, 'নাহলে কি করবে, কসাই কোথাকার?'

তার পেছনে বেরিয়ে এল আরেকজন গাঁট্টাগোঁট্টা লোক। চেহারায় মিল রয়েছে, পোশাক-আশাকও সব এক, শুধু টুপির রঙটা বাদে। ওরটা লাল। 'আমরা পাগল নই। আর বলেছি পাইপ নামাতে দেব না, দেব না, ব্যস। যাও, ভাগ।' বলেই স্লোগান দিতে শুরু করল।

তার সঙ্গে গলা মেলাল অন্য পিকেটাররা।

রাগে লাল হয়ে গেল হলুদ হ্যাটওয়ালা লোকটার মুখ। 'মাল নামাবই, যা হয় হবে। দেখি কি করতে পার!'

পেছনে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কালো টুপি, 'বস, বসে পড়। সামনের সারি বসে যাও।'

হাত নেড়ে ট্রাক-ড্রাইভার আর শ্রমিকদের ডাকল হলুদ-হ্যাট। দ্রুত এসে পেছনে জমা হতে শুরু করল তার লোকেরা।

তিন গোয়েন্দাকে নিয়ে ট্রাকের কাছে পৌঁছে গেলেন কারটার। উইণ্ডব্রেকার পরা, বেঁটে, হালকা-পাতলা এক যুবক লাফ দিয়ে নামল সামনের ট্রাকটা থেকে। লেখকের সঙ্গে সঙ্গে এগোল পিকেটারদের দিকে।

'মিস্টার কারটার,' যুবক বলল। 'ওই লোকদুটো আমাদের ট্রাক আটকাতে বলছে। চুক্তির কথা ভুলে বসে আছে।'

'ওরা কারা?' জানতে চাইল কিশোর।

'কুইমবি ব্রাদার্স। ওই কালো ফিশিং বোটটা যাদের,' জানালেন কারটার। 'কালো টুপি পরা যে, ওর নাম ফেড কুইমবি। আর লাল টুপি, ডিড।' পাশে পাশে আসা যুবককে দেখিয়ে বললেন, 'এ-হল লুক হারডিন, তেল কোম্পানির সান্তা বারবারা ব্রাঞ্চের ম্যানেজার। লুক, তোমরাও কথা রাখনি। পাইপ নিয়ে আসার কথা ছিল না। কোর্ট রায় দেবে…'

'মনে আছে, মিস্টার কারটার, সরি। তবে কাজ করতে আনিনি। আগে থেকেই এনে জমিয়ে রাখছি, এই আরকি। তা-ও আনতাম না, মিস্টার ডেলটন জোর করলেন, তাই। হাজার হোক, চাকরি তো করি।'

'মিস্টার ডেলটন কে?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন কারটার।

ফিরে তাকাল হলুদ-হ্যাট।

'মিস্টার ডেলটন,' তাড়াতাড়ি বলল হারডিন। 'ইনি মিস্টার জেমস কারটার, বিরোধী দলের চেয়ারম্যান। ইনি…'

'আমি তেল কোম্পানির প্রেসিডেন্ট,' হারডিনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নিজের পরিচয় নিজেই দিল ডেলটন। 'কারটার, আপনার লোকদের থামতে বলুন।

নইলে কি করে থামাতে হয়, জানা আছে আমার। যেতে বলুন এখান থেকে।'

'মিস্টার ডেলটন,' ভোঁতা স্বরে বললেন লেখক। 'এটা পাবলিকের রাস্তা। এখানে সবার সমান অধিকার। শান্ত হোন। ওরকম মারমুখী হয়ে তো কিছু করতে পারবেন না।'

'ক'টা জেলের বাচ্চাকে সম্মান করে কথা বলতে হবে নাকি?' রেগে উঠল তেল কোম্পানির প্রেসিডেন্ট। 'ভালয় ভালয় সরতে বলুন ওদের। নইলে আপনিও বিপদে পড়বেন। আমার প্ল্যাটফর্মে স্যাবোটাজের কেস ঠুকে দেব।'

'স্যাবোটাজ?' বোকা হয়ে গেলেন যেন কারটার।

'অক্টোপাসে যন্ত্রপাতি নষ্ট করে দিচ্ছে কেউ। আপনারটা ছাড়া আর কার বোট যায় ওখানে?'

প্রেসিডেন্টের ব্যবহারে শঙ্কিত হয়ে উঠল ম্যানেজার। মিনমিন করে বলল, 'মিস্টার ডেলটন, পাইপগুলো তো এখন আমাদের দরকার নেই। ফেরত পাঠিয়ে দেয়াই ভাল।'

'নাআ!' গর্জে উঠল ডেলটন। 'জেটিতে পাইপ রেখে তবে আমি যাব। 'কি ভেবেছে, অ্যাঁ? জাপানীদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে আমার, চুক্তি মত লোকও পাঠিয়ে দিয়েছে ওরা। মিস্টার চিকামারা এখন দেশে ফিরে গেলে আমাদের খুব সুনাম হবে, না?'

দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দে ফিরে তাকাল সবাই। কালো লিমুসিনের দরজার হাতলে শোফারের হাত, তার পাশে একজন জাপানী ভদ্রলোক। বয়েস ষাটের কোঠায়, চোখে স্টীল-রিমড চশমা। শান্ত ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন গাড়ির গায়ে।

প্রেসিডেন্টের দিকে ফিরলেন কারটার। ' দেখুন, স্যাবোটাজের কথাই যখন তুললেন, আমিও আপনাদের বিরুদ্ধে কেস ঠুকতে পারি। চার চারবার তেলের ঘাপলা করা হয়েছে আমার বোটে, স্পষ্টই বোঝা যায়, চুরি করা হয়েছে। কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে। আপনারা ছাড়া এখানে আমার আর শত্রু কে? যাই হোক, এখন থেকে সব সময় শোহোকে বোট পাহারায় রাখব।'

'ইচ্ছে করলে এফবিআই-এর লোক এনে বোট পাহারায় রাখতে পারেন, কে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে?' নিতান্ত অভদ্র কণ্ঠে বলল প্রেসিডেন্ট। 'এখন আপনার লোকদের যেতে বলুন। নইলে আমার লোক দিয়ে পিটিয়ে খেদাব।'

এই কথা শোনার পর আর চুপ থাকল না তেল কোম্পানির শ্রমিকেরা, যে যা পারল তুলে নিয়ে ছুঁড়তে শুরু করল পিকেটারদের দিকে।

এক দৌড়ে গিয়ে একটা মোটা রড তুলে আনল ডিড কুইমবি। চেঁচিয়ে বলল,

'এই, তোমরা চুপ করে আছ কেন? মার ব্যাটাদের!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল বসে থাকা পিকেটাররা। হাতের কাছে যে যা পেল, ওরাও তুলে নিতে লাগল ইট, পাথর, লোহার শিক...গাল দিয়ে উঠল ফেড কুইমবি। ভাইয়ের মতই একটা রড তুলে নিয়ে তেড়ে গেল শ্রমিকদের দিকে। লেগে গেল মারপিট।

হঠাৎ, দূরে বেজে উঠল সাইরেন। দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। গাল দিল ডেলটন। 'ক'টা জেলের বাচ্চার' চেয়ে মুখ কম খারাপ নয় তার। খেঁকিয়ে উঠল, 'পুলিশকে খবর দিল কে?'

'আমি, স্যার,' বলল ম্যানেজার। 'দশ মিনিট আগেই ফোন করেছি।'

'কার চাকরি কর তুমি, হারভিন?' ধমকে উঠল প্রেসিডেন্ট। 'বদমাশগুলোকে ঠাণ্ডা করতে চাও না?'

'চাই। তবে এভাবে মাথা ফাটাফাটি করে নয়।'

দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে ততক্ষণে দু'দলে। দু'জন ট্রাক ড্রাইভারকে জাপটে ধরে মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে দুই কুইমবি, অন্যেরাও চুপ করে নেই। যে যার ওপর পারছে, হামলা চালাচ্ছে।

পুলিশ এসে পৌঁছল।

মিনিট পনের চেষ্টার পর আলাদা করতে পারল দুই দলকে।

এগিয়ে এলেন একজন পুলিশ অফিসার, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে শুরু করেছে, জেমস? লাগাল কে?'

'আর বল না, হ্যানস,' কারটার বললেন। 'তেল কোম্পানির প্রেসিডেন্ট এসে জোর করে পাইপ নামাতে চাইল, ওই যে...' চেয়েই থেমে গেলেন। লিমুসিনটা নেই। ডেলটন, চিকামারা, শোফার, কেউ নেই। কেটে পড়েছে।

'শ্রমিকরা তো বলছে তোমার লোকেরা লাগিয়েছে,' বললেন অফিসার। 'দুটো গর্দভ নাকি মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। কারা ওরা?'

'আরি!' বলে উঠল মুসা। 'মিস্টার কারটার, ওরাও তো নেই।'

'হ্যাঁ, চলে গেছে,' রবিন বলল।

'ম্যানেজারও ভেগেছে,' বলল কিশোর।

'এরা কে?' জানতে চাইলেন অফিসার।

'রকি বীচ থেকে এসেছে,' একে একে নাম বললেন কারটার। 'ওরা কিশোর গোয়েন্দা। সংস্থার নাম রেখেছে তিন গোয়েন্দা।' ছেলেদেরকে বললেন, 'আর ইনি ক্যাপ্টেন হ্যানস কারডিগো। এখানকার পুলিশ চীফ।'

'তিন গোয়েন্দা?' হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'তোমাদের নাম শুনেছি। এই কিছুদিন

আগেও তো একটা র‍্যাঞ্চে এসে হীরা চোর ধরলে। আরও আগেই শুনেছি তোমাদের কথা, ইয়ান ফ্লেচারের কাছে। খুব প্রশংসা করল।'

তিন গোয়েন্দার মুখেও হাসি ফুটল।

'দোষ আসলে প্রেসিডেন্টের,' বললেন কারটার। 'ওই ডেলটনই উস্কানি দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে। তবে, গাধা দুটোর বিচারও আমি করব। দেখি আগে, কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে, ওরা কি বলে? তারপর হবে।'

'ঠিক আছে, জেমস, এবার ছেড়ে দিলাম, অ্যারেস্ট-টেরেস্ট কিছু করলাম না। তোমার লোকদের চলে যেতে বল এখন। আজ অন্তত যেন আর কেউ না আসে। পুলিশ পাহারা রেখে যাচ্ছি আমি।'

ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে, ছেলেদের নিয়ে ম্যারিনার পার্কিং লটের দিকে রওনা হলেন কারটার।

পুরনো একটা স্টেশন ওয়াগনে লেখকের পাশে গাদাগাদি করে বসল ছেলেরা।

'স্যার,' গাড়িটা বন্দর থেকে বেরিয়ে আসার পর বলল কিশোর। 'দেখেশুনে আমার যা মনে হল, ইচ্ছে করে গায়ে পড়ে গিয়ে লেগেছে কুইমবিরা। পিকেটারদের খেপিয়ে তুলেছে। যাতে পুলিশ আসে, বিরোধীদের সরিয়ে দেয়, প্রতিবাদ আর না হয়।'

'প্ল্যাটফর্ম থেকে তাড়াতাড়ি এসেছেই সেজন্যে,' রবিন মনে করিয়ে দিল।

'আপনার বোটে তেল চুরি করছেও,' বলে গেল কিশোর। 'আমার যা মনে হয়, পিকেটারদের সন্দেহ জাগানর জন্যে। তেলের অভাবে আগেই চলে আসতে বাধ্য হচ্ছেন আপনি। বিরোধীদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।'

'কুইমবিরা তেল কোম্পানির হয়ে কাজ করছে বলছ?' বললেন কারটার। 'পরিস্থিতি এমন করে তুলছে, যাতে লোকে ভাবে দোষ আমাদের? আমরা ঝগড়াটে?'

মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'এটা খুব পুরনো কায়দা, স্যার।'

'কিশোর,' মুসা বলল। 'গোলমাল বাধাতে যে ডেলটনের কষ্ট হবে না, সে-তো চোখের সামনেই দেখলাম। কিন্তু তেলও কি সে-ই চুরি করাচ্ছে, মিস্টার কারটারকে হেয় করার জন্যে?'

'হতে পারে।'

শহরের পূর্ব প্রান্তে চলে এলেন কারটার। মোড় নিয়ে পুরনো বড় একটা বাড়ির ড্রাইভওয়েতে এসে পড়ল গাড়ি। আশপাশে পুরনো বড় বড় কাঠের বাড়ি, বেশির ভাগই নতুন করে মেরামত করা হয়েছে। সবগুলোতেই চমৎকার লন আর

উজ্জ্বল রঙের ফুলের বাগান। কিন্তু কারটারের বাড়িটা মেরামত হয়নি। জীর্ণ, মলিন, বয়েসের ভারে ধুঁকছে। গোলাপ বাগান, গাছপালা সব আগের। নতুন কিছু লাগানো হয়নি। লন প্রায় নেই, আগাছা আর ঝোপঝাড়ে ঢেকে দিয়েছে।

গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছে কিশোর। বাড়িটা যেন দেখেইনি। বুইক থেকে নামল। 'গোলমাল হোক, এটা কিন্তু চায়নি হারডিন,' বিড়বিড় করল সে, আনমনে। 'সব কিছু শান্ত রাখার চেষ্টা করেছে।'

'আমিও তাই চাই,' কারটার বললেন। 'সন্ত্রাস কখনোই ভাল নয়।'

'না,' কিশোরও একমত হল 'একটা ব্যাপার বোধহয় খেয়াল করেননি। কোনও বিশেষ কারণে শ্রমিকদের শান্ত রাখার চেষ্টা করেছে ম্যানেজার।'

কিশোরের ইঙ্গিতটা না বুঝে বলল রবিন, 'বড় বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে। হাজার হোক, ডেলটনের চাকরি করে সে। বিরোধিতা করা উচিত হয়নি।'

'সামনের দরজার দিকে এগোচ্ছে ওরা। হঠাৎ বাড়ির পেছনে দড়াম করে শব্দ হল।

'কী...?' শুরু করেই থেমে গেলেন কারটার।

দুড়দাড় করে দৌড় দিল কে যেন।

'জলদি এস! ছুটতে শুরু করেছে মুসা।'

ঘুরে বাড়ির পেছনে চলে এল সবাই। ছোট একটা লেবু বাগান, ঘরের একেবারে ধার থেকে শুরু করে বেড়ার কাছে গিয়ে ঠেকেছে। ওটার ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে কালো ওয়েটস্যুট পরা একটা লোক। দ্রুত বেড়া ডিঙিয়ে হারিয়ে গেল ওপাশে।

চার

'দেখ, দেখ!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'পেছনের জানালাটা দেখ!'

জানালাটা খোলা। নিচে পড়ে রয়েছে একটা ময়লা ফেলার ড্রাম।

'নিশ্চয় ঘরে ঢুকেছিল,' বলল কিশোর। 'ব্যাটাকে ধরা দরকার।'

মাথা ঝাঁকালেন কারটার। 'বেড়ার ওপাশে গলি আছে। ওপথেই যাবে রবিন, মুসা, রাস্তার দিকে দৌড়াও। দু'জনে দু'দিকে ঘুরে যাবে, একজন বাঁয়ে, একজন ডানে। যেদিকেই যাক ও, চোখ এড়াতে পারবে না। আমি আর কিশোর যাচ্ছি এদিক দিয়ে।'

কারটারের কথা শেষ হওয়ার আগেই দৌড় দিল দুই সহকারী গোয়েন্দা। তিনি ছুটলেন লেবু বাগানের ভেতর দিয়ে। কিশোর পিছু নিল। বেড়ার ওপরে উঠে

ওপাশে লাফিয়ে নামল দু'জনে। গলি ধরে দৌড়ে গেল কিছু দূর।

থেমে গেলেন কারটার। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'পালিয়েছে!'

মুসা আর রবিন এসে হাজির হল। হাঁপাচ্ছে। মাথা নেড়ে বোঝাল, ওরাও দেখেনি।

'ওদিকে আরেকটা বাড়ি আছে,' হাত তুলে দেখালেন কারটার। 'রাস্তাও আছে আরেকটা। তোমরা ঘুরে যাও ওদিকে। আমরা সোজা যাচ্ছি।'

আবার ছুটল দুই সহকারী।

গলি ধরে ছুটে মস্ত একটা বাড়ির পাশ কাটালেন কারটার আর কিশোর। আরেকটা রাস্তায় এসে পড়ল। মুসা আর রবিন আগেই পৌঁছে গেছে। আর কেউ নেই।

'নাহ্…,' হাত নাড়ল কিশোর। 'গেল।'

নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন কারটার। দৌড়ে কাছে এল মুসা আর রবিন।

দ্বিধা ফুটেছে গোয়েন্দা-সহকারীর চেহারায়। 'একটা গাড়িও দেখলাম না। পালাল কি করে ব্যাটা?'

'লুকিয়ে পড়েছে হয়ত কোথাও,' কিশোর বলল। 'যা-ই করুক, ওকে এখন আর পাওয়া যাবে না।'

হতাশ হয়ে ফিরে চলল ওরা।

'পরনে ওয়েটস্যুট ছিল,' মনে করিয়ে দিল রবিন। 'কুইমবিদের মত।'

'সান্তা বারবারায় বহু লোকেই ওয়েটস্যুট পরে,' কারটার বললেন। 'আমারও একটা আছে।'

বেড়া ডিঙিয়ে কারটারের সীমানায় ঢুকে লেবু বাগানের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ থমকে গেল মুসা। ফিসফিস করে বলল, 'কে জানি ওখানে!' বাড়ির একটা কোণ দেখাল সে। ক্যামেলিয়া ঝাড়ের কাছে উবু হয়ে কি যেন করছে একজন লোক।

হেসে উঠলেন কারটার। 'আরে ও তো শোহো, আমার নতুন মালী। কিন্তু ফিরল কখন?'

মালীর কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। গাছে পানি দিচ্ছে সে। হালকা-পাতলা এক জাপানী তরুণ, বয়েস বিশের কাছাকাছি। পরনে, টি-শার্ট, হাফপ্যান্টি, পায়ে স্যাণ্ডাল।

'এই যে, শোহো,' ডাকলেন কারটার।

চমকে ফিরে তাকাল মালী। এতই মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিল, পেছনে পায়ের আওয়াজও শোনেনি। হেসে সামান্য মাথা ঝাঁকাল সে।

'কখন এলে?' জিজ্ঞেস করলেন কারটার।

'এই তো, এইমাত্র,' অশুদ্ধ ইংরেজিতে জবাব দিল শোহো।

'কাউকে এখানে দেখেছ? ওয়েটস্যুট পরা?'

'না তো।'

'আমরা যে তাড়া করলাম ওকে, শোনোনি?'

চোখ মিটমিট করল শোহো। 'এইমাত্র এলাম। শুনিনি।' হাসল বটে, কিন্তু কণ্ঠের অস্বস্তি চাপা দিতে পারল না।

'ও। ঠিক আছে। তা আজ রাতেও ডলফিনে পাহারা দিতে পারবে?'

'অ্যাঁ?' ভুরু কোঁচকাল শোহো, কথা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে যেন। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, পারব?'

'বেশ,' বলে ছেলেদের দিকে ফিরলেন কারটার। 'চল খুঁজে দেখা যাক, চোরটা কি-জন্যে এসেছিল?'

দরজার দিকে সবে রওনা হয়েছে ওরা, শোহো বলে উঠল, 'দু'জন লোককে দেখেছি। কোনায় দাঁড়িয়েছিল।'

ফিরে চেয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'দেখতে কেমন?'

আবার অস্বস্তি ফুটল তরুণ মালীর চেহারায়।

'ইংরেজি ভাল জানে না ও,' কারটার বললেন। 'বুঝিয়ে বলতে পারবে না।'

ছেলেদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেন তিনি। প্রথমেই সেই ঘরটায়, যেটার জানালা খোলা রেখে পালিয়েছে চোর। ছোট ঘর, মিস্টার কারটারের স্টাডিরুম। ডেস্কের ওপর বোঝাই হয়ে আছে বই, নোট, একটা পাণ্ডুলিপি, নানা রঙের অনেকগুলো কলম, আর পুরনো একটা টাইপরাইটার। একটা ক্যানভাসের চেয়ার, পুরনো একটা স্টেরিও সেট, আর আরও পুরাতন গোটা তিনেক ফাইলিং কেবিনেটও আছে। এক কোণে রাখা হয়েছে বড় একটা শিপ-টু-শোর রেডিও ট্র্যান্সমিটার/রিসিভার।

একটা ফাইলিং কেবিনেটের ওপরের ড্রয়ারটা টেনে বের করে রাখা হয়েছে। কেবিনেটের ওপরে বড় একটা ম্যাপের পাশে পড়ে রয়েছে একটা নোটবুক, খোলা।

স্থির দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে আছেন কারটার। বিড়বিড় করলেন, 'আমার কমিটি বুকে কি দেখছিল?'

ম্যাপটা নামিয়ে আনল মুসা। 'ভারি, দ্বীপ আর বাঁকের চারপাশের পানির গভীরতা দেখানো হয়েছে। চার্ট।'

'ওরকম চার্ট যে কেউ জোগাড় করতে পারে,' বললেন কারটার।

চার্টটার দিকে তাকাল কিশোর। 'তা পারে। তবে ওগুলোতে আপনার বোটের যাতায়াতের পথ দেখানো থাকবে না। নোটবুকে কি লেখা আছে?'

'আমার ডেইলি শিডিউল। এই যেমন ধর, রিগ আর তীরে কোথায় কখন কি করব, কখন বেরোব কখন ফিরব। এছাড়া আছে কতগুলো বোট প্রতিবাদ জানাতে যাবে, কারা কখন কোন জায়গা থেকে রওনা দেবে, এসব।'

'এরকম ঘটনা আর ঘটেছে? মানে, চুরি করে কেউ নোটবই পড়তে ঢুকেছে?'

ভেবে বললেন কারটার, 'কি জানি, ঢুকতেও পারে। আমার চোখে পড়েনি। তবে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে নোটবুকটা সরানো. বিশেষ গুরুত্ব দিইনি তখন। এখন মনে হচ্ছে...'

দরজায় নক হল। ভেতরে উঁকি দিল শোহো। 'লোক এসেছে।'

তার পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল মিস্টার মিলফোর্ড। 'কী, রহস্যের সমাধান হল?'

'সমাধান তো হয়নি,' জানালেন কারটার। 'আরও নতুন রহস্য যোগ হয়েছে। আপনার কি খবর? কাজ হল?'

'হ্যাঁ, ভালই হয়েছে। বেশ কয়েকজনের ইন্টারভিউ টেপ করেছি। তেল কোম্পানির কয়েকজনের করতে যাব।' ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন সাংবাদিক, 'তোমরা যাবে নাকি?'

'চল,' রবিন বলল। 'এখানে সুবিধে করতে পারলাম না।'

'ডিনারের কি ব্যবস্থা?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

হেসে উঠলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'হবে, হবে, ভাবনা নেই। খালি পেটে রাখব না তোমাকে। কারটার, আজ খাবেন আমাদের সঙ্গে?'

'আমার বোধহয় এখন যাওয়া ঠিক হবে না। একটা ঘটনা ঘটেছে এখানে। কেন, কি কারণে, কিছু বুঝতে পারছি না।'

কিশোর কিছু বলছে না। এক হাতে নোটবুক। চার্টটা বিছিয়ে প্রবাল প্রাচীর আর দ্বীপগুলোর অবস্থান দেখছে। হঠাৎ মুখ তুলল। 'মিস্টার কারটার, ডলফিনে লগবুক আছে নিশ্চয়। কার কাছে?'

'ক্যাপ্টেন পেকের কাছে থাকে।'

রবিনের বাবার দিকে তাকাল কিশোর। 'আংকেল, আমি মোটেলে ফিরে যাব। তবে তার আগে একবার জেটিতে যাওয়া দরকার। ডলফিনে। নামিয়ে দেবেন ওখানে, প্লীজ?'

'কিশোর!' একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল দুই সহকারী। মুসা জিজ্ঞেস করল, 'মতলবটা কি তোমার? ডিনারটা পণ্ড করবে নাকি?'

'না, তা করব না। তোমার আংকেলের সঙ্গে যাও। আমি কোথাও সেরে নিতে পারব।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।

হেসে ফেলল ঘরের সবাই। মুসা যে ভোজন-রসিক, মিস্টার কারটারও বুঝে গেছেন সেটা।

পাঁচ

রবিন আর মুসাকে নিয়ে স্টেট স্ট্রীটের মোটেলে যখন ফিরে এলেন মিস্টার মিলফোর্ড, অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। দুটো ঘর ভাড়া নেয়া হয়েছে। একটাতে পাওয়া গেল কিশোরকে। ডেস্কের সামনে বসে আছে। ডেস্কে বিছানো রয়েছে কারটারের কাছ থেকে আনা চার্টটা। তাঁর নোটবুক আর লগবুকটাও আছে, দুটোই খোলা।

'খাইছে!' একটা চেয়ারে বসে পড়ল যেন মুসা। 'ইন্টারভিউ নেয়া যে এত কঠিন, জানতাম না।'

'এত বেশি কথা বলে,' রবিনও তার সঙ্গে একমত হল। 'প্রশ্ন যা করা হয়, সেটার জবাব না দিয়ে খালি ফালতু প্যাচাল। আসল কথা আদায় করাই মুশকিল।'

হাসলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'এখনও আরও অনেক বাকি। তবে, ওই যে বেশি কথা বলে, তাতে অনেক সময় সুবিধেই হয়। ওরা কেমন লোক, কি ভাবে, কি জানে, সব পরিষ্কার হয়ে যায়। আর সব কিছু জানা থাকলে ফিচারটা সুন্দর করে লেখা যায়।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন,' মুসা বলল। 'নইলে জানাই যেত না, ডেলটন মাছ আর পাখির থোড়াই পরোয়া করে। প্রকৃতিপ্রেমিকদের ঘৃণা করে সে।'

'দুনিয়া চুলোয় যাক,' যোগ করল রবিন। 'তার কিছু না। সে বোঝে কেবল তেল। কত বেশি তেল তুলতে পারবে তার কোম্পানি, আর কত বেশি বিক্রি করতে পারবে।'

'দুনিয়া চুলোয় যাক কথাটা ঠিক না, রবিন,' শান্ত কণ্ঠে ছেলেকে বোঝালেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'তিনি আর মিস্টার চিকামারাও পৃথিবীর ভালই চান, তবে অন্যভাবে। ভেবে দেখ, শুধু মাছ আর পাখি নিয়ে কি চলতে পারতাম আমরা? তেল ছাড়া প্রায় অচল হয়ে যেতাম না? এই যে আজকের এই অগ্রগতি, উন্নতি, তা কি হত পৃথিবীর?'

ফিরে তাকাল কিশোর। 'আংকেল, মিস্টার চিকামারার সম্পর্কে কি কি জেনেছেন?'

'জাপানী ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট। এখানে এসেছেন এখানকার তেল কোম্পানিগুলোকে সহযোগিতা করতে, মূল্যবান পরামর্শ দিতে। কয়েক পুরুষ ধরে ওঁরা জাপানে তেল আর কেমিক্যালের ব্যবসা করছেন।'

'ডেলটনকে ভাল পরামর্শ দিতে পারবে তাহলে,' ব্যঙ্গ করল কিনা রবিন, বোঝা গেল না।

'হয়ত,' ঘড়ি দেখলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'আবার বেরোতে হবে আমাকে। ম্যানেজার হারডিনের সাক্ষাৎকার নেয়া বাকি আছে। অফিসে ফোন করেছিলাম, বলল, জেটিতে পাওয়া যেতে পারে। আবার যাবে নাকি তোমরা? আইসক্রীম খেলে মন্দ হয় না।'

ঝকঝকে শাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল মুসার, বিমল হাসিতে। 'ঠিক বলেছেন। দারুণ হবে।'

'কিন্তু,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'মিস্টার কারটারকে কথা দিয়েছি, আজ রাতে আবার তাঁর ওখানে যাব।'

'দিয়েছি?' রীতিমত অবাক মনে হল মুসাকে। 'খাইছে, কিশোর, কখন…!' হাঁটুর নিচে রবিনের লাথি খেয়ে গাঁউক করে উঠল, যেন ঢেকুর তুলল। 'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে…যাব বলেছি…বলেছি…'

'প্ল্যান করার জন্যে,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'কাল কি কি করব।'

'বেশ,' রবিনের বাবা বললেন। 'আমি একাই যাব। হারডিনকে না পেলে চলে যাব সান প্রেস পত্রিকা অফিসে। ওদের তোলা কিছু ছবি দেখব। দেরি হবে না আমার। তোমরাও দেরি কর না। কাল অনেক কাজ আছে, সকাল সকাল ঘুমানো দরকার।'

মিস্টার ফিলফোর্ড বেরিয়ে যেতেই পা ডলতে শুরু করল মুসা। উহ-আহ করল কয়েকবার। বলল, 'মিস্টার কারটারকে কখন কথা দিলাম? আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না…'

'মুসা!' হাত তুলল রবিন। 'থাম। নিশ্চয় রহস্যের সমাধান করে ফেলেছে কিশোর। তাই না কিশোর?'

'কিছু কিছু,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল কিশোর। 'ডলফিনের লগবুকেই রয়েছে সমাধান। তেলের কি হচ্ছে, এখন গিয়ে বলতে পারি মিস্টার কারটারকে।'

'আগে আমাদের বল,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অন্য দু'জন।

হাসল কিশোর। 'একবারেই সবাইকে বলব।'

গুঙিয়ে উঠল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

শুনেই শুনল না কিশোর। লগবুক, নোটবুক, চার্ট গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। তার সঙ্গ নিল রবিন আর মুসা। রাতটা নীরব। স্টেট স্ট্রীট ধরে কয়েক ব্লক গেলেই পড়বে গার্ডেন স্ট্রীট, ওখানে মিস্টার কারটারের বাড়ি।

নক করতে দরজা খুলে দিলেন লেখক নিজে। ছেলেদেরকে নিয়ে গিয়ে ঢুকলেন আবার স্টাডিরুমে। কোণের শর্ট-ওয়েভ ম্যারিন রেডিওটা অন করা, কোস্ট গার্ড রিপোর্ট ঘোষণা করা হচ্ছেঃ একটা ঝড় এগিয়ে আসছে উত্তর দিকে, ভয়াবহ হারিক্যান।

'তোমরা, আবার···'

কারটারকে কথা শেষ করতে দিল না মুসা, বলে উঠল, 'রহস্যের সমাধান করে ফেলেছে কিশোর!'

'পুরোটা নয়,' জানাল কিশোর।

'তাই নাকি? বল, বল।'

'ডলফিনের লগবুক পড়ে···' দরজায় থাবা পড়তে থেমে গেল গোয়েন্দাপ্রধান।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন কারটার। ফিরে এলেন উত্তেজিত ম্যানেজারকে নিয়ে। লুক হারডিন।

'চিকামারা এখানে কেন এসেছিল?' জিজ্ঞেস করল ম্যানেজার।

'জাপানী ব্যবসায়ীর কথা বলছ?' অবাক হলেন লেখক। 'কই, এখানে তো আসেনি।'

'আসেনি? বলেন কি?' ম্যানেজারও অবাক। 'আধ ঘন্টা আগে আপনার বাড়িতে ঢুকতে দেখলাম। একটু আগে দেখলাম বেরিয়ে যেতে।'

'চিকামারার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার,' গম্ভীর হয়ে গেছেন কারটার।

'কিন্তু আমি তো নিজের চোখে দেখলাম।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল হারডিন আর কারটার।

আলো ঝিলিক দিল কিশোরের চোখে। 'হয়ত এ-বাড়ির ওপর চোখ রাখছিল। স্পাইইং।'

'তেল কোম্পানির হয়ে?' ভুরু কোঁচকাল রবিন।

'অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে। কে জানে, হয়ত তেল কোম্পানিকে সাহায্য করতে আসাটা তার একটা বাহানা।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। অবশেষে মাথা ঝাঁকাল হারডিন। 'এক হপ্তা হল এসেছে এখানে, অথচ আজকের আগে একবারও প্ল্যাটফর্মে যায়নি। ফোনে কার সঙ্গে যেন মিস্টার কারটার আর বিরোধীদের কথা আলোচনা করল, শুনলাম। তারপর

তাড়াহুড়ো করে বেরোল। কৌতূহল হল, তাই পিছু নিলাম। সোজা এখানে চলে এল সে।'

'আমার সঙ্গে তার কি কাজ?' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করলেন লেখক।

শ্রাগ করল ম্যানেজার। 'কি জানি। অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে। আজ বিকেলের কথাই ধরুন। ডেলটনের ব্যবহারে অবাক হইনি, ও ওরকম রগচটাই। কিন্তু আপনার কিছু কিছু লোকও যেন তাকে সাহায্য করার জন্যেই উঠেপড়ে লাগল, খেয়াল করেছেন? যাতে পুলিশ আসে। বিরোধীদের বাধা দেয়।'

'বেশি বেশি কল্পনা করছ,' আরেকদিকে চেয়ে বললেন কারটার।

'হয়ত। কিন্তু কিছু একটা ঘটছে যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ড্রিলিং প্ল্যাটফর্মে স্যাবোটাজ, আপনার বোটে তেল চুরি, দুই দলে মারপিট লাগিয়ে দেয়া···এসব কিসের আলামত? আমার তো বিশ্বাস, সব দোষ আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে আপনাকে ঠেকানর চেষ্টা চলছে।'

'এমনভাবে কথা বলছেন,' হাসল কিশোর। 'যেন আপনিও বিরোধী দলের লোক। তেল কোম্পানির নন।'

মুখ কালো হয়ে গেল ম্যানেজারের। কিশোরের দিকে চেয়ে বলল, 'তেল তোলা আমার চাকরি, ইয়াং ম্যান। কিন্তু নেচারকে রক্ষা করা আমার পবিত্র দায়িত্ব। তেল কোম্পানির লোকেরাও এই পৃথিবীর মানুষ, তাদের অনেকেই প্রকৃতি পছন্দ করে।'

আর দাঁড়াল না হারডিন। বেরিয়ে গেল। এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ হল। রাস্তার দিকে চলে গেল গাড়িটা। স্টাডিরুমে শুধু রেডিওর শব্দ, কথা বলে চলেছে ঘোষকঃ ঝড় এগিয়ে আসছে, উত্তরের মূল ভূখণ্ডের দিকে। আবহাওয়াবিদরা আশা করছেন, বাজা উপদ্বীপের কাছে এসে নিস্তেজ হয়ে যাবে ওটা।

'আমার ওপর চোখ রাখবে কেন চিকামারা?' হঠাৎ প্রশ্ন করলেন কারটার।

'রাখছে, কি করে বুঝব?' রবিন বলল। 'হারডিন যে মিথ্যে বলেনি, কোনও প্রমাণ আছে?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,' কিশোরও কথাটা ধরল। 'চিকামারা যদি স্পাইইং করেই থাকে, তাতে হারডিনের কি? ওর কথা থেকে বোঝা গেল, ও চায় প্রতিবাদ চলতে থাকুক।'

'তাতে আমাদেরই বা কি?' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'কিশোর, দোহাই তোমার, কথাটা শেষ করে ফেল এবার। ডলফিনের তেল নষ্ট হয় কিভাবে?'

হাসল কিশোর। নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'কারণ, বাড়তি বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে হয় ওটাকে, প্ল্যাটফর্মে।'

ছয়

'অসম্ভব!' বলে উঠলেন কারটার।

'না, স্যার,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'এটাই সত্যি।'

'বোঝা নিয়ে যাই, অথচ আমি জানি না, এ-হতেই পারে না। কি নিয়ে যাই?'

'এখনও জানি না। তবে নেয়া হচ্ছে, এবং ভারি কিছু। তেল নষ্ট হওয়ার এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা।'

'তুমি শিওর, কিশোর?' রবিনের কণ্ঠেও সন্দেহ।

'শিওর। ডলফিনের এঞ্জিন, তেলের ট্যাংক, তেলের লাইন, সব পরীক্ষা করা হয়েছে। সব ঠিক আছে। ফুয়েল গজ চেক করা হয়েছে। এমনকি ট্যাংকে কাঠি ঢুকিয়েও তেল মাপা হয়েছে। বন্দর ছাড়ার সময় ভরা থাকে ট্যাংক। খোলা সাগরে যখন থাকে, কেউ বোটে উঠে তেল চুরি করে না, করতে পারে না…'

'কিশোর,' বাধা দিয়ে বলল রবিন। 'সাগরে উঠতে পারে না কেউ। বন্দরেও পারে না। রাতে পাহারায় থাকে ক্যাপ্টেন আর শোহো। তাহলে ভারি বোঝা রাখে কিভাবে?'

'এই প্রশ্নের জবাবও জানি না। কিন্তু যেভাবেই হোক, রাখা হয়।'

যার যার চেয়ারে নড়েচড়ে বসল দুই সহকারী।

এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে কিশোরের চোখে চোখে চেয়ে রইলেন কারটার। তারপর বললেন, 'মনে হচ্ছে আরও কিছু বলার আছে তোমার?'

'ডলফিনের লগবুক, স্যার, আর কয়েকটা সহজ যুক্তি,' ব্যাখ্যা করল কিশোর। 'প্রথমতঃ হিসেব করেই তেল নিয়েছিলেন আপনারা, ওই চারবার। তা-ও টান পড়ে গেল তেলে। দ্বিতীয়তঃ এঞ্জিনে, তেলের লাইনে কোনরকম গোলমাল ছিল না। চুরি করাও সম্ভব ছিল না। আর তা-ই যদি হয়, মানে নষ্ট কিংবা চুরি না হয়ে থাকে, তাহলে বাকি থাকে সহজ একটা কারণ। বেশি তেল খেয়েছে এঞ্জিন।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন কারটার। 'চমৎকার যুক্তি। কিন্তু…'

'কিন্তু কেন শুধু চারদিন তেল বেশি খেল, অন্য দিন খেল না? এঞ্জিন তো একই রকম ছিল, এই প্রশ্ন করবেন তো? বেশ। তেল খারাপ হলে, অর্থাৎ তেলের মান খারাপ হলে অনেক সময় বেশি খরচ হয়। ওই চার দিন খারাপ তেল নেয়া হয়ে থাকতে পারে।'

'হ্যাঁ, এটা হতে পারে,' একমত হল মুসা।

'কিন্তু তা হয়নি। লগবুকটা যখন আনতে গিয়েছিলাম, ক্যাপ্টেন পেকের সঙ্গে

কথা বলেছি। ওই চারদিন অন্য কোনখান থেকে তেল নেয়া হয়নি। সব সময় যেখান থেকে নেয়া হয় সেখান থেকেই নিয়েছে।'

'হ্যাঁ, তেল খারাপ হতে পারে, এই প্রশ্ন আমার মনেও জেগেছিল। খেয়াল রেখেছি। ম্যারিনার একই ডিপো থেকে তেল নিয়েছে পেক।'

'অবশ্য,' হাত নাড়ল কিশোর। 'এক ডিপোতেও তেলের মান খরাপ হয়। তবে সেটা এক আধবার। এক হপ্তায় চারবার হতেই পারে না। তাহলে তেল খারাপের ব্যাপারটা বাদ দিয়ে দেয়া যায়। আরেকটা সম্ভাবনা, কোনও কারণে বেশি এলাকায় ঘুরেছে ডলফিন। কিন্তু লগবুক বলছে, ঘোরেনি। একটা মাইলও বেশি চলেনি ওই চারদিনের কোনও একদিন।'

'না, ঘোরেনি,' বললেন কারটার।

'ক্যাপ্টেন পেকও এ-কথাই বলেছে। দু'জনেরই ভুল হতে পারে না। খেয়াল করেননি, এমনও হতে পারে না।' থামল এক মুহূর্ত কিশোর। 'তাহলে কি দাঁড়াল? তেল চুরি হয়নি, পড়ে যায়নি, এঞ্জিনে গোলমাল ছিল না, তেলের মান খারাপ ছিল না, বাড়তি ঘোরাঘুরি করেননি—রোজ যে ক'মাইল পাড়ি দেন, তা-ই দিয়েছেন। একটা সম্ভাবনাই শুধু বাকি থাকে, তা হল "সময়"। ওই চারদিন যেতে-আসতে কি ডলফিনের বেশি সময় লেগেছিল? লেগেছিল। লগবুক কনফার্ম করছে সেটা।'

তিনজনের মুখের দিকেই এক এক করে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। মুচকি হাসল। 'ওই চারদিন গড়ে পনের মিনিট ফেরার পথে নষ্ট করেছে ডলফিন। পনের মিনিট যেতে দেরি করেছে, পনের মিনিট আসতে। গেল নষ্ট হয়ে আধ ঘন্টা। উত্তেজনার মাঝে ব্যাপারটা খেয়াল করেননি আপনারা।'

স্তব্ধ হয়ে গেছেন কারটার। নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ে পড়ে অবস্থা।

'এটা এখন পরিষ্কার,' বলে গেল কিশোর। 'ওই চারদিন ডলফিনের গতি কমিয়ে দিয়েছিল কোনও কিছু। জোয়ার, স্রোত, বাতাস, সব চেক করেছেন আপনারা, সব ঠিক ছিল। কোনও বাধা ছিল না। জবাব তাহলে একটাই। বোঝা। অনেক ভারি বোঝা টানতে হয়েছে বোটটাকে, ফলে সময় নষ্ট হয়েছে, তেলও বেশি খেয়েছে এঞ্জিন।'

হঠাৎ হেসে উঠলেন কারটার। 'নিশ্চয়! এটাই সহজ এবং একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা।'

'খুব সহজ,' শুকনো গলায় বলল কিশোর। 'কিন্তু রহস্যময়। ভৌতিক বললেও ভুল হবে না।'

'গোয়েন্দা গল্পের ব্যাপার-স্যাপারই এরকম,' বললেন লেখক। 'প্রথমে রহস্য খুব জটিল মনে হয়। ডিটেকটিভ যখন বলে দেয়, তখন মনে হয় পানির মত

সহজ। হায় হায়, আগে বুঝলাম না কেন?—এরকম।'

পকেট থেকে একপাতা হলুদ কাগজ বের করল কিশোর। 'মোটেলে বসে গবেষণার যথেষ্ট সময় পেয়েছি। হিসেব করে বের করেছি, কতটা বাড়তি ওজন বহন করেছে ডলফিন। গ্যালনে কত মাইল চলেছে, গতিবেগ কত ছিল, মোট কত মাইল চলেছিল, কত গ্যালন তেল টান পড়েছে, সব জানা আছে। অঙ্ক করে বের করতে মোটেও বেগ পেতে হয়নি। প্রায় দু'হাজার পাউণ্ড ভার বেশি বইতে হয়েছে বোটটাকে। আসতে, এবং যেতে, দু'বারেই। পরের তিন দিন। তবে প্রথম দিন শুধু একবার বইতে হয়েছে। কেন, এখনও জানি না।'

'দুই হাজার পাউণ্ড!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে মুসার।

'সর্বনাশ, কিশোর,' রবিনও অবাক। 'এত ওজনের একটা জিনিস কি করে বোটে লুকানো থাকতে পারে? আর বোটে তোলাই বা হল কিভাবে?'

'আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না,' স্বীকার করল কিশোর।

'খাইছে!' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'এক রহস্যের কিনারা করলে, আরও জটিল আরেকটা বাধিয়ে বসলে। সেটার সমাধান হবে কি করে?'

'ডলফিনের ওপর নজর রেখে। আজ থেকে রোজ রাতে, যতদিন না বুঝতে পারি,' রায় দিয়ে দিল কিশোর।

'শোহো আরও আগে থেকেই নজর রাখছে, কিশোর,' মনে করিয়ে দিলেন কারটার। 'রাতের শুরুতে সে পাহারা দেয়। মাঝরাতের পর থেকে পাহারা দেয় পেক।'

'জানি, স্যার। ওরা তো দিচ্ছে, দিয়েও ধরতে পারেনি কে কি জিনিস রেখে যায় বোটে।'

'এইচ জি ওয়েলসের অদৃশ্য মানবের কাজ,' তিক্ত হাসি হাসল রবিন।

'কিংবা ভূত!' ঢোক গিলল মুসা।

অধৈর্য হয়ে মাথা নাড়ল কিশোর। 'ঠাট্টার সময় নয় এটা। ভূত কিংবা অদৃশ্য মানব বলে কিছু নেই। লুকিয়ে থেকে বোটের ওপর চোখ রাখব। শোহো আর ক্যাপ্টেনও যাতে জানতে না পারে।'

'ওদের কাউকে সন্দেহ করছ?' ভুরু কোঁচকালেন কারটার।

'হতে পারে, বিশ্বাস কি?' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। 'ডলফিনে কি তোলা হয়, কে তোলে, কেন তোলে, কিছুই জানেন না আপনি। পাহারা দেয় ওরা দু'জন, আপনি নন। মিথ্যে কথা যে বলে না, শিওর হচ্ছেন কিভাবে?'

চুপ করে কিছু ভাবলেন কারটার। তারপর মাথা কাত করলেন, 'বেশ। তোমাদের সঙ্গে আমিও পাহারায় থাকব।'

'না, স্যার, সেটা উচিত হবে না। কে জানে, আপনার ওপরও হয়ত চোখ রাখছে। আমরা এখনও সন্দেহের তালিকায় উঠিনি। কাজটা আমাদেরকেই করতে হবে। আপনি আমাদেরকে রেখে চলে আসবেন।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলেন কারটার, 'কখন যেতে চাও?'

'এখুনি। মোটেলে যাব আগে। কোথায় যাচ্ছি, রবিনের বাবাকে জানিয়ে, কয়েকটা জিনিস নিয়ে তারপর যাব বন্দরে। তন্ন-তন্ন করে খুঁজব আজ বোটটা। কিছু না পেলে শেষে বসব পাহারায়।'

সাত

আধ ঘন্টা পর, শোহো আর মিস্টার কারটারকে নিয়ে পুরো বোটটা খুঁজে দেখল তিন গোয়েন্দা। সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না।

'মোটেলে গিয়ে ঘুমাও,' ছেলেদের বললেন কারটার। 'শোহোই পাহারা দিতে পারবে। কিছু দেখলে জানাবে আমাকে। এই শোহো, শোন, বোটের কাছে কাউকে আসতে দেখলে বাধা দেবে না। লুকিয়ে থেকে দেখবে কি করে। ওকে?'

মাথা-নেড়ে সায় জানাল জাপানী তরুণ।

'এস ছেলেরা, যাই,' ডাকলেন কারটার।

নীরবে গিয়ে তাঁর গাড়িতে উঠল তিন গোয়েন্দা। ডলফিনের কাছ থেকে সরে এসে, ম্যারিনার এক কোণে অন্ধকারে গাড়ি থামালেন কারটার। 'খুব সাবধানে থাকবে। গোলমাল দেখলেই ফোন করবে আমাকে।'

নামল তিন কিশোর। গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন কারটার। পার্কিং লটে ঢুকে লুকিয়ে পড়ল ওরা। পরনে গাঢ় রঙের পোশাক, অন্ধকারে প্রায় অদৃশ্য হয়ে রইল। পকেট থেকে তিনটে টর্চ বের করল কিশোর। লেন্সের মুখে কালো কাগজ লাগিয়ে দিয়েছে। প্রতিটি কাগজের মাঝখানে ছোট তিনটে কাটা—একটাতে ক্রস কেটেছে, একটাতে ত্রিভুজ, আরেকটাতে বৃত্ত। নিজে ক্রসটা রেখে, রবিনকে দিল ত্রিভুজ, আর মুসাকে বৃত্তটা। বলল, 'আলাদা হয়ে গেলেও এই টর্চ জ্বেলে সঙ্কেত দিতে পারব আমরা। মোর্স কোড। তিনটাতে তিন রকম চিহ্ন থাকায় সহজেই বুঝতে পারব কার সিগন্যাল।'

'ভাল বুদ্ধি করেছ,' প্রশংসা করল মুসা।

'বুদ্ধিটা আমার নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লণ্ডনে ব্ল্যাকআউটের রাতে এভাবে সিগন্যাল দেয়া হত। চল, যার যার পজিশন নিয়ে নিই।'

আঁধারে গা ঢেকে নীরব ম্যারিনা ধরে নিঃশব্দে এগোল ওরা। জেটিতে শুয়ে

শ'য়ে বোট বাঁধা, গায়ে গায়ে ঘষা লেগে ক্যাঁচকোঁচ করছে। ডলফিনের পাশ দিয়ে সরে এল মুসা, এমন জায়গায় বসল যাতে বোটের পাশের পানিও চোখে পড়ে। ব্রেকওয়াটারের দিকে মুখ করে, কংক্রিটের দেয়ালের ধারে কয়েকটা ব্যারেলের আড়ালে বসল কিশোর। মেরামতের জন্যে শুকনোয় তুলে রাখা একটা ক্যাটাম্যারানের গলুইয়ের নিচে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রবিন। বড় একটা ওয়ার্কবোটের পেছনের ডেকও এখান থেকে দেখতে পাচ্ছে সে।

চুপচাপ অপেক্ষার পালা।

এক ঘন্টা পেরোল।

ইতিমধ্যে কিছুক্ষণ পর পরই টর্চ জ্বেলে একে অন্যকে বোঝাল, জায়গামতই রয়েছে, কেউই কিছু দেখতে পায়নি।

এগারোটা বাজল। অস্থির হয়ে উঠল মুসা। কাউকে চোখে পড়ছে না, এমনকি শোহোকেও নয়। অথচ ডলফিনে পাহারা দেয়ার কথা তার। কোথায়? আরেকবার সিগন্যাল দেয়ার জন্যে টর্চ তুলেই স্থির হয়ে গেল। হারবার বুলভারের দিক থেকে কে যেন আসছে। চুপে চুপে এগোচ্ছে ডলফিনের দিকে। নিঃশব্দে, দ্রুত।

পৌঁছে গেল ডলফিনের কাছে। আরে! অবাক হয়ে ঢোক গিলল মুসা। একজন তো নয়, দু'জন! গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হেঁটেছে, দূর থেকে মনে হয়েছে একজন। দু'জনেরই চওড়া কাঁধ, গায়ে ভারি জ্যাকেট। আকার আকৃতি একই রকম। মাথায় খাপে খাপে বসানো টুপি, নিশ্চয় উলের। তারমানে, কুইমবিরা দুই ভাই।

এদিক ওদিক তাকাল দু'জনে। তারপর ডলফিনে উঠে গেল।

কিশোরের ক্রস চিহ্ন জ্বলে উঠল। সংক্ষিপ্ত সঙ্কেতঃ হুঁশিয়ার!

একবার আলো জ্বালল মুসা, বোঝাল, মেসেজ পেয়েছে। গলুই থেকে বোটের পাশে চলে যেতে দেখল দুই কুইমবিকে, তারপর হারিয়ে গেল ওরা।

গেল কোথায়? কান পেতে রয়েছে মুসা। অতি মৃদু শব্দ ভেসে এল, ডলফিনের ডেকের নিচ থেকে। কি করছে ফেড আর ডিড? শোহোই বা কোথায়?

কিছুক্ষণ ধরে শোনা গেল ডেকের নিচের শব্দ। আবার ওপরে উঠে এল দুই ভাই। বোট থেকে নেমে ঘুরে এগিয়ে চলল ওয়াটারফ্রন্ট বুলভারের দিকে।

জ্বলে উঠল রবিনের খুদে ত্রিভুজঃ আমি পিছু নিচ্ছি।

হাত-পায়ে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে পিছিয়ে চলে এল মুসা, কিশোরের কাছে। ফিসফিস করে বলল, 'আমরা যাব না?'

'না। সবাই মিলে গেলে দেখে ফেলতে পারে। আমি বোটে উঠব। দেখব কিছু রেখেছে কিনা। শোহো দেখেছে...' হঠাৎ থেমে গেল কিশোর। চেয়ে রয়েছে কুইমবিদের পিছু পিছু রবিন যেদিকে গেছে। 'মুসা! কে জানি! ওই যে, পার্কিং

লটের দিক থেকে আসছে।'

আড়াল থেকে বেরিয়ে দ্রুত চলতে শুরু করেছে একটা ছায়া।

'রবিনের পিছু নিয়েছে!' মুসা বলল।

'তুমি থাক এখানে,' জরুরী কণ্ঠে বলল কিশোর। 'রবিনের বিপদ হতে পারে। ওকে সাবধান করা দরকার।'

'এখানে থেকে কি করব? আমি বোটে উঠি গিয়ে। দেখি, কুইমবিরা কি করছে। শোহো কোথায়, তা-ও দেখব।'

'ঠিক আছে, যাও,' বলে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। সামনের মূর্তিটার ওপর চোখ রেখে ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চলল। কার ওপর নজর রাখছে লোকটা?—ভাবল কিশোর। রবিন, নাকি কুইমবিদের ওপর?

পিপাগুলোর আড়ালে হুমড়ি খেয়ে থেকে কিশোরকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল মুসা। কোনও গাড়ির এঞ্জিন স্টার্ট নিল না। তার মানে হেঁটে যাচ্ছে কুইমবিরা, তৃতীয় লোকটাও। তাহলে তাদেরকে অনুসরণ করতে অসুবিধে হবে না রবিন আর কিশোরের।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল মুসা। ডলফিনের দিকে চেয়ে ভাবছে, কুইমবিরা কি কিছু রেখে গেল বোটে? শোহো কি সেটা দেখেছে? ও কোথায়, দেখা যাচ্ছে না কেন?

উঠে দাঁড়াল সে। পানির কিনার ঘেঁষে তৈরি সী-ওয়ালের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ঢেউয়ে মৃদু দুলছে ডলফিন। নির্জন ডেক। কারও নড়াচড়া নেই। গেল কোথায় জাপানী মালীটা?

বোটে উঠল মুসা। ডাকল, 'শোহো?'

সাড়া নেই।

সামনের ডেক ধরে এগোল ব্রিজের দিকে। আবার ডাকল শোহোর নাম ধরে। পেছনে নড়ে উঠল কেউ। ভারি পায়ের আওয়াজ শুনে ঝটকা দিয়ে ঘুরল মুসা, কিন্তু দেরি করে ফেলল। তার কাঁধ চেপে ধরল কঠিন একটা হাত; কর্কশ কণ্ঠে ধমক দিল, 'চুপ! খবরদার, নড়বে না!'

আট

হারবার বুলভার পেরিয়ে এল রবিন। পথের অন্য পাশের একটা বাড়ির দেয়ালের ছায়ায় গা ঢেকে এগোল। আগে আগে কথা বলতে বলতে চলেছে দুই ড্রাইভার। কোনও ব্যাপারে তর্ক করছে। কথা বেশির ভাগ বলছে ডিড কুইমবি, ফেড শুনছে,

মাঝে মাঝে জবাব দিচ্ছে।

পুবের আরও দুটো ব্লক পেরোল ওরা, একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না। উত্তরে মোড় নিয়ে একটা গলিতে নামল। পথের পাশে গুদাম আর দোকানের সারি—মাছ আর মাছ ধরার সরঞ্জাম বিক্রি হয় ওগুলোতে। সবই এখন বন্ধ, অন্ধকার। খানিক দূরে একটা বড় পুরনো হোটেল। আলো খুব কমই বেরোচ্ছে। জানালাগুলোতে সবুজ পর্দা। নিচতলায় এক জায়গায় নিয়ন সাইন জ্বলছেঃ দ্য গ্রীন ফিশ বার।

বারের ভেজানো পাল্লা টান দিয়ে খুলল ফেড। দরজা খোলা পেয়ে বাইরে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল যেন ভেতরের কোলাহল আর জোরাল মিউজিক। ভেতরে ঢুকল দু'জনে। পাল্লা বন্ধ হয়ে যেতেই হট্টগোলও শোনা গেল না আর।

একটা গুদামের ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইল রবিন, দ্বিধায় ভুগছে। এতরাতে বারে ঢুকবে? জায়গাটাও সুবিধের মনে হচ্ছে না, বাজে লোকের আড্ডা বোঝা যায়। জেলে আর নাবিকদের শুঁড়িখানার বদনাম অনেক শুনেছে সে। তার যা বয়েস, ভেতরে ঢোকামাত্র সবার চোখ পড়ে যাবে। কিন্তু এখানে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকারও কোনও মানে হয় না। কুইমবিরা কখন বেরোবে, আদৌ বেরোবে কিনা জানে না। ওরা কি করছে ভেতরে?

রবিনের পরনে গাঢ় রঙের সোয়েটার, প্যান্ট আর সাধারণ জুতো। হয়ত জেলের ছেলে বলে নিজেকে চালিয়ে দিতে পারবে; কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে বাবাকে খুঁজতে এসেছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে। পথ পেরোল। কাঁপা হাতে হাতল ধরে টান দিয়ে খুলল পাল্লা, কান ঝালাপালা করে দিল কোলাহল।

ভেতরে আলো এমনিতেই কম, তার ওপর সিগারেটের ধোঁয়া, কেমন যেন রহস্যময় করে তুলেছে ঘরের পরিবেশ। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। অথচ ঘর-ভর্তি কর্কশ চেহারার মানুষগুলোর কোনও অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হয় না।

'এই ছেলে, এই, এখানে কি?' ময়লা প্যান্ট আর তেল-চিটচিটে ক্যাপ পরা অস্বাভাবিক মোটা এক লোক হৈ-হৈ করে এগিয়ে এল।

'আ-আমি···আমি··,' কথা আটকে গেল রবিনের।

'কিচ্ছু শুনতে চাই না। বাচ্চাদের জায়গা নয় এটা। যাও, ভাগো।'

ঢোক গিলে পিছিয়ে এল রবিন। বুকে হাত রেখে তাকে ঠেলে বের করে দিয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা। নিজের ওপরই রাগ হল রবিনের। সময় তো কিছুটা পেয়েছিল। কেন একটা বিশ্বাসযোগ্য গল্প বানিয়ে বলতে পারল না? হতাশ চোখে তাকাল দরজাটার দিকে। আর ঢুকতে পারবে না ওপথে। মোটা

লোকটাকে আর কোনও কথাই বিশ্বাস করানো যাবে না এখন।

ফিরে শূন্য নির্জন পথের ওপর চোখ বোলাল রবিন। হোটেলের একপাশে, বন্দর থেকে দূরে, আরেকটা গলিপথ দেখতে পেল। ছোট একটা সাইনবোর্ড নির্দেশ করছেঃ দ্য গ্রীন ফিশ ডেলিভারিজ। দ্রুত হেঁটে গলির মুখে চলে এল সে। হোটেলের জিনিসপত্র এপথে আনা-নেয়া করা হয়, তার মানে ঢোকার পথ নিশ্চয় আছে।

সরু, অন্ধকার গলি। সাবধানে এগোল রবিন। পথের দু'ধারে দেয়াল, একটা জানালাও নেই। হোটেলের পেছনে এসে তীক্ষ্ণ মোড় নিয়েছে পথটা, শেষ হয়েছে একটা দোরগোড়ায়। দরজার ওপরে একটা কম পাওয়ারের বালব জ্বলছে, দু'ধারে অসংখ্য ড্রাম আর পিপা।

দরজায় তালা নেই।

'এখানে কি করছ?' ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল খসখসে কণ্ঠ।

'আমি…আমি…,' বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প বানানর চেষ্টা করছে মুসা। সত্যিই তো, এখানে কি করছে, কি জবাব দেবে লোকটাকে?

'কি হল? চুপ কেন?' আবার ধমক দিল লোকটা। 'চুরি করতে এসেছ? জলদি বল।'

বোটের পেছনে একটা ছায়া নড়তে দেখল মুসা। এগিয়ে আসছে। চিনতে পারল লোকটাকে, শোহো। দূর থেকেই হেসে বলল, 'মিস্টার কারটারের বন্ধু। পাহারা দিতে এসেছে।'

'কী?' বলল মুসার পেছনের লোকটা, যে তাকে ধরে রেখেছে। 'এই শোহো, ব্রিজের লাইটটা জ্বাল তো।'

আলো জ্বেলে দিল শোহো। কাঁধ চেপে ধরেই মুসাকে নিজের দিকে ঘোরাল লোকটা। দাড়িওয়ালা ক্যাপ্টেন, পেক, পরনে সেই ভারি জ্যাকেট, মাথায় নেভি অফিসারের বাতিল ক্যাপ। মুসার কাঁধ থেকে হাত সরাল ক্যাপ্টেন। 'সেই তিনজনের একজন না? হ্যাঁ, চিনেছি। নামটা যেন কি?'

'মুসা আমান, স্যার।'

'ও-কে, আমান, এখন বলে ফেল তো, কি পাহারা দিতে এসেছ?'

এখানে কেন এসেছে দ্রুত খুলে বলল মুসা। কিশোরের সন্দেহের কথাও জানাল।

'দুই হাজার পাউণ্ড!' চমকে গেল ক্যাপ্টেন। 'অসম্ভব! ইমপসিবল! এত ভারি জিনিস এই বোটে এনে লুকাতেই পারে না। আমার চোখ এড়িয়ে তো নয়ই।'

'শুনলে বিশ্বাস হতে চায় না, ক্যাপ্টেন, ঠিক,' বিশেষ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। 'কিন্তু কিশোর বলেছে, এটাই তেল নষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ। আর কিশোর যখন বলেছে, অবিশ্বাস্য হলেও বিশ্বাস করতেই হবে।'

কি ভাবল ক্যাপ্টেন। তারপর বলল, 'তোমার বন্ধুর কথায় যুক্তি আছে, মানতেই হয়। তবু...'

'ক্যাপ্টেন,' বাধা দিয়ে বলল মুসা। 'একটু আগে ডিড আর ফেড কুইমবিকে বোটে উঠতে দেখলাম। হাতে কিছু ছিল না। তবে বোটে উঠে কোনভাবে কোনও জিনিস তুলেও থাকতে পারে। শোহো, কিছু দেখেছ?'

'শব্দ শুনেছি। দেখিনি। মিস্টার কারটার বললেন লুকাতে, লুকিয়ে থাকলাম। বেরোইনি।'

'আরও একজনকে দেখেছি। কে, চিনতে পারিনি। ও বোটে ওঠেনি। তবে এদিকেই ঘুরঘুর করছিল, বোধহয় নজর রাখছিল।'

'বোটে এখুনি খোঁজা দরকার,' বলল ক্যাপ্টেন। 'এস, দেখি।'

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে নিচের ডেকে নামল মুসা। হাতঘড়ি দেখল, সাড়ে এগারটাও বাজেনি। মাঝরাত, অর্থাৎ বারোটার পর থেকে ক্যাপ্টেনের পাহারা দেয়ার কথা। এত আগেই চলে এল কেন?

তৃতীয় লোকটার পিছু নিয়ে, হারবার বুলভার পেরিয়ে একটা গলিতে এসে পড়ল কিশোর। পুরনো হোটেলটার সামনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল লোকটা। লাল-নীল নিয়ন আলোয় এই প্রথম লোকটার চেহারা দেখতে পেল কিশোর।

লুক হারডিন, তেল কোম্পানির ম্যানেজার।

বারের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিধা করছে হারডিন। ঢুকবে কিনা ভাবছে হয়ত। ঢুকল না। ঘুরে চলে গেল হোটেল আর আরেকটা বাড়ির মাঝের গলির দিকে।

রবিন আর কুইমবিদের ছায়াও দেখতে পেল না কিশোর। নীরব, নির্জন পথ। তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল ম্যানেজার যে গলিতে ঢুকেছে, সেদিকে।

গলিতে ঢুকে আর দেখতে পেল না হারডিনকে। গেল কোথায়?

পা টিপে টিপে এগোল কিশোর। দেয়ালের ছায়ায় মিশে। দুরু দুরু করছে বুক। হারডিন বুঝে ফেলেনি তো? ঘাপটি মেরে নেই তো কোথাও?

হোটেলের পেছনে মোড়ের কাছে চলে এল কিশোর। নেই, ম্যানেজার নেই। ঘটলও না কিছু। সোজা হয়ে চলার সাহস হল না আর তার, বসে পড়ে চুপ করে রইল এক মুহূর্ত। তারপর চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে এগোল ধীরে, অতি ধীরে।

দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, কান খাড়া।

কিছু দূর এগিয়ে পথ শেষ। সামনে যাওয়ার উপায় নেই, বন্ধ।

কাউকে দেখা গেল না।

কি জানি কি মনে হল, হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। দৌড় দিল সামনের ড্রাম আর পিপাগুলোর দিকে। ওগুলোর কোনটার আড়ালে লুকিয়ে পড়েনি তো ম্যানেজার? সন্দিহান চোখে তাকাল দরজাটার দিকে; নাকি ওই দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেছে?

ড্রাম আর পিপাগুলোর দিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে দরজার দিকে এগোল সে। হাতলে সবে হাত রেখেছে, শোনা গেল অদ্ভুত একটা কণ্ঠঃ 'কিশোর···পাশা···সাবধান!'

পাঁই করে ঘুরল কিশোর।

নির্জন পথ।

'সাবধান···কিশোর···পাশা···খবরদার!'

কোথা থেকে আসছে কথা, কিছুই বোঝা গেল না।

'কে? কে কথা বলছ?' কাঁপছে কিশোরের কণ্ঠ। 'আমি ভূত বিশ্বাস করি না···'

'কর না? ···এবার করতে হবে···!' খিকখিক করে হাসল ভূতুড়ে কণ্ঠটা।

অবাক হয়ে দেখল কিশোর, মাত্র তিন মিটার দূরে একটা বড় পিপার মুখ ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে ওপরে।

নয়

ম্লান আলোয় আবছা দেখা গেল ঢাকনার নিচের মুখটা। আরেকবার ভূতুড়ে হাসি হেসে প্রায় ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর, কেমন আছ, কিশোর পাশা?'

'রবিন!' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। 'মজা করার সময় নয় এটা, রবিন···'

'সরি, কিশোর,' পিপা থেকে বেরিয়ে আসছে রবিন। 'লোভ সামলাতে পারলাম না। ভয় যে তুমিও পাও, শিওর হয়ে নিলাম,' হাসল সে।

কিশোরও হাসল, তবে কেমন যেন তিক্ত দেখাল হাসিটা। নিজের ওপরই বিরক্ত হয়েছে। জিজ্ঞেস করল, 'ওখানে ঢুকেছিলে কেন?'

কাপড়ের ময়লা ঝাড়ল রবিন। 'কুইমবিরা বারে ঢুকে পড়ল। আমিও ঢুকলাম। বের করে দিল এক মোটা। ঢোকার আর কোনও পথ আছে কিনা খুঁজতে

খুঁজতে চলে এলাম এখানে। ওই দরজাটা দিয়ে ঢুকব কিনা ভাবছি, এই সময় পেছনে শুনলাম পায়ের আওয়াজ। তাড়াতাড়ি গিয়ে লুকালাম পিপার মধ্যে।'

'তোমাকে দেখেনি তো?'

'মনে হয় না। লোকটা কে, দেখতে পারলাম না। তবে দরজা খোলার শব্দ শুনেছি। নিশ্চয় ভেতরে ঢুকেছে।'

'লোকটা লুক হারডিন,' বলল কিশোর। সংক্ষেপে জানাল সব কথা।

'কুইমবিদের দলে ও-ও আছে নাকি? হতে পারে, দুই ভাই যখন বোটে উঠেছে, ম্যানেজার ওদের হয়ে পাহারা দিয়েছে।'

'কি জানি, হতেও পারে। বারে ঢুকতে পারলে হয়ত জানতে পারতাম।'

'ওটা বার না, কিশোর, নরক! আর মোটা লোকটার যা চেহারা! উচিত হবে না, বুঝেছ। চল, গিয়ে মিস্টার কারটারকে সব বলি।'

'সময় নেই। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলে দেখবে, এখান দিয়ে গেলে হয়ত দেখবে না। এস, ঢুকি।'

সাবধানে দরজা খুলল কিশোর। চট করে ঢুকে পড়ল দু'জনে। অন্ধকার সরু একটা করিডর। দুই পাশে অনেকগুলো স্টোর রুম। সামনে রান্নাঘর, গন্ধেই বোঝা যায়। তার ওপাশ থেকে ভেসে আসছে বারের হট্টগোল।

'রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে যাওয়া যাবে না,' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'না, তা যাবে না। দেখি, এই করিডরটা আর কোনও করিডরের সঙ্গে মিশেছে কিনা।'

পা পা করে এগোল ওরা, নিঃশব্দে। আরেকটা করিডর পাওয়া গেল, প্রথম করিডরটাকে আড়াআড়ি কেটেছে। এক পাশে রান্নাঘর। ডানে, দ্বিতীয় করিডরটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা দরজার গোড়ায়। দেখে মনে হল, দরজায় তালা লাগানো। আর বাঁয়ের করিডরের ওদিক থেকে আসছে বারের হৈ-চৈ।

'চল, কুইক,' বাঁয়ে দেখিয়ে বলল কিশোর। 'রান্নাঘর থেকে কেউ বেরোলেই দেখে ফেলবে।'

রান্নাঘরেও টুংটাং খুটখাট শব্দ হচ্ছে। ছেলেদের পায়ের আওয়াজ হলেও ঢাকা পড়ে গেল ওসব শব্দে। করিডরের মোড় ঘুরে সামনে শেষ মাথায় খোলা দরজা দেখা গেল, শুঁড়িখানায় ঢোকার। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, ম্লান আলোয় আলোকিত নিচু ঘরটায় ঢুকে পড়ল দু'জনে। দরজার ডান পাশে লম্বা একটা কোট-র‍্যাক, বেশ কিছু কোট আর জ্যাকেট ঝুলছে তাতে। ওগুলোর আড়ালে লুকিয়ে পড়ল ওরা। ফাঁক দিয়ে তাকাল।

ডান পাশে বার, সামনে কয়েকটা টুল। বাকি ঘরটায় অনেকগুলো টেবিল–

চেয়ার, সব বোঝাই। সবাই চেঁচাচ্ছে, যেন কে কত চেঁচাতে পারে সেই প্রতিযোগিতা। রবিনের ভীতদৃষ্টি খুঁজছে মোটা লোকটাকে। ঘুরতে ঘুরতে ঘরের মাঝখানে একটা টেবিলের ওপর গিয়ে পড়তেই কনুই দিয়ে গুঁতো দিল কিশোরের পাঁজরে।

কিশোরও দেখল। ফেড আর ডিডের সঙ্গে বসেছে লুক হারডিন। ম্যানেজার কথা বলছে, অন্য দু'জন শুনছে। বীয়ার খাচ্ছে তিনজনেই।

'শোনা দরকার,' কিশোর বলল। 'আরও কাছে যেতে হবে।'

'পাগল! দেখতে পেলে ঘাড় ধরে বের করে দেবে।'

'ঝুঁকি নিতেই হবে। আলো তেমন নেই, দেখবে না। দেয়ালের ধার ধরে এগোব, ভিড়ের মধ্যে খেয়াল করবে না আমাদেরকে।'

রবিন আর প্রতিবাদ করার আগেই র‍্যাকের আড়াল থেকে বেরিয়ে গেল কিশোর। বাঁয়ের দেয়াল ঘেঁষে এগোতে শুরু করল। রবিনও বেরোল। চোখ দুই কুইমবি আর ম্যানেজারের দিকে।

হঠাৎ উঠে ঠেলে পেছনে চেয়ার সরাল হারডিন।

'ম্যানেজার চলে যাচ্ছে,' কিশোরের কানে কানে বলল রবিন।

দরজার দিকে রওনা হয়েও কি ভেবে বারের দিকে ফিরল হারডিন। ঘুরে গিয়ে দাঁড়াল বারের কাছে, কালচে স্যুট পরা, বেঁটে, টাকমাথা একজন লোকের পাশে।

'আরি, জাপানীটা!' আবার ফিসফিস করল রবিন।

'হ্যাঁ, চিকামারা,' নরম গলায় বলল বটে কিশোর, কণ্ঠের উত্তেজনা চাপতে পারল না। 'তেলের ব্যবসা ছাড়াও আরও কিছু করে মনে হয়?'

'কি জানি, এমনিই হয়ত এসেছে।'

'এটা একটা সাধারণ শুঁড়িখানা, ট্যুরিস্ট স্পট নয়। ওই দেখ, ওদের দিকেই চেয়ে রয়েছে ফেড আর ডিড।'

গভীর আগ্রহে দু'জনের দিকে চেয়ে আছে দুই ভাই। ডিড যেন ওঠার কথা ভাবছে।

'এই, এই ছেলেরা, এখানে কি?...এই...' পাহাড়ের মত কিশোরের সামনে দাঁড়িয়ে গেল মোটা লোকটা। কোথা থেকে যে উদয় হল, বুঝতেই পারল না দুই গোয়েন্দা। রবিনের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই তোমাকে না একবার বের করে দিয়েছিলাম। আবার ঢুকেছ। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা...'

'আমাদের কাছে এসেছে, পিরানো,' পেছন থেকে বলল কঠিন একটা কণ্ঠ। 'ওদের জন্যেই বসে ছিলাম।'

পাহাড়ের পেছন থেকে পাশে সরল লাল টুপি পরা ডিড কুইমবি, ছেলেদের

দিকে চেয়ে হাসল।

সন্দেহ জাগল মোটার চোখে। বলল, 'কুইমবি, এখানে বাচ্চাদের ঢোকা নিষেধ।'

'তা তো নিশ্চয়,' তর্ক করল না ডিড। 'তবে ওরা বেশিক্ষণ থাকবে না। আমাদের জন্যে একটা খবর নিয়ে এসেছে। বলেই চলে যাবে।'

'হ্যাঁ, স্যার,' পিরানোর দিকে চেয়ে বলল কিশোর। 'জরুরী খবর।'

'এস,' বলে টেবিলের দিকে এগোল ডিড।

জ্বলন্ত চোখে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে রইল পিরানো, কাঁধ ঝাঁকাল অবশেষে। 'কুইমবি, জলদি জলদি বের করে দেবে বলে দিলাম।' ঘরের ধোঁয়াটে অন্ধকারে হারিয়ে গেল সে।

বারের দিকে তাকাল কিশোর। রবিনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'হারডিন আর চিকামারা চলে গেছে।'

মাথা ঝাঁকাল শুধু রবিন।

কুইমবিদের টেবিলে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসল দুই কিশোর। স্থির চোখে ওদের দিকে চেয়ে বলল ফেড, 'বিপদে পড়তে তো। এখানে এসেছ কেন? কারটারকে খুঁজতে? এদিকেই কোথাও আছে নাকি?'

'আমাদের চিনলেন কিভাবে, মিস্টার কুইমবি?' জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'তোমরা আমাদের যেভাবে চিনেছ। জেটিতে কারটারের সঙ্গে ছিলে, দেখেছি তখন।'

ডিড হাসল। 'কারটার নিশ্চয় খুব খেপে আছে আমাদের ওপর, তাই না? কি একখান কাণ্ডই না তখন ঘটল।' হাসি মুছে গেল দ্রুত। 'ওই তেল কোম্পানির লোকগুলো আস্ত বজ্জাত, দেখলেই গা জ্বলে যায় আমার।'

'তাহলে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বললেন কেন?' বলেই ফেলল রবিন। 'আপনার পিছু নিয়েছিল কেন ও...?' কিশোরের দিকে চেয়ে লাল হয়ে গেল গাল, ঠোঁট কামড়ে ধরল। বুঝল, বলে বোকামি করে ফেলেছে।

'ও!' ডিড বলল। 'ডলফিনেও কারটারকে খুঁজতে গিয়েছিলে তাহলে? আমরাও গিয়েছিলাম, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলতে। ওকে পেলাম না। তখনই দেখলাম, ওখানে ঘুরঘুর করছে ম্যানেজারটা। শুনেছি, বোটটায় নাকি তেলের গোলমাল হচ্ছে। স্যাবোটাজ। হারডিনকে সন্দেহ হল, পিছু নিলাম তার।'

'সারা শহর নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাল আমাদের, ব্যাটা,' বলল ফেড। 'তারপর ফিরে এল আবার বন্দরে, তেল কোম্পানির জেটিতে গেল। ওখানে একটা নৌকায়

উঠে দাঁড় বেয়ে চলল ম্যারিনার ধার দিয়ে। কিনার দিয়ে ওকে অনুসরণ করে চললাম। বেশিক্ষণ পারলাম না। একটু পরেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল ও। কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারলাম কোথায় গিয়েছে।'

ফেড থামতেই শুরু করল অন্য ভাই, 'সোজা চলে গেলাম ডলফিনের কাছে, নজর রাখলাম। কাউকে না দেখে উঠে গেলাম বোটে। সন্দেহ হতে পারে এমন কিছুই দেখতে না পেয়ে আবার নেমে এলাম।'

'আপনাদেরকে তখনই দেখেছি আমরা,' জানাল কিশোর। 'পিছু নিয়ে এখানে এসেছি।'

'তারপর,' আগের কথার খেই ধরল ডিড। 'এখানে এসে হাজির হল হারডিন। বলল, ডলফিনে উঠতে দেখেছে আমাদের। কিছু দেখেছি কিনা জিজ্ঞেস করল। কেন করেছে, সে তো বুঝতেই পেরেছি, তাই পিছু নেয়ার কথা আর বললাম না। মিথ্যে করে বললাম, মিস্টার কারটারের একটা জিনিস বোটে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস করেছে কিনা কে জানে। তবে আমরা শিওর, তলে তলে কিছু একটা করছে সে।'

মাথা দোলাল কিশোর। 'আর, মিস্টার চিকামারার ব্যাপারটা কি?'

'কে?' ভুরু কোঁচকাল ফেড।

'এই,' ভাইয়ের দিকে তাকাল ডিড। 'ও নিশ্চয় জাপানীটার কথা বলছে। হারডিন যার কথা বলছিল। জেটিতে ডেলটনের সাথে ছিল যে টাকমাথা বুড়োটা। তেল কোম্পানির হয়ে ও ব্যাটাও হয়ত কোনও শয়তানীর তালে আছে।'

'থাকলে অবাক হব না,' বলল ফেড। 'যেখান থেকেই আসুক, ওই তেলের ব্যবসায়ীগুলো সবাই এক, মহা-শয়তান।'

'হ্যাঁ,' ভাইয়ের কথার সমর্থন করল ডিড, পেছনে ফিরে তাকাল। ছেলেদেরকে বলল, 'তোমরা এখন চলে যাও। যা যা বললাম, সব গিয়ে বল কারটারকে। ঠিক আছে?'

'বলব,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'এস, রবিন।'

শ্বাসরুদ্ধকর ধোঁয়া আর প্রচণ্ড হট্টগোল থেকে রাস্তায় বেরিয়ে হাঁপ ছাড়ল দু'জনে। বন্দরের দিকে রওনা হল।

'ওদের কথা বিশ্বাস করেছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'জানি না,' আনমনে বলল কিশোর। 'হয়ত সত্যিই বলেছে। রহস্যময় আচরণ করেছে ম্যানেজার, এটা ঠিক। শিওর হওয়া দরকার।

কি 'শিওর' হওয়া দরকার, সেটা আর জিজ্ঞেস করল না রবিন। দ্রুত পায়ে ম্যারিনার দিকে এগিয়ে চলল দু'জনে।

দশ

জোরে জোরে মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন পেক। 'কিছুই নেই এই বোটে। ভারি, হালকা, কিছু নেই।' সামনের রেলিঙে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। কাছেই নিচু একটা হ্যাচের ওপর বসেছে মুসা। শোহো দাঁড়িয়ে রয়েছে, কারও দিকেই তাকাল না ক্যাপ্টেন। বলল, 'তাছাড়া বোটে ওরকম ভারি কিছু লুকিয়ে রাখার জায়গাই নেই।'

নিজের চোখে দেখেছে মুসা, তবু বিশ্বাস করতে পারছে না। 'কিন্তু কিশোর যে বলল...,' থেমে গিয়ে কান পাতল। 'কারা জানি আসছে!'

'চুপ!' সাবধান করল ক্যাপ্টেন।

খানিক পরে দুটো আলো দেখা গেল। একটা খুদে ক্রস, আরেকটা ত্রিভুজ।

'রবিন,' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'কিশোর! আমরা।' বলতে বলতেই নিজের টর্চ জ্বেলে সঙ্কেত দিল মুসা।

এগিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। বোটে উঠল।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আলো জ্বেলে বসে আছ? কেউ দেখলে...'

'আমাকে চোর মনে করে ধরেছিলেন ক্যাপ্টেন,' বলল মুসা। 'তারপর চিনতে পারলেন। সব কথা খুলে বলতে পুরো বোটটায় খুঁজে দেখলেন। কিছু নেই।

'তোমরা যে নজর রাখছ, বলা হয়নি আমাকে,' অনুযোগের সুরে বললেন ক্যাপ্টেন। 'পাহারা দিতে এসেছিলাম। আমি ওঠার পর পরই মুসা উঠল...'

'আবার কে?' বলে উঠল শোহো।

এগিয়ে আসছে পায়ের আওয়াজ। ডলফিনের ছড়িয়ে পড়া আলোয় দেখা দিলেন মিস্টার কারটার। বোটে উঠে এলেন। উত্তেজিত। 'সব ঠিক আছে? তোমরা? শোহো?'

'আমরা ভালই আছি, স্যার,' জবাব দিল কিশোর। 'কিন্তু আপনার তো বাড়িতে থাকার কথা।'

'বারোটার পর ফিরে যাওয়ার কথা শোহোর। একটা বেজে গেছে, খবর নেই। চিন্তা হল। বসে থাকতে পারলাম না আর।'

কারটার চলে যাওয়ার পর যা ঘটেছে, খুলে বলল গোয়েন্দারা। বোটে খুঁজে দেখা হয়েছে, একথা জানাল ক্যাপ্টেন।

'কিচ্ছু পাওয়া যায়নি?' ভুরু কোঁচকালেন কারটার।

'কিচ্ছু না,' মুখ গোমড়া করে রেখেছে পেক।

'কুইমবিদের পিছু নিয়ে গ্রীন ফিশে গিয়েছিল হারডিন?'

'হ্যাঁ, স্যার,' রবিন বলল। 'আর শুধু ম্যানেজারই না, চিকামারাও গিয়েছিল।'

'কুইমবিদের গল্প বিশ্বাস করেছ?'

'শিওর না এখনও,' বলে শোহোর দিকে ফিরল কিশোর। 'ডলফিনে কাউকে উঠতে দেখেছ, পানির দিক থেকে? কুইমবিরা ওঠার আগে?'

মনে মনে শব্দ সাজিয়ে নিল শোহো। 'দুই জনই, একই সময়ে। আর কাউকে না। ভাল দেখিনি। সরি।'

'কিশোর,' মুসা বলল। 'পানির দিকে চোখ রেখেছিলাম আমি। কোনও বোট-টোট দেখিনি।'

'তার মানে মিছে কথা বলেছে,' জ্বলে উঠলেন কারটার। 'ডলফিনে শয়তানীটা ওই দুই ভাই-ই করছে।'

'না-ও হতে পারে,' ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'শোহো বলছে, অন্ধকারে ভালমত দেখতে পায়নি, লুকিয়ে আর কেউ উঠে থাকলেও তার চোখে পড়েনি। নৌকা দূরে কোথাও রেখে সাঁতরে এসে উঠে থাকতে পারে হারডিন। মুসা নজর রেখেছে বোটের এক পাশে, অন্য পাশ দিয়ে কিংবা পেছন থেকে উঠলে তার চোখে পড়ার কথা নয়।'

'হুঁ, ঠিকই বলেছ,' মাথা দোলালেন কারটার। 'হারডিন ভাল ডাইভার। ওয়েটস্যুট পরে পানির নিচ দিয়েও এসে থাকতে পারে। আর অন্ধকারে কালো স্যুট পরা একজন মানুষকে না দেখতে পাওয়াটাই স্বাভাবিক।'

'কিন্তু,' রবিন যুক্তি দেখাল। 'বোটে কেউ কিছু রাখেনি। নৌকা নিয়ে যদি এসেও থাকে হারডিন, বোটে ওঠেনি সে। অন্তত কিছু রাখার জন্যে ওঠেনি।'

'রাখবে কিভাবে? এত ভারি জিনিস এই বোটে লুকিয়ে রাখার জায়গা কোথায়?' ঘড়ি দেখলেন কারটার। 'যাকগে। এখন ওসব আলোচনা না করে ঘুমোতে যাই, চল। আজ আর কারও পাহারা দেয়ারও দরকার নেই। সকালে বোট ছাড়ার আগে আরেকবার খুঁজে দেখলেই হবে। আমরা যাওয়ার পর যদি কেউ কিছু রাখেও, পেয়ে যাব।'

শোহোকে নিয়ে বোট থেকে নেমে গেল ক্যাপ্টেন। ডেকে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেরা। আলো নিভিয়ে ব্রিজে তালা দিতে গেলেন কারটার। রেলিঙে ভর দিয়ে কালো পানির দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। হঠাৎ ঘুরল সে, চোখ বড় বড়। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'বোটের ভেতরে নেই, কিন্তু নিচে তো থাকতে পারে!'

ফিরে আসছিলেন কারটার, গোয়েন্দা সহকারীর কথা শুনে থমকে দাঁড়ালেন। রবিন আর কিশোরও চেয়ে রইল তার দিকে।

'মানে,' আবার বলল মুসা। 'তলায় লাগিয়ে দেয়া যেতে পারে কোনভাবে।'

'এবং,' তুড়ি বাজাল রবিন। 'কুইমবিরা দুই ভাই আর হারডিন, তিনজনেই ভাল ডাইভার।'

'মুসা,' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'ঠিক বলেছ তুমি!'

'ওদের কেউ লটকে থাকে না তো?' রবিনের প্রশ্ন।

মাথা নাড়ল মুসা। 'না, খুব ছোট। পানির তলায় ওজনও কমে যায়। তাছাড়া বোট চলার সময় ধরে রাখতে পারবে না। হুকটুক কিছু লাগিয়ে যদি ধরে রাখেও, পানির টানে মাস্ক আর ট্যাংক ছিঁড়ে চলে যাবে।'

'কিন্তু বোটের তলায় কে কি লাগাবে?' নিজেকেই যেন প্রশ্নটা করলেন লেখক। 'কেন?'

'কোনও ধরনের শ্রবণ-যন্ত্র?' রবিন বলল। 'তেল কোম্পানির লোকেরা যাতে আপনাদের সব কথাবার্তা শুনতে পায়?'

'মনে হয় না,' বলল মুসা। 'তবে বড় ক্যামেরা-ট্যামেরা হতে পারে।'

'কিন্তু তা-ই বা লাগাতে যাবে কেন?' ভুরু নাচালেন কারটার। 'এমন কিছু করি না আমরা, যা শোনা কিংবা দেখার দরকার হতে পারে ওদের। প্ল্যাটফর্মে যাই, প্রতিবাদ জানাই, ফিরে আসি, ব্যস।'

চুপচাপ কি ভাবছিল কিশোর, বলে উঠল, 'ওসব কিছু নয়। হয়ত গোপনে কেউ কিছু প্ল্যাটফর্মে নিয়ে যায়, কিংবা নিয়ে আসে। যা আনতে ভারি কনটেইনার দরকার। বেআইনী কোনও জিনিস। কাজটা করা হয় ডুবুরির সাহায্যে।'

'স্মাগলিং!' একসাথে চেঁচিয়ে উঠল মুসা আর রবিন।

মাথা ঝোঁকাল কিশোর। 'হয়ত গভীর সমুদ্রের দিক থেকে আসা জাহাজ থেকে জিনিসগুলো এনে প্রথমে তোলা হয় প্ল্যাটফর্মে, ওখান থেকে তীরে আনার জন্যে ব্যবহার করা হয় ডলফিনকে।'

'কিন্তু আমাকে কেন? আমার বোট কেন বেছে নিল?'

'যেহেতু আপনি বিরোধী দলের নেতা। রোজই প্ল্যাটফর্মে যান, ব্যতিক্রম হয় না। এ-জন্যেই আপনার নোটবুক দেখছিল সেই লোকটা, আপনার স্টাডিতে ঢুকে, শিডিউল জানার জন্যে। কখন যান, কখন আসেন।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন লেখক। 'আর পুলিশ আমার বোটের নিচে খোঁজার কথা কল্পনাও করবে না! কী চালাকি!'

'নিখুঁত কাজ!' সুর মেলাল রবিন।

'পয়লাবার বোধহয় টেস্ট রান ছিল ওদের, খালি কনটেইনার লাগিয়েছিল। পরীক্ষা করে দেখেছে, কাজ হয় কিনা। ওজন কম থাকায় তীরে পৌঁছতে

পেরেছিলাম সেবার। তার পর থেকে কনটেইনার ভরে দিয়েছে, ওজন বেড়েছে, তেল ফুরিয়ে গেছে আগেই।'

'হারডিনের ওপর সন্দেহ বাড়ছে আমার,' ধীরে ধীরে বলল কিশোর। 'প্ল্যাটফর্মে যেতে পারে ও। বিরোধী দলের লোক নয়, আবার বিরোধীদের বিপক্ষেও কথা বলে না। আচার-আচরণ রহস্যময়। স্মাগলিং ওকে দিয়ে সম্ভব।'

'চিকামারা হয়ত পুলিশের লোক,' মুসা বলল। 'কিংবা গোয়েন্দা। খেয়াল কবনি তার দিকে কি চোখে তাকায় হারডিন?'

'তাহলে,' কারটার বললেন। 'সকালে উঠে আমাদের প্রথম কাজ হবে, হারডিনকে ধরে জিজ্ঞেস করা।'

'না,' বলল কিশোর। 'তার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। তবে আজ রাতে প্রমাণ যদি জোগাড় করতে পারি...'

'কি বলছ তুমি, কিশোর?' বাধা দিল মুসা। 'কিভাবে?'

'বোটের তলায় দেখে। স্যার, বোটে ডুবুরির পোশাক আছে?'

'না। আমারটা আমার বাড়িতে। নিয়ে আসব?'

'তাহলে মুসাকে সঙ্গে নিয়ে যান, স্যার। হয়ত ওর গায়ে লাগতে পারে। লাগলে ও-ই নামবে বোটের তলায়।'

চলে গেল দু'জনে।

বোটে অপেক্ষা করছে রবিন আর কিশোর। ঠাণ্ডা বাড়ছে। ম্যারিনায় বার্থে ভাসছে জাহাজ, নৌকা, মৃদু ঢেউয়ে দুলছে, বিচিত্র শব্দ করছে গায়ে গায়ে ঘষা লেগে, কেমন যেন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে ওগুলোকে অন্ধকারে। আওয়াজ একটু জোরে হলেই চমকে উঠছে দুই কিশোর।

মুসাকে নিয়ে কারটার যখন ফিরে এলেন, ঠাণ্ডা আর অস্বস্তিতে প্রায় দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছে তখন কিশোর আর রবিনের। এতই উত্তেজিত হয়ে আছে মুসা, দু'জনের এই অবস্থা খেয়ালই করল না। দ্রুত পরে নিল ওয়েটস্যুট। পিঠে এয়ার-ট্যাংক বেঁধে, ব্রীদিং টিউব কামড়ে ধরল। আউটবোর্ড রেলিঙের ওপর বসে সাগরের দিকে পেছন করে আস্তে ছেড়ে দিল শরীরটা। ভারি পাথরের মত পড়ল পানিতে, চোখের পলকে হারিয়ে গেল টর্চের আলো থেকে।

ওপরে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছেন কারটার, কিশোর আর রবিন। আলো নিভিয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝেই দেখছে, পানির নিচে বোটের সামনে থেকে পেছনে, পেছন থেকে সামনে সরে সরে যাচ্ছে মুসার আণ্ডার-ওয়াটার টর্চের আলো। তারপর এক সময় উঠতে শুরু করল ওপরের দিকে, ভুশ করে মাথা তুলল মুসা। বন্ধুদের সহায়তায় উঠে এল ডেকে। হ্যাচের ওপর বসে পড়ে মুখ থেকে মাস্ক খুলে

নিল।

'কিচ্ছু নেই,' বলল সে। 'কনটেইনার না, হুক না। কোনও কিছু ছিল, এমন কোনও চিহ্নও নেই। ধাতব, মসৃণ তলা, কিশোর। হুক লাগানর জায়গাই নেই।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার গোয়েন্দাপ্রধান। 'অলরাইট, সেকেণ্ড। হারডিনের ব্যাপারে হয়ত ভুল করেছি আমরা, তবে আমি শিওর, সঠিক পথেই এগোচ্ছি। চল, বাড়ি যাই। ঘুম পেয়েছে। ঘুমিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করে নিই, তারপর ফাঁদ পাতব কাল সকালে।'

এগার

উজ্জ্বল রোদ উঠল পরদিন সকালে। মোটেলের কামরায় গুটিসুটি হয়ে পাশ বালিশটা টেনে নিল মুসা, উঠতে ইচ্ছে করছে না। চোখে রোদ লাগতে এক গড়ান দিয়ে বালিশের খাঁজে মুখ লুকাল কিশোর। চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'দূর, পর্দাগুলো যে কেন টেনে রাখে না!'

হেসে ফেললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'এই ওঠ ওঠ, সাতটা বেজে গেছে। নাস্তা খাবে না?'

গুঙিয়ে উঠল মুসা। চোখ মেলে মিটমিট করল। তারপর লাফ দিয়ে উঠে বসল বিছানায়। দুই বন্ধুকে ডাকল, 'এই ওঠ, জলদি কর। সকাল হয়ে গেছে।'

আবার হেসে বেরিয়ে গেলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

আর শুয়ে থাকতে পারল না রবিন আর কিশোর। টেনেটুনে তুলল ওদেরকে মুসা। হাতমুখ ধুয়ে সেইলিঙের উপযোগী মোটা পোশাক পরে নেমে এল মোটেলের কফি শপে। অনেক রাতে শুয়েছে, চোখ থেকে ঘুম যায়নি পুরোপুরি। নাস্তা খেতে খেতে আলোচনা চলল রবিনের বাবার সঙ্গে।

'স্মাগলার, না?' বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'হ্যাঁ, যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে। কিন্তু খুব সাবধানে কাজ করবে। ভীষণ বিপদে পড়বে নাহলে।'

'ভয় নেই, আংকেল,' মুখে এত বেশি খাবার পুরেছে মুসা, কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে। 'মিস্টার কারটার আর ক্যাপ্টেন পেক থাকবেন আমাদের সাথে।'

'ভাল। রবিন, কয়েক ঘন্টার জন্যে থাকতে পারবে?'

'থাকতেই হবে, বাবা?'

'একটা ইমপরটেন্ট ইন্টারভিউ আছে, আমাকে চলে যেতে হচ্ছে সেখানে। কাল যে ইন্টারভিউগুলো টেপ করে এনেছি, ওগুলো লিখতে হবে। টাইপিঙে তোমার স্পীড ভাল, বেশিক্ষণ লাগবে না। তাহলে আমার কাজ অনেকখানি এগিয়ে

যায়।'

'বেশ। করে দেব।'

নাস্তা শেষে তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন মিস্টার মিলফোর্ড। ঘরে গিয়ে ক্যাসেট রেকর্ডার, টেপ করা ক্যাসেট আর পোর্টেবল টাইপরাইটার নিয়ে বসল রবিন।

কারটারের বাড়ির দিকে হেঁটে চলেছে মুসা আর কিশোর। গিয়ে দেখল, ওদের জন্যেই বসে আছেন লেখক। আর দেরি করলেন না, দু'জনকে গাড়িতে তুলে নিয়ে বেরোলেন। ম্যারিনার দিকে চলতে চলতে আকাশে পেঁজা মেঘ দেখালেন। 'হারিকেনের লক্ষণ। এগিয়ে আসছে মেকসিকো থেকে। সকালের ওয়েদার রিপোর্ট শুনলাম, উত্তরে এগোচ্ছে ঝড়। বাজায় আঘাত হানেনি এখনও। সান্তা বারবারার কাছে সাধারণত আসে না হারিকেন, তবে আবহাওয়ার কথা কিছুই শিওর হয়ে বলা যায় না। কখন যে কি হয়ে যায়...বেরোনর আগে কোস্ট গার্ডদের সঙ্গে কথা বলে নিতে হবে।'

ম্যারিনায় পৌঁছে ক্যাপ্টেন পেককে নিয়ে বিরোধী দলের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন আগে কারটার। দুই গোয়েন্দার কানে এল ফেড আর ডিড কুইমবির গলা, উচ্চস্বরে কথা বলছে কয়েকজন নাবিকের সঙ্গে।

'আমরা এখন কি করব, কিশোর?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'এস আমার সাথে।' মুসাকে নিয়ে এসে ডলফিনে উঠল কিশোর। নিচে নেমে ডুবুরির পোশাকটা দেখিয়ে বলল, 'পরে নাও। এখানেই থাকবে। ডাকামাত্র উঠে চলে আসবে ওপরে।'

'বেশ,' কোনও প্রশ্ন না করে ওয়েটস্যুট পরতে শুরু করল মুসা।

ডেকে ফিরে এল কিশোর। রেলিঙে ভর দিয়ে নিরীহ ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল তীরের দিকে, যেখানে বিরোধীদের সঙ্গে কথা বলছেন কারটার। মিনিট পনেরো পর ফিরে এলেন পেককে নিয়ে। জানালেন, 'কোস্ট গার্ডরা বলছে, ঝড় এতদূর আসবে না। আর এলেও জোর থাকবে না। তা-ও আসতে আসতে আগামীকাল। আমাদের কাজের অসুবিধে হবে না। মুসা কোথায়?'

'নিচে,' নিচু কণ্ঠে বলল কিশোর। 'ওয়েটস্যুট পরে রয়েছে। রোজকার মতই রওনা হবে ডলফিন। মাঝপথে থেমে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ডাইভ দেবে মুসা। নিচে কিছু থেকে থাকলে দেখে আসবে।'

'ভাল বুদ্ধি করেছ। কাজ হতে পারে।'

ব্যানার তুলে ইতিমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে কয়েকটা বোট, আরও হচ্ছে।

ওগুলোর মাঝে কুইমবিদের কালো ফিশিং বোটটা দেখতে পেল কিশোর। লাল টুপি মাথায় দিয়ে হুইল ধরেছে ডিড। প্রতিটি বোট বালির চরাটার কাছে গিয়ে গতি কমাতে বাধ্য হচ্ছে, খাল দিয়ে খুব ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে ওপাশে।

ক্যাপ্টেনকে জাহাজ ছাড়ার নির্দেশ দিলেন কারটার।

এগিয়ে চলল ডলফিন। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল কারটারের সঙ্গে কিশোরের। চরা আর ম্যারিনার মাঝামাঝি দূরত্বে এসে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে, 'বোট থামান।'

ক্যাপ্টেনকে বলা হল। বোটের গতি কমতে শুরু করার আগেই মুসাকে ডাকল কিশোর।

উঠে এল মুসা। বোটের গতি কমে গেছে। প্রায় ছুটে গিয়ে রেলিঙ টপকে পানিতে ঝাঁপ দিল সে। হারিয়ে গেল পানিতে।

সময় কাটছে। রেলিঙের ধারে কিশোরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন কারটার। ক্যাপ্টেন ব্রিজে। কয়েক মিনিট পর জাহাজের অন্য পাশ থেকে মুসার ডাক শোনা গেল, 'কিশোর।'

ছুটে গেল কিশোর। 'কী?'

'কিছুই নেই...'

দেখে মনে হল, বাজ পড়েছে কিশোরের মাথায়। 'বল কি! ...আমি...আমি শিওর...'

'উঠে এস, মুসা,' শান্ত কণ্ঠে বললেন কারটার। ডেকে উঠতে তাকে সাহায্য করলেন তিনি। 'তোমরা আরও যেতে চাও?'

চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা।

প্রশ্নের জবাব দিল না কিশোর। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, 'ভুল করলাম...কেউ কিছু লাগায়নি বোটের তলায়?'

'হয়ত আমাদের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছে,' মুসা সান্ত্বনা দিল। 'কিংবা আজ ওদের ডেট নয়। কাল হয়ত...'

'হ্যাঁ,' উজ্জ্বল হল গোয়েন্দাপ্রধানের মুখ। 'আরেকটা সম্ভাবনা আছে। দুই ট্রিপে কাজ করে ওরা। প্রথম বারে কনটেইনার পাঠায় প্ল্যাটফর্মে, তাতে মাল ভরে, পরের বারে নিয়ে আসে। বোধহয় রেখে এসেছে, ফেরার পথে আনবে।'

'তাহলে তো আমাদের যাওয়াই উচিত।'

মাথা ঝাঁকালেন কারটার, তারপর এগোলেন ব্রিজের দিকে। ম্যারিনা থেকে ডাক শোনা গেল, 'ডলফিন! কারটার!'

পুলিশ ক্যাপ্টেন হ্যানস কারডিগো দাঁড়িয়ে আছেন জেটিতে। হাত নেড়ে

আবার বললেন, 'কারটার, এই কারটার, কালকের গোলমালের ব্যাপারে একটা মীটিং হবে আজ। মেয়র তোমাকে থাকতে বলেছেন।'

চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কারটার, 'ডেলটন আসছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আসছি,' বলে ক্যাপ্টেনের দিকে ঘুরলেন কারটার। 'ফেরাও। আমাকে নামিয়ে দিয়ে ওদের নিয়ে চলে যেও। আমি না থাকলেও প্রতিবাদ চলবে, সব বোটকে বলে দিও।' ছেলেদেরকে বললেন, 'তোমরাও আমার প্রতিনিধি হিসেবে যাবে।'

বার্থে পৌঁছল ডলফিন। লাফ দিয়ে তীরে নামলেন কারটার। ফিরে চেয়ে বললেন, 'মীটিং শেষ করে বাড়িতে চলে যাব। রেডিওতে যোগাযোগ রাখব তোমাদের সঙ্গে।'

আবার পিছিয়ে আসতে লাগল বোট। তারপর মুখ ঘোরাল। সরু খালটার কাছে এসে আরও দুটো বোটের পেছনে পড়ল। ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ও'দুটো। সাবধানে ডলফিনকে বের করে আনল পেক, সান্তা বারবারা চ্যানেলের রোদ ঝলমলে পানিতে পড়ল বোট।

আর কোনও বাধা নেই। দ্রুত ছুটে চলল। বড় বড় ঢেউ ভাঙছে গলুইয়ের তলায়, পানির ছিটে এসে পড়ছে ডেকে। আগের দিনের চেয়ে বাতাস বেশি আজ, ঢেউও বড়, জোরাল। ভীষণ দুলছে বোট। সামনের রেলিঙ আঁকড়ে ধরে রেখেছে কিশোর, চেহারা সামান্য ফ্যাকাসে। ঢোক গিলে বলল, 'ইস্, কি কাত হয়ে যাচ্ছে...'

'ঝড়ের সঙ্কেত,' ব্রিজ থেকে বলল পেক। 'হারিকেন আসার আগেই বাতাস এসে বসে আছে। তবে ঢেউ আমাদের আটকাতে পারবে না।'

'ওখানে গিয়ে কি করব আমরা, কিশোর?' মুসা জানতে চাইল। 'বার বার বোটের তলায় ডুব দিয়ে দেখব না নিশ্চয়?'

ভাবল কিশোর। তারপর বলল, 'না, দরকার হবে না। নিচে চলে যাব আমরা। এত বড় কনটেইনার লাগানর সময় ঘষার শব্দ হবেই। একেবারে শব্দ না করে পারবে না...'

'ওই দেখ,' ব্রিজ থেকে ডেকে বলল পেক, 'কুইমবিদের বোট। দু'মাইল দূরে। ডলফিনের মত ছুটতে পারে না ওটা। ওটার আরও কাছে চলে যাওয়ার কথা ছিল আমাদের, যেতে পারছি না!'

'মানে,' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'গতি কমে গেছে আমাদের!'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন। 'বাতাস আর স্রোতের জন্যে নয়। ওই চাপ

কুইমবিদের বোটেও একই রকম পড়ছে। আসলে বাড়তি বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ডলফিনে।'

'কিন্তু বোটের তলায় তো কিছু দেখলাম না,' প্রতিবাদ করল মুসা।

'বালির চরা!' আবার চেঁচাল কিশোর। 'প্রায় থেমে যেতে হয়েছিল ওটা পেরোনর সময়। নিশ্চয় তখন কিছু লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।'

'গতি কমেছিল, কিন্তু থেমে যায়নি। চলন্ত বোটের তলায় এত ভারি জিনিস কি করে আটকাল?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'এটা একটা কথা বটে, কি করে আটকাল? নিজে নিজে এসে যদি আটকে যেতে পারে…কিংবা আঁকড়ে ধরার ক্ষমতা থাকে…'

'ডাইভার ছাড়া আর কিসের সে ক্ষমতা আছে?' বাধা দিয়ে বলল মুসা। 'দুনিয়ায় এমন কোনও ডুবুরি নেই যে এখন আমাদের বোটের তলা আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে।'

'সে-কথাই তো ভাবছি…'

'আমিও কিছু বুঝতে পারছি না,' ক্যাপ্টেন বলল। 'কিন্তু কিশোর ঠিকই বলেছে। তলায় যা-ই এসে ধরেছে, নিজে নিজে চলতে পারে ওটা। কনটেইনার নয়, বুঝেছ, হিচহাইকার!'

বার

'হিচহাইকার?' জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল মুসা।

'ভারি,' একই কণ্ঠে বলল পেক। 'খুব ভারি কিছু।'

'এবং এমন কিছু,' যোগ করল কিশোর। 'যেটা মসৃণ বোটের তলা আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে। এই উত্তাল সাগরে, পঁচিশ নট গতিবেগও খসাতে পারে না ওটাকে।'

ঢেউ ভেঙে, দোল খেয়ে ছুটে চলেছে ডলফিন। নীরবে ডেকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে তিনজনে, যেন ইস্পাতের পাত ভেদ করে নিচে কি আছে দেখতে চাইছে। ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে হচ্ছে না বলে বুঝি স্বস্তিও বোধ করছে কিছুটা।

'দেখা দরকার,' অবশেষে বলল পেক। 'কি আছে নিচে, দেখা দরকার।'

'আমার দরকার নেই!' হাত নাড়ল মুসা।

'এত ভয় পাচ্ছ কেন?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'সাগরের কোনও দানব-টানব দেখবে ভাবছ নাকি? সাগর-দানব আছে কিনা, জানি না। যদি থাকেও,' যুক্তি

দেখাল সে, 'মসৃণ ইস্পাতের পাত আঁকড়ে ধরতে পারবে না। আর নিয়মিত প্ল্যাটফর্মে যাতায়াতেরও দরকার হবে না ওটার। না, ওসব কিছু নয়। যা আছে, সেটা মানুষের তৈরি। আমার বিশ্বাস, কোনও ধরনের জলযান।'

'এখুনি বোঝা যাবে,' বলল ক্যাপ্টেন। 'মুসা...'

'রাখুন,' বাধা দিল কিশোর। 'মানুষ যদি থাকে? আমরা হঠাৎ থেমে গেলে সন্দেহ হবে, খসিয়ে নিয়ে সরে যাবে।'

'কি করব তাহলে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'যেভাবে চলছি চলতে থাকব। প্ল্যাটফর্মের কাছে গিয়ে থামতেই হবে, তখন থামলে আর সন্দেহ হবে না। বোটের গতি কমার সঙ্গে সঙ্গে নেমে যাবে তুমি। গিয়ে দেখে আসবে।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,' একমত হল ক্যাপ্টেন। 'তবে নজর রাখ। প্ল্যাটফর্মে পৌঁছার আগেও চলে যেতে পারে।'

'ওদিকে যাচ্ছি আমি,' বাঁয়ের রেলিঙের দিকে এগোল মুসা।

ডানে রইল কিশোর। দু'জনেই তাকিয়ে রইল নিচের ফেনায়িত ঘন সবুজ পানির দিকে। অ্যানাক্যাপা আর সান্তা ক্রুজ দ্বীপের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে পশ্চিমে মোড় নিল ডলফিন। অক্টোপাস এখন সোজা সামনে। ওটার ধাতব পায়ের অনেক ওপরে উঠে ভাঙছে ঢেউয়ের চূড়া, দেখা যাচ্ছে।

'বাতাসের মতিগতি সুবিধে লাগছে না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। পাতলা মেঘের স্তর জমে গেছে ইতিমধ্যেই। 'মেঘ জমছে, ঢেউ বাড়ছে, ব্যারোমিটার অস্থির। না, লক্ষণ ভাল নয়।'

'হারিকেন আসছেই তাহলে?' ব্রিজের দিকে ফিরে তাকাল কিশোর।

'লক্ষণ তো পরিষ্কার। নিশ্চয় গতি বদল করেছে। সোজা আসছে সান্তা বারবারার দিকে। কোস্ট গার্ডের সঙ্গে কথা বলে দেখি...'

'ক্যাপ্টেন, প্ল্যাটফর্মে তো পৌঁছে গেছি,' বলে, এয়ার-ট্যাংক তুলে নিয়ে পিঠে বাঁধতে শুরু করল মুসা।

গতি কমাল ক্যাপ্টেন। সামনে বিরোধীদের বোটের সারি। সেদিকে বিশেষ নজর দিল না, উদ্বিগ্ন চোখে বার বার তাকাচ্ছে আকাশ আর বাড়ন্ত ঢেউয়ের দিকে। মুসার দিকে মুখ ফেরাল। 'এখন নামবে? সাগরের যা অবস্থা...!' চমকে থেমে গেল। লাফ দিয়ে যেন আগে বাড়ল ডলফিন। অথচ গতি বাড়ায়নি পেক।

'কিশোর! ক্যাপ্টেন!' চিৎকার করে উঠল মুসা, আঙুল তুলে দেখাল। 'ওই যে, চলে যাচ্ছে!'

দেখল তিনজনেই। লম্বা একটা ছায়া দ্রুত ছুটে যাচ্ছে ঢেউয়ের নিচ দিয়ে।

অনেকটা টরপেডোর মত। চোখের পলকে হারিয়ে গেল।

'আরি...আরি...,' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'হাঙর নাকি!'

'না,' পানির দিকে তাকিয়ে রয়েছে ক্যাপ্টেন। 'হাঙর নয়, হাঙর শিকারী। চুম্বকের সাহায্যে আটকে ছিল আমাদের জাহাজের তলায়। শার্ক হান্টার।'

'এই শার্ক হান্টারটা কি জিনিস?' জানতে চাইল কিশোর।

'এক ধরনের জলযান, ডাইভাররা ব্যবহার করে। সাবমেরিনের মতই অনেকটা, তবে সাবমেরিন নয়, ভেতরে বাতাস থাকে না। আরোহীকে এয়ার-ট্যাংক ব্যবহার করতে হয়। মিটার দুয়েক লম্বা, আধ মিটার মত উঁচু, আর এক মিটার চওড়া। ইলেকট্রিক মোটরে চলে, দরকারী যন্ত্রপাতি আর বাড়তি এয়ার-ট্যাংক রাখার জায়গা আছে।'

'ওখানে চোরাই মাল রাখার ব্যবস্থা করা যায়?' বলল কিশোর।

'যায়। ওটাই আমাদের হিচহাইকার।'

'কিন্তু চলে তো গেল,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা।

ইন্টারভিউ নেয়া শেষ করে মোটেলে ফিরে এলেন মিস্টার মিলফোর্ড। রবিনও সবে তখন লেখা শেষ করেছে।

'থ্যাংক ইউ, রবিন,' মিস্টার মিলফোর্ড বললেন। 'অনেক সময় বাঁচালে আমার। লস অ্যাঞ্জেলেসে ফিরে গিয়ে কাহিনীর প্রথম অংশটা ছাপার ব্যবস্থা করতে পারব এখন। তুমি থাকতে চাও? কালই ফিরে আসব আবার।'

'তুমি যাও, আমি থাকি। কিশোর আর মুসা আছে।'

বাবা চলে যাওয়ার পর রবিন ঠিক করল একবার মিস্টার কারটারের ওখান থেকে ঘুরে আসবে। রেডিওটা চালানর চেষ্টা করবে, ডলফিনের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিশোরের সঙ্গে কথা বলতে চায়। তার ধারণা, কারটার কিছু মনে করবেন না। পুব ধারের একটা সড়ক ধরে চলল সে। লক্ষ্য করল মেঘ জমতে শুরু করেছে। মন-খারাপ-করে দেয়া রোদ। বাতাসের জোর অনেক বেড়েছে, থেকে থেকেই বইছে দমকা হাওয়া, ধুলো আর ঝরা পাতা ওড়াচ্ছে।

মিস্টার কারটারের বাড়ির সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সতর্ক হল রবিন। ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিল দরজায়। লেখক নিজে দরজা খুলে দিলেন।

'আরি, স্যার, আপনি? এখানে?'

'এস, ঘরে এস।'

রবিনকে স্টাডিতে নিয়ে গিয়ে পুলিশ আর মেয়রের সঙ্গে মীটিঙের কথা জানালেন কারটার। শেষে বললেন, 'তাই, আমাকে বাদ দিয়েই চলে গেছে পেক।

আমি রয়ে গেছি বাড়িতে। অসুবিধে নেই, আমার মনে হয় কিশোর আর মুস ম্যানেজ করে নিতে পারবে। ও হ্যাঁ, কোস্ট গার্ডের সঙ্গে কথা বললাম। হারিকেনের গতি নাকি বেড়েছে, দিক বদলে এদিকেই ছুটে আসছে।'

'ভয়ের কথা! কখন আঘাত হানবে?'

'আজ রাতের মধ্যেই। ঝড়টা এখনও কয়েক শো মাইল দক্ষিণে রয়েছে।'

'তাহলে আমাদের ওপর দিয়েই যাচ্ছে?'

'এখনও বলা শক্ত। ঝড়ের মতিগতি সব সময় ঠিক বোঝা যায় না। তবে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আর যা মনে হচ্ছে, বেশ বড় ঝড়।'

'প্ল্যাটফর্মের ওদের কি হবে?' কেঁপে উঠল রবিন। 'হাজার ডলার দিলেও আজ রাতে ওখানে থাকতে রাজি হব না আমি।'

'হুঁ,' মাথা ঝোঁকালেন লেখক। 'ডলফিনের সঙ্গে কথা বলে দেখি, ওরা কি করছে...' থেমে গেলেন বাধা পেয়ে। তাঁকে আর ডাকতে হল না। জ্যান্ত হয়ে উঠল অন করা রেডিওর স্পীকার। 'ডলফিন কলিং মিস্টার কারটার! কাম ইন মিস্টার কারটার! ডলফিন...!'

মাইক্রোফোনের সামনে ঝুঁকে রয়েছে পেক। সে-ই ডাকছে কারটারকে।

জোরাল বাতাসের শব্দকে ছাপিয়ে বেজে উঠল বোটের রেডিও স্পীকার, 'কারটার বলছি, ডলফিন। কে, ক্যাপ্টেন পেক?'

'হ্যাঁ। কিশোর আপনার সাথে কথা বলতে চায়।'

ভীষণ দুলছে বোট। মাইক্রোফোনের সামনে ঝুঁকল কিশোর। 'দেখেছি ওটা, স্যার,' কোনও রকম ভূমিকা না করে বলল সে। 'বালির চরার কাছে যখন বোটের গতি কমানো হয়েছিল, তখনই এসে লেগেছিল তলায়। এক ধরনের ওয়ান-ম্যান সারমেরিন, চালাতে স্কুবা ডাইভারের প্রয়োজন হয়। ইলেকট্রিকে চলে। ক্যাপ্টেন পেক বলছেন, গতি নাকি খুবই কম ওগুলোর, ঘন্টায় মাত্র চার নট। সে-জন্যেই ডলফিনকে বাহন হিসেবে বেছে নেয়। খোলা সাগরে দ্রুত আসতে পারে। নিশ্চয় চুম্বকের সাহায্যে আটকে থাকে বোটের খোলে।'

'লোকটাকে দেখেছ?'

'না, স্যার। শুধু বাহনটা। ও বোধহয় জানে না আমরা দেখে ফেলেছি। আশা করছি, আবার ফিরে আসবে। তখন ধরার চেষ্টা করব। কড়া নজর রাখছি এখন প্ল্যাটফর্মের নিচে আর আশপাশে। তবে, ভেসে উঠলেও দেখব কিনা জানি না। যা বড় বড় ঢেউ।'

'হারিকেন আসছে খুব জোরে। ক্যাপ্টেন, অবস্থা কি রকম ওখানে?'

ফুঁসে ওঠা সাগরের দিকে আরেকবার তাকাল পেক। গম্ভীর হয়ে বলল, 'এখনও ততটা খারাপ হয়নি। তবে ছোট বোটগুলো থাকতে পারেনি, চলে গেছে।'

'তোমরা কতক্ষণ থাকতে পারবে?'

জবাবটা দিল কিশোর, 'বোধহয় সারাদিনই। না পারলে হিচহাইকার ব্যাটাকে হারাব। ও কখন আসে কে জানে। এখনও অনেক বোট রয়েছে। কুইমবিরা রয়েছে আমাদের ঠিক পেছনেই, তেমন অসুবিধে হচ্ছে বলে তো মনে হয় না। আমরা থাকছি।'

খটখট করে জানালা কাঁপিয়ে দিয়ে গেল এক ঝলক দমকা হাওয়া। বাইরে রোদ আরও মলিন হয়েছে। সূর্যের সামনে ঘন, ধূসর হয়ে এসেছে মেঘ। বৃষ্টি শুরু হয়নি এখনও।

'বেশ, থাক,' কিশোরকে বললেন কারটার। 'কিন্তু জোরাজুরি করবে না। ক্যাপ্টেন বললেই ফিরে আসবে।'

কথা বলল ক্যাপ্টেন, 'ভাববেন না, আমি খেয়াল রাখব। সাবধানে থাকব। অবস্থা খারাপ বুঝলে আর দেরি করব না। সান্তা ক্রুজে ফিরে সেল্টার নেয়ার চেষ্টা করব যত তাড়াতাড়ি পারি।'

'ঠিক আছে। শয়তানটাকে ধরার চেষ্টা কর।'

নীরব হয়ে গেল রেডিও। চেয়ারে হেলান দিল কারটার।

'ক্যাপ্টেন পেক বোধহয় খুব ভাল নাবিক,' রবিন বলল। 'আর ডলফিনও যথেষ্ট মজবুত। খারাপ আবহাওয়ায় টিকতে···স্যার! দেখুন, দেখুন!'

ঘুরে তাকালেন কারটার। কিন্তু শূন্য জানালা। লাফিয়ে উঠে দৌড়ে এসে হলে ঢুকল রবিন, ছুটে গেল পেছনের দরজার কাছে। হ্যাঁচকা টানে খুলল পাল্লা। সমস্ত আঙিনাটায় চোখ বোলাল। কই কেউ তো নেই। শুধু বাতাসে নুয়ে নুয়ে যাচ্ছে গাছের ডালপাতা।

'আমি শিওর দেখেছি, একটা মুখ। জানালায়। নিশ্চয় আমাদের কথাবার্তা সব শুনেছে।'

পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন কারটার। নির্জন আঙিনাটা দেখলেন। 'তারমানে ডাইভার একা কাজ করছে না, দল আছে।'

'তাই তো মনে হয়। ডাইভার নিশ্চয় সাগর থেকে উঠে এসে জানালায় দাঁড়ায়নি। সম্ভব নয়।'

'কারা আছে দলে?' আনমনে বললেন লেখক।

'কুইমবিদেরকে সন্দেহ হয়, স্যার, আপনার?'

'ওরা বোটে থেকে থাকলে এখন এখানে আসা ওদের পক্ষেও সম্ভব নয়। তবে, জড়িত থাকতেও পারে। কালো জাহাজটা যখন ছেড়ে যায়, ওটাতে শুধু ডিডকে দেখেছি আমি।'

আস্তে মাথা নোয়াল রবিন। স্টাডিতে ফিরে এল দু'জনে। নীরবে বসে রইল। কান পেতে শুনছে বেড়ে-ওঠা বাতাসের গর্জন।

তের

অক্টোপাসকে ঘিরে রেখেছে বিরোধীদের নৌকা-জাহাজ, সারি ঠিক রাখতে রীতিমত যুঝতে হচ্ছে ঢেউয়ের সাথে। কালো হয়ে গেছে আকাশ, কালো চাদর যেন ঢেকে দিয়েছে সূর্যের মুখ, ইতিউতি ছুটছে খণ্ড-মেঘ। প্ল্যাটফর্মের ধাতব পায়ে প্রচণ্ড আঘাত হানছে পাহাড়-সমান ঢেউ। এক এক করে রণে ক্ষান্ত দিয়ে কেটে পড়ছে পরাজিত ছোট ছোট বোট, নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে ছুটছে সান্তা বারবারায়।

ব্রিজের ভেতরে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা আর ক্যাপ্টেন পেক। অসুস্থ বোধ করছে কিশোর, মোচড় দিচ্ছে পাকস্থলী। কিন্তু উত্তেজনার কারণে, হিচহাইকারকে ধরার আশায় সহ্য করছে কোনমতে।

ঊনত্রিশ দশমিক সাত-এ নেমে এসেছে ব্যারোমিটারের কাঁটা। শক্ত হাতে হুইল ধরে রেখে আড়চোখে সেদিকে তাকাল পেক। 'এত নেমে গেল! ঝড় তো শুরুই হয়নি এখনও।'

দুপুর দুটোয় হঠাৎ করে নামল বৃষ্টি, ঝরঝর করে ঝরে গেল এক পশলা। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার শুরু হল, মুষলধারে, ঝাপসা করে দিল ব্রিজের সামনের জানালা।

'শীঘ্রি ফিরতে হবে,' ঘোষণা করল ক্যাপ্টেন।

প্ল্যাটফর্মের উঁচুতে, পানি থেকে অন্তত বারো মিটার ওপরে রেলিঙের কাছে দাঁড়ানো শ্রমিকদের হাসি মুছে গেছে এখন। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে ব্যঙ্গ করছে না আর। নীরবে বার বার তাকাচ্ছে ফুঁসে ওঠা সাগর আর কালো আকাশের দিকে।

'হয়ত তাড়াতাড়িই ফিরবে লোকটা,' আশা করল কিশোর। 'শার্ক হান্টার নিয়ে তীরে ফিরতে চাইলে আমরাই এখন ওর একমাত্র বাহন। বাকি যা আছে, সবগুলো বোটের তলা কাঠ কিংবা ফাইবারগ্লাসের, চুম্বক লাগবে না।'

'কি জানি,' মুসা বলল। 'ও হয়ত পানির নিচে থেকে বুঝতেই পারছে না ঝড়

কতটা বেড়েছে।'

'পারত না,' ক্যাপ্টেন বলল। 'যদি পানি বেশি গভীর হত। মাত্র তো পঁচিশ মিটার এখানে, আর ওখানে আরও কম।' হাত তুলে আধ মাইল দূরের রীফটা দেখাল সে, সান্তা ক্রুজ আইল্যাণ্ডের দিকে—শাদা হয়ে গেছে ওখানকার পানি। 'ঝড় যে বাড়ছে খুব ভাল করেই বুঝতে পারছে। সান্তা ক্রুজেও সেল্টার নিতে পারে।'

'ঠিকই বলেছেন,' একমত হল মুসা। 'বোটের তলায় আটকে তীরে ফেরার চেয়ে এখন ওখানেই বেশি নিরাপদ ও।'

'না,' ভোঁতা কণ্ঠে প্রতিবাদ করল কিশোর। 'ও ফিরে আসবেই। এখন চলে গেলে ওকে হারাব আমরা।'

এক ঘন্টা পর। পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেছে আকাশ। বৃষ্টি আরও বেড়েছে। ডলফিনের গলুইয়ের নিচে ভীষণ দাপাদাপি করছে ঢেউ। ওটা ছাড়া মাত্র আর চারটে বোট অবশিষ্ট রয়েছে, বাকি সবাই চলে গেছে। প্ল্যাটফর্মকে ঘিরে আর চক্র তৈরি করা যাবে না—এত নৌকা নেই, বুঝে সব কটা এসে দাঁড়িয়েছে ডলফিনের পেছনে, কুইমবিদের জাহাজের প্রায় গা ঘেঁষে। লাল উলের টুপি আর হলুদ স্লিকার পরা ডিড কুইমবিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা কোনও ভাইকিং জলদস্যু, দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রিজে। জাহাজ নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ডলফিনের আরও কাছে। বাতাস আর বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল, 'পেক, কেমন লাগছে!'

'ভালই তো!' চেঁচিয়ে জবাব দিল ক্যাপ্টেন।

'কখন যাবেন?'

'এই তো, আর একটু।'

হেসে উঠল ডিড। 'পঞ্চাশ ডলার বাজি ধরবেন? আমি আপনারই পরে যাব, সবার শেষে। আরও অনেকক্ষণ থাকতে পারব।'

'মাথায় গোলমাল থাকলে সে-চেষ্টা কর। কে মানা করেছে? আমার কাছ থেকে সর এখন।'

বৃষ্টির মধ্যে খোলা ব্রিজে দাঁড়িয়ে হাসল ডিড। সরল না, বরং আরও এগিয়ে এল। মারাত্মক ঝুঁকি নিচ্ছে। ঘষা লাগলে এখন দুটো বোটেরই সর্বনাশ হবে। সব ক'টা বোটই আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে প্ল্যাটফর্মের দিকে, বাতাসকে একপাশে রেখে, যাতে ঢেউয়ের আঘাত কম লাগে। সেই সঙ্গে হুঁশিয়ার রয়েছে, যেন প্ল্যাটফর্মের বেশি কাছে চলে না যায়, ধাতব পায়ে বাড়ি লাগলে চুরমার হয়ে যাবে বোট।

আরও দুটো বোট হাল ছেড়ে দিল। জোরে জোরে কয়েকবার হর্ন বাজিয়ে নাক ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেল চ্যানেলের দিকে। ওগুলোর পর পরই রওনা হয়ে গেল তৃতীয়টা. বাকি রইল শুধু কুইমবিদের কালো জাহাজ, আর ডলফিন। কালো পানিতে অস্থির হয়ে খুঁজছে কিশোরের গভীর কালো চোখের দৃষ্টি—যদি ছোট্ট ডুবো-জলযানটার কোনও চিহ্ন দেখা যায়!

'হবে না, কিশোর,' মুসা বলল। 'এই অন্ধকারে দেখতে পাবে না ওটাকে। আমাদের তলায় এসে লেগে আছে কিনা তাই বা কে জানে?'

'আরেকটু,' অনুরোধ করল কিশোর।

হঠাৎ, পিছাতে শুরু করল কুইমবিদের জাহাজ। চেঁচিয়ে উঠল ডিড. 'পেক, আপনিই জিতলেন। আমি আর পারলাম না।' হেসে, হুইল ঘোরাতে শুরু করল সে। এঞ্জিনের গতি বাড়িয়ে দিল পুরোদমে। দেখতে দেখতে ঘন বৃষ্টির মাঝে হারিয়ে গেল কালো জাহাজটা।

'আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই, কিশোর,' পেক বলল। 'এবার যেতে হবে। ব্যারোমিটার কোথায় নেমেছে দেখেছ? বাতাসও যে-হারে বাড়ছে, শেষে বিপদে পড়ে যাব।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে।'

বোটের মুখ ঘোরাল ক্যাপ্টেন। এঞ্জিনের গতি বাড়াতেই থরথর করে কেঁপে উঠল ডলফিন। প্রচণ্ড আঘাতে ঝনঝন করে উঠল বোটের ধাতব শরীর।

'কী!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'কি হল?'

'বাড়ি লেগেছে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেছে কিশোরের।

হুইল আঁকড়ে ধরেছে ক্যাপ্টেনের আঙুল, যেন ওটা দিয়েই শেষরক্ষা করতে চায়। 'নিচে বুঝি কিছু ভেঙেই গেছে! প্রপেলার ভাঙলে শ্যাফটা বাঁকা করে ফেলবে। আর বেঁকে যদি যায় টেনে ছিঁড়ে বের করে নিয়ে যাবে। ব্যস, তাহলেই আমরা গেছি। ডুবে যাবে বোট!'

বলতে বলতেই এঞ্জিন বন্ধ করে দিল ক্যাপ্টেন। ভয়াবহ সাগরে অসহায় হয়ে দুলতে লাগল ডলফিন। প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকাল সে। ঢেউয়ের ধাক্কায় সেদিকেই চলেছে বোট, কোনও একটা ধাতব পায়ে বাড়ি খাওয়ার জন্যেই বুঝি!

'এখন কি হবে?' মুখ বিকৃত করে ফেলেছে মুসা।

'প্রপেলার ঘোরালে শ্যাফট ছিঁড়বে। না ঘোরালে পায়ে বাড়ি লাগবে।' দাঁতে দাঁত ঘষল ক্যাপ্টেন। 'উপায় এখন একটাই। ঝুঁকি নিতে হবে। চালু করতেই হবে এঞ্জিন। যতটা সম্ভব আস্তে প্রপেলার ঘুরিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।...শক্ত করে ধর কোনও কিছু। রেডি...'

আবার চালু হল এঞ্জিন। সাবধানে, অতি ধীরে গতি বাড়াল পেক। তার দাড়িওয়ালা মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। পোড়খাওয়া অভিজ্ঞ নাবিক, আগেও নিশ্চয় এরকম বিপদে অনেক পড়েছে। কিশোর আর মুসা আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে রইল সামনের প্ল্যাটফর্মের দিকে, কালো বৃষ্টির চাদরের মাঝে কেমন যেন অবাস্তব লাগছে ওটাকে, সাগর থেকে উঠে আসা অতিকায় কোনও অজানা জলদানবের মত।

স্টাডিতে অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করছেন কারটার। বার বার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছেন, বৃষ্টিধোয়া আঙিনার দিকে। জানালার কাছে বসে রবিনও ঝড়-বৃষ্টি দেখছে। কালো মেঘে ঢাকা আকাশের জন্যে এই অসময়েই মনে হচ্ছে ঘোর সন্ধ্যা নেমেছে। অথচ সূর্য অস্ত যেতে এখনও কয়েক ঘন্টা বাকি।

'আমার…আমার কাছে কিন্তু ততটা খারাপ লাগছে না,' নড়েচড়ে বসল রবিন, কণ্ঠের অস্বস্তি চাপা দিতে পারল না, নিজেকেই প্রবোধ দিচ্ছে যেন। 'এর চেয়ে ঢের বেশি খারাপ তুফান দেখেছি।'

'শুরুই হয়নি এখনও, রবিন,' গম্ভীর কণ্ঠে বললেন লেখক। 'মাত্র আভাস দিচ্ছে। নাহ্, আর দেরি করা যায় না। দেখি, ওদেরকে বলি, চলে আসুক।' রেডিওর সামনে বসলেন তিনি। 'কলিং দ্য ডলফিন, কলিং দ্য ডলফিন! ক্যাপ্টেন পেক?'

জবাবের অপেক্ষা করলেন।

উঠে এল রবিন। কারটারের পাশে দাঁড়াল।

জবাব নেই।

মাইক্রোফোনের একেবারে ওপরে ঠোঁট নিয়ে গিয়ে চিৎকার করে ডাকলেন কারটার, 'কলিং দ্য ডলফিন! কলিং দ্য ডলফিন! ক্যাপ্টেন পেগ?'

ঢোক গিলল রবিন। 'জ-জবাব দিচ্ছে না কেন…'

'দেখি পাঁচ মিনিট। ওরা হয়ত ব্যস্ত, জবাব দিতে পারছে না।'

পাঁচ মিনিট গেল। বাইরে ঝমঝম ঝরছে বৃষ্টি, জানালার শার্সিতে আঘাত হেনে জোরাল খটাখট শব্দ তুলছে বাতাস। অকারণেই কেঁপে উঠল একবার রবিন।

'হাল্লো, ডলফিন!' সতর্ক হয়ে উঠেছেন এখন কারটার। 'ক্যাপ্টেন পেক! কিশোর! মুসা!'

নীরব রইল রেডিওর স্পীকার।

'কোস্ট গার্ডকেই ডাকতে হচ্ছে,' বলতে বলতে একটা সুইচ টিপলেন কারটার। 'সান্তা বারবারা কোস্ট গার্ড স্টেশন! জেমস কারটার কলিং সান্তা বারবারা

কোস্ট গার্ড স্টেশন!'

খড়খড় করে উঠল স্পীকার। 'লেফটেন্যান্ট মাইক বলছি, কারটার।'

'ডলফিনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না। তোমাদের কাছে খোঁজ আছে?'

'না। ইলেকট্রিক্যাল ডিসটার্বেন্স। দেখি, চেষ্টা করে দেখি।'

নীরব হয়ে গেল স্পীকার।

মিনিটের পর মিনিট পেরোচ্ছে। টেবিলে আঙুল ঠুকছেন কারটার। রবিন নখ কামড়াচ্ছে।

অবশেষে আবার কথা বলল স্পীকার, 'পেলাম না, কারটার। ওরা ওখানে, আপনি শিওর? অন্য একটা বোটও কিন্তু নেই। বেশির ভাগই জেটিতে ফিরে এসেছে, বাকিগুলোও আসছে।'

'ওখানে আছে কিনা শিওর না, লেফটেন্যান্ট। তবে ফেরার আগে নিশ্চয় আমাকে খবর দিত।'

'হয়ত রেডিও নষ্ট হয়ে গেছে,' নিজের কাছেই কথাটা বেখাপ্পা লাগল মাইকের, কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল। 'দেখি, আবার চেষ্টা করে।'

রেডিওর নীরবতা স্নায়ুতে চাপ দিচ্ছে কারটার আর রবিনের। বাইরে উন্মত্ত হয়ে উঠছে ঝড়।

আবার শোনা গেল লেফটেন্যান্টের কণ্ঠ, 'অক্টোপাস জবাব দিয়েছে। বিপদে পড়েছে ডলফিন। তবে আপনার লোকেরা নিরাপদেই প্ল্যাটফর্মে উঠেছে। কথায় মনে হল, তেল কোম্পানির সঙ্গে গোলমাল বেধেছে, স্যাবোটাজের কথা কি যেন বলল।'

চোদ্দ

ড্রিলিং প্ল্যাটফর্মের নিচের ডেকের একটা করিডরে দাঁড়িয়ে আছে লুক হারডিন। আলো খুব কম ওখানে। তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন শ্রমিক। ম্যানেজারের হাতে পিস্তল, মুসা আর কিশোরের দিকে তুলে ধরেছে। ধাতব মই বেয়ে এইমাত্র ল্যাণ্ডিং স্টেজ-এ উঠে এসেছে দু'জনে।

'হাতেনাতেই ধরলাম!' রেগে গেছে হারডিন। 'মিস্টার ডেলটন ঠিকই বলেছেন। তোমরা, বিরোধী দলের হারামী লোকেরা এসে চুরি কর প্ল্যাটফর্মে, স্যাবোটাজ করে যাও।'

'কিচ্ছু করিনি আমরা!' রাগে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'আমরা...'

'আগেই সতর্ক করা হয়েছে তোমাদেরকে,' কর্কশ কণ্ঠে বাধা দিল হারডিন। 'শয়তানীর ইচ্ছে না থাকলে চুরি করে উঠেছ কেন এখানে?'

শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর, 'আসতে বাধ্য হয়েছি, স্যার। ডলফিন বিপদে পড়েছে। প্রপেলারে গোলমাল, শ্যাফট এত কাঁপছে, যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে যেতে পারে। ক্যাপ্টেন পেক অনেক কষ্টে বোটটাকে প্ল্যাটফর্মের কাছে এনেছেন, যাতে অন্তত প্ল্যাটফর্মে উঠে কোনমতে বাঁচতে পারি।'

ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল ম্যানেজার। 'প্ল্যাটফর্মের তলায়! এই আবহাওয়ায়, এতবড় একটা বোটকে! আমাকে বিশ্বাস করতে বল একথা?'

'মিছে কথা বলছি না!' বেপরোয়া হয়ে উঠল মুসা।

'ক্যাপ্টেন পেকের দক্ষতা আপনার কল্পনার বাইরে,' বড়দের মত করে বলল কিশোর। 'বিশ্বাস করুন, আর কোনও উপায় ছিল না আমাদের।'

'কোথায় তোমাদের ক্যাপ্টেন?'

'নিচে, বোটে। ল্যাণ্ডিং স্টেজের সঙ্গে বোট বাঁধার চেষ্টা করছেন।'

চোখ সরু করে ওদের দিকে তাকাল ম্যানেজার। তারপর হাতের ইশারায় দু'জন শ্রমিককে নিচে গিয়ে দেখে আসার নির্দেশ দিল। দুই গোয়েন্দাকে বলল, 'যদি মিথ্যে হয়, বুঝবে মজা...'

'কি করবেন?' এতই রাগল মুসা, বেফাঁস কথা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে, 'আমাদেরকে আটকে রেখে আপনাদের শয়তানী ব্যবসা চালিয়ে যাবেন? স্মাগলিং?'

'স্মাগলিং!' লাল হয়ে গেল হারডিনের মুখ। 'কি বলছ?'

'স্যার,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'আপনার অফিস তো ডাঙায়, তাই না? আপনি এখন এখানে কি করছেন, জিজ্ঞেস করতে পারি?'

'কেন জিজ্ঞেস করবে?'

'জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি এখানে এলেন কিভাবে? নিশ্চয় আপনাকে এখানে আসতে দেখা গেছে? মানে অনেকেই দেখেছে?'

চেহারাটাকে এমন নিরীহ করে রেখেছে কিশোর, দ্বিধায় পড়ে গেল ম্যানেজার। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে। 'আজ সকালে একটা সাপ্লাই বোটে করে এসেছি। এর সঙ্গে স্মাগলিঙের সম্পর্ক কোথায়?'

'আমাদের ধারণা, বাইরে থেকে কেউ কিছু প্ল্যাটফর্মে এনে তুলেছে, তারপর এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে তীরে। ডলফিনের মাধ্যমে।'

'যত্তোসব!' বিড়বিড় করল ম্যানেজার। 'গাঁজাখুরি গপ্প!'

'না, স্যার,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'গাঁজাখুরি নয়। গত কয়েক দিনে অদ্ভুত

ভাবে কয়েকবার তেল ফুরিয়েছে ডলফিনের। সেই রহস্যের সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা।' সব কথা খুলে বলল সে। কিভাবে ডলফিনের তলায় আটকে মিনি-সাবমেরিন আসে, সেকথাও জানাল।

'বেশ, বুঝলাম দেখেছ। কিন্তু আমি ওটাতে করে এসেছি কেন ভাবছ?'

আবার মুখ ছেড়ে দিল মুসা, 'কারণ, আপনি লোকের পিছু নেন, তাদের ওপর স্পাইইং করেন। মিস্টার কারটারের ওপর নজর রাখেন, ডলফিনের কাছে ঘুরঘুর করেন। শুঁড়িখানায় চিকামারা আর কুইমবিদের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি আপনাকে। তেল কোম্পানির চাকরি করেন, অথচ এমন ভাব দেখান যেন বিরোধীদের সাপোর্টার।'

'এত কিছু জান!'

মুসা আরও কিছু বলে ফেলার আগেই ফিরে এল দুই শ্রমিক। ভিজে চুপচুপে হয়ে এসেছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে ক্যাপ্টেন পেক, গায়ে স্লিকার। শ্রমিকেরা ম্যানেজারকে জানাল, ডলফিন সত্যি অচল হয়ে গেছে। এঞ্জিন চালু করে শুনে এসেছে প্রপেলার শ্যাফটের অস্বাভাবিকভাবে বাড়ি খাওয়ার আওয়াজ।

পিস্তল নামাল ম্যানেজার। 'সরি, বয়েজ, ভুল করেছি। আসলে, এখানে কিছু ঘটছে, অথচ কে করছে বুঝতে পারছি না, এটাই রাগিয়ে দিয়েছিল আমাকে। একটা ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারি, ওই শার্ক হান্টারে আমি ছিলাম না। কিভাবে এসেছি এখানে আমার লোকদের জিজ্ঞেস কর, ওরা বলবে।'

তিনজন শ্রমিকই জানাল, সকালে সাপ্লাই বোটে করে এসেছে হারভিন। প্রতি সপ্তাহেই একবার করে নিয়মিত আসে সে, ড্রিলিং ইক্যুইপমেন্ট সব ঠিক আছে কিনা দেখতে।

'আমি স্মাগলিং-টাগলিং করি না,' ম্যানেজার বলল। 'ক'দিন থেকেই সন্দেহ হচ্ছে, কিছু একটা ঘটছে এই প্ল্যাটফর্মে। এখানে যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়া, কারটারের বোটে তেল চুরি হওয়া, কুইমবিদের গোলমাল পাকানো, গায়ে পড়ে বিরোধীদের সঙ্গে ডেলটনের ঝগড়া বাধানো, চিকামারার চালচলন—সব কিছুই যেন ছকে বাধা। সাজানো প্লট।'

'আপনার কি মনে হয়,' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'কোনও গোপন পরিকল্পনা আছে মিস্টার ডেলটনের?'

'জানি না। বাধা পেলে রেগে যান ডেলটন, এটা তাঁর স্বভাব। হয়ত নিছক সে-কারণেই সেদিন জেটিতে ওরকম করেছিলেন। কিন্তু চিকামারা আর কুইমবিদেরকে সন্দেহ হয় আমার। সুযোগ পেলেই ওদের ওপর নজর রাখি। রাতে ডলফিনে উঠতে দেখেছি কুইমবিদের। সে-কারণেই পিছু নিয়ে শুঁড়িখানায় গিয়েছি, জিজ্ঞেস

করতে, কারটারের বোটে কি করছিল।'

'আপনি পিছু নিয়েছিলেন?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'মিছে কথা বলেছে তাহলে ব্যাটারা। ওদের সব মিথ্যে কথা।'

'তাই তো মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল। 'তা, চিকামারার ব্যাপারটা কি, স্যার?'

'শুঁড়িখানায় কি করছে, ওকেও জিজ্ঞেস করেছি,' হারভিন জানাল। 'ও বলল, আমেরিকানদের কাণ্ডকারখানা দেখতে গেছে।'

'কিশোর,' গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকাল মুসা। 'ওই ব্যাটাই জাপান থেকে কোনও মাল চোরাচালান করছে না তো?'

'করতেও পারে। তবে বয়েস বেশি। ঝড়ের মধ্যে ওই মিনি-সাবমেরিন চালানর ক্ষমতা তার নেই। কুইর্মবিরা খুব ভাল ডাইভার, কিন্তু ওরাও তো ছিল ওদের জাহাজে।'

'ছিল?' প্রশ্ন রাখল মুসা। 'মানে, দু'জনেই কি ছিল? ফেডকে তো একবারও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'কিন্তু ওদের নিজের বোট আছে,' ম্যানেজার যুক্তি দেখাল। 'স্মাগলিং করলে ওটাতে করেই করতে পারে।'

এক মুহূর্ত ভাবল কিশোর। 'পারে, সেটা সহজ। তবে নিরাপদ নয়।'

শ্রাগ করল হারডিন। 'ঝড় থামুক। পুলিশকে গিয়ে সব জানাব।'

'সেটা তো পরে হবে। এখনই কিছু করতে চাই।'

'এখন?'

'ডাইভার আর তার খুদে বাহনটা নিশ্চয় এখনও আশপাশেই কোথাও আছে। ডলফিনে করে পালাতে পারেনি। হয় ধারেকাছের কোনও দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, নয়ত এই প্ল্যাটফর্মেই উঠেছে।'

এমনভাবে চারপাশে তাকাল ম্যানেজার আর তার লোকেরা, যেন ওদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্যে ওত পেতে রয়েছে অদৃশ্য অনুপ্রবেশকারী।

'দেখি খুঁজে।' প্ল্যাটফর্মের প্রতিটি সম্ভাব্য জায়গায় খুঁজে দেখার নির্দেশ দিল হারডিন তিন শ্রমিককে। দুই গোয়েন্দা আর ক্যাপ্টেন পেককে নিয়ে নিজে চলল নিজের ডেকে তল্লাশি চালাতে। 'ব্যাটাকে ধরতে পারলে কাজ হত। শয়তান কোথাকার! স্মাগলিং করুক আর নাই করুক, প্ল্যাটফর্মে যে স্যাবোটাজ করছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

নিচের ডেকে পাওয়া গেল না লোকটাকে। মালপত্র আর যন্ত্রপাতি রাখার ঘরগুলো তন্নতন্ন করে খোঁজা হল, নেই। কয়েকটা ডুবুরির পোশাক দেখে সেদিকে ইঙ্গিত করল মুসা।

জবাবে ম্যানেজার বলল, 'আমাদের নিজস্ব ডুবুরি আছে, মুসা। প্ল্যাটফর্মের নিচে মাঝে মাঝেই নামতে হয়। পায়া আর পাইপ ঠিকঠাক আছে কিনা দেখার জন্যে। শামুক-গুগলী বেশি জমে গেলে সেগুলোও সরিয়ে দিয়ে আসে।'

ক্রুদের কোয়ার্টার, মেস রুম, রিক্রিয়েশন রুম, অপারেশন রুম, রান্নাঘর, খোঁজা হল সমস্ত জায়গায়। সন্দেহজনক লোকটাকে পাওয়া গেল না।

সব চেয়ে ওপরের ডেকে ঝমাঝম ঝরছে বৃষ্টি, ঘরগুলোর ধাতব দেয়ালে ঝাপটা মেরে কাঁপিয়ে দিচ্ছে ঝড়ো হাওয়া। প্রতিটি খোলা জায়গা ঘিরে দেয়া হয়েছে পাকানো ইস্পাতের শক্ত তারের বেড়া দিয়ে। মেশিন শপ, ড্রিলিং রুম, ড্রিলিং টাওয়ার, ক্রেন হয়স্টের মাঝের পথ দিয়ে চলাচলের সময় যাতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে, তার জন্যে নিরাপদ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে কালিগোলা আকাশে, দিগন্তের এমাথা-ওমাথা চিরে ফালাফালা করছে উজ্জ্বল আলোর ঝিলিক।

ছেলেদের জন্যে দুটো স্লিকার আনিয়ে দিল হারডিন। ওদেরকে আর ক্যাপ্টেন পেককে সঙ্গে নিয়ে ওপরের ডেকে আরেকবার নিজে খুঁজল। কিন্তু কাউকে লুকিয়ে থাকতে দেখল না।

বৃষ্টি সামান্য কমেছে, বাতাস বেড়েছে। পুরো প্ল্যাটফর্মটা কাঁপছে। ক্রু-চীফের সঙ্গে কথা বলল হারডিন, ছেলেদের দিকে ফিরল। বাতাস, বজ্র আর ঢেউয়ের প্রচণ্ড শব্দের মাঝে কথা বলতে গিয়ে রীতিমত চেঁচাতে হচ্ছে, নইলে শোনা যায় না। বলল, 'চীফ বলছে, ব্যারোমিটার আরও নেমেছে। অবস্থা আরও খারাপ হবে বোঝা যাচ্ছে। তীরে যোগাযোগের চেষ্টা হচ্ছে, পারা যাচ্ছে না, বজ্রপাতের কারণে গোলমাল করছে রেডিও।'

আচমকা এসে প্ল্যাটফর্মের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল পাহাড়ের মত এক ঢেউ, বিকট শব্দে ভাঙল, পানির ছিটে এই এত উঁচুতে একেবারে ওপরের ডেকেও উঠে এল।

'চল, নিচে চল জলদি!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যানেজার। 'এখানে অবস্থা খুব খারাপ। আরেকটু বাড়লেই আর কেউ থাকতে পারবে না ওপরে।'

আরেকটা ঢেউ ভাঙল। পানি এসে গায়ে লাগার আগেই প্রাণপণে সেফটি লাইন আঁকড়ে ধরল ওপরে যারা রয়েছে। দূরের সান্তা ক্রুজ দ্বীপের ধোঁয়াটে ছায়ার দিকে চেয়ে চমকে গেল মুসা। 'ও-ও ওইযে…কী…কী ওটা!'

বড় জোর আধ মাইল দূরে, শার্ক রীফের গায়ে যেখানে শাদা ফেনা নাচছে, কি যেন একটা ভেসে উঠল সেখানে সাগরের নিচ থেকে। কালো, বিশাল, বৃষ্টির জন্য স্পষ্ট দেখা যায় না—কতগুলো কিলবিলে শুঁড় আর বাঁকাচোরা হাত-পা

যেন।

'জা…জানি না!' মুসার মতই চমকে গেছে হারডিন।

বৃষ্টির চাদরের মাঝে আকাশের গায়ে যেন ঝুলে রয়েছে কালো আকৃতিটা।

'আমিও জীবনে দেখিনি…,' বলতে গিয়ে বাধা পেল ক্যাপ্টেন। আকাশটাকে দ্বিখণ্ডিত করে দিল যেন বিদ্যুতের ঝিলিক। ক্ষণিকের জন্যে স্পষ্ট দেখা গেল সব কিছু। অদ্ভুত আকৃতিটাকেও।

তাথৈ ঢেউ আর শাদা ফেনার মাঝে বেরিয়ে এসেছে ওটা। লম্বা, কালো, সারা গা ঢেকে দিয়েছে জলজ উদ্ভিদ। ঝড়ের মাতমে যোগ দিয়ে উন্মাদ নৃত্য নাচার জন্যে সাগরের গভীর তল থেকে উঠে এসেছে বুঝি কোনও বিশাল, ভয়ঙ্কর মহাদানব!

পনের

'কাম ইন, অক্টোপাস! শুনতে পাচ্ছ, অক্টোপাস? সান্তা বারবারা কোস্ট গার্ড স্টেশন কলিং অক্টোপাস। কাম ইন, অক্টোপাস!'

মিস্টার কারটারের বিরাট বাড়ির নীরব স্টাডিতে বেজে চলেছে স্পীকার, একঘেয়ে কণ্ঠে ডেকেই চলেছে কোস্ট গার্ডের রেডিওম্যান। কেমন যেন অবাস্তব লাগছে কণ্ঠ, কথা, সব, এমন ভাবে মিশে গেছে ঝড়ের আওয়াজের সঙ্গে, মনে হয় যেন ঝড়ের ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসছে। জবাবের জন্য উদ্বিগ্ন অধীর হয়ে আছেন কারটার, রবিন দু'জনেই, কিন্তু তাদের উদ্বেগ দূর করল না কেউ।

'প্ল্যাটফর্মে কি ওরা নিরাপদ, স্যার?' জানালার কাছে বসে আছে রবিন। প্রচণ্ড বৃষ্টি আর বাতাসে নুয়ে পড়া গাছের ডালের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'জানি না, রবিন। আশা তো করছি ভালই থাকবে। কিন্তু ঝড়ের যা অবস্থা দেখছি…নাহ্, মিথ্যে বলতে পারব না তোমাকে…' চুপ হয়ে গেলেন লেখক।

বুঝল রবিন। 'স্যার, আরেকবার চেষ্টা করুন না। কোস্ট গার্ডকে জিজ্ঞেস করুন, নতুন কিছু জেনেছে কিনা। কোনও বোট, মানে সান্তা ক্রুজ আইল্যাণ্ড থেকে…'

'ভরসা কম। তবু দেখি।' সুইচ অন করে মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকলেন, 'জেমস কারটার কলিং লেফটেন্যান্ট মাইক, কাম ইন…'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল স্পীকার, 'মাইক বলছি, কারটার।'

'নতুন কিছু জানা গেছে?'

'না। সরি।'

'প্ল্যাটফর্ম থেকে কোনও খবর এসেছে? কিংবা কোনও বড় জাহাজ থেকে? কিংবা সান্তা ক্রুজ?'

'না। যে-হারে বৈদ্যুতিক গোলমাল হচ্ছে, রেডিও বোধহয় কোনটাই কাজ করছে না ওদের, সিগন্যাল পাঠাতে পারছে না এত দূরে।' এক মুহূর্ত নীরবতা। তারপর সান্ত্বনা দেয়ার কণ্ঠে বলল লেফটেন্যান্ট, 'নিরাপদেই আছে ওরা, আমার মনে হয়। অক্টোপাসের শেষ খবরঃ সব কিছু ঠিকঠাক আছে ওখানে। হারিকেনের সেন্টারে পড়ে না গেলে কোনও বিপদ হবে না। ভাববেন না, ভালই আছে ওরা।'

সুইচ অফ করে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কারটার। চলে এলেন জানালার কাছে। ভীষণ রেগে গিয়ে আঘাতের পর আঘাত হেনে যেন পুরনো বড় বাড়িটাকে ধসিয়ে দেয়ার অবিরাম চেষ্টা চালাচ্ছে ঝড়। পারছে না। কারণ, ততটা জোরালো হয়ে উঠতে পারেনি এখনও।

'রকি বীচে খবর দেব?' রবিন বলল।

'এখনও সময় হয়নি। অযথা ওদের মা-বাবাকে দুশ্চিন্তায় ফেলা হবে।'

'কি করব তাহলে?' এই উৎকণ্ঠা আর সইতে পারছে না রবিন, কেঁদে ফেলবে যেন।

'অপেক্ষা করব,' যথাসাধ্য শান্ত থাকার চেষ্টা করলেন কারটার। 'আর, চুপ করে বসে না থেকে কিছু খাবার তৈরি করে ফেলব। ডিনার।'

'আমার গলা দিয়ে কিছু নামবে না।'

'তুমি উপোস করলে তোমার শরীরেরও কোনও লাভ হবে না, প্ল্যাটফর্মে যারা রয়েছে তাদেরও কোনও উপকার হবে না। একটা কথা কেন ভুলে যাচ্ছ, সব রকম পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করেই তৈরি হয়েছে ওই প্ল্যাটফর্ম। যথেষ্ট মজবুত। ঝড় কিংবা ঢেউ ওটার কিছু করতে পারবে না।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল শুধু রবিন। গাছের মাথা ছাড়িয়ে বহুদূরের অদৃশ্য প্ল্যাটফর্মটা দেখার চেষ্টা করছে যেন তার দৃষ্টি।

অক্টোপাসের পায়ের কাছে আছড়ে ভাঙল আরেকটা বড় ঢেউ। মুসা, কিশোর, ক্যাপ্টেন পেক, হারডিন, সবাই তাকিয়ে রয়েছে কালো আকৃতিটার দিকে।

'সা-সা-সাগর···,' আতঙ্কে তোতলাতে শুরু করল মুসা। 'দা-দা-দা···'

ভারি বৃষ্টির চাদর ওদের দৃষ্টিপথ থেকে আবার আড়াল করে দিল ওটাকে।

'কি ওটা, হারডিন?' পেকও অবাক হয়েছে।

'আপনি চিনতে পারেননি, আমি কি করে চিনব? জীবনেও দেখিনি···'

আরেকবার বিদ্যুৎ চমকাল। আলোকিত করে দিল চারদিক। কালো জিনিসটা

রয়েছে। ঢেউয়ে দুলছে, ধীরে ধীরে শুঁড় নেড়ে সাঁতরাচ্ছে যেন।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' হাত তুলল কিশোর। 'আমার মনে হয়...' আরেকবার বিদ্যুৎ-চমক থামিয়ে দিল তাকে। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'দানব নয় ওটা, দানব নয়! সাবমেরিন! পুরনো, মরচে পড়া সাবমেরিন। আগাছা আর জলজ লতায় ঢেকে রয়েছে।'

'তা কি করে হয়? সাবমেরিন এত ছোট?' তাকিয়ে রয়েছে পেক। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে দেখার চেষ্টা করছে। 'তাছাড়া সান্তা ক্রুজে কোনও ডুবন্ত সাবমেরিন আছে বলে তো শুনিনি?'

'আমি শিওর...,' আবারও বিদ্যুৎ চমকে থামিয়ে দিল কিশোরকে। এবার বেশিক্ষণ রইল আলোর ঝিলিক। সবাই ভাল করে দেখতে পারল লম্বা, সরু জিনিসটাকে, আগাছায় ছেয়ে রয়েছে। পিঠের কনিং টাওয়ার চিনতে অসুবিধে হল না। এমনকি সরু গলুই আর কনিং টাওয়ারের মাঝে বসানো মরচে ধরা কামানটাও চিনতে পারল। জোরালো ঢেউয়ে লাফ দিয়ে উঠল যানটা, পলকের জন্যে ভেসে রইল যেন শূন্যে, তারপর কাত হয়ে পড়ল পানিতে, ডুবে গেল।

'গেল,' হাত নেড়ে বলল মুসা।

'কিশোর ঠিকই বলেছে,' হারডিন বলল। 'সাবমেরিনই ওটা।'

'বেশি ছোট,' বলল পেক। 'আর অনেক পুরনো। ওই যে কামানটা...ওরকম ডেক গান বসানো সাবমেরিন আর দেখিনি। শার্ক রীফে...' চুপ হয়ে গেল সে।

'আছে বলে শোনেননি,' কথাটা শেষ করে দিল ম্যানেজার। 'কিন্তু নিজের চোখেই তো...'

কথা শেষ করতে পারল না সে-ও। এতক্ষণ যা এসেছে তার মধ্য সব চেয়ে বড় ঢেউটা এসে ভাঙল, থরথর করে কেঁপে উঠল প্ল্যাটফর্ম, শুধু ডেক নয়, ড্রিলিং ডেরিকের মাথায় গিয়ে ফোয়ারার মত পড়ল ঢেউ-ভাঙা পানির ছিটে। ডেকে যেন বন্যা বয়ে গেল, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে চাইল ডেকে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে। লাইফ লাইন আঁকড়ে ধরে কোনমতে টিকে রইল ওরা।

'আর এক সেকেণ্ডও না! জলদি নিচে!' চিৎকার করে বলল ম্যানেজার।

হঠাৎ বেড়ে গেল বৃষ্টি। এত বেশি, একে অন্যকে দেখতেই অসুবিধে হল। লাইফ লাইন ধরে ধরে ওরা অনেক কষ্টে নেমে এল নিচের একটা ডেক হাউসের নিরাপদ আশ্রয়ে। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে প্ল্যাটফর্মের ওপর, কাঁপিয়ে দিচ্ছে, পানির স্রোত বইছে ওপরের ডেকে। ইস্পাতের সিঁড়ি আর করিডর বেয়ে গলগল করে নামছে পানি। সেটা থামানোর জন্যে ওয়াটার-টাইট সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হল ক্রুরা।

দুই গোয়েন্দা আর পেককে নিয়ে ক্রু-চীফের ছোট অফিসে চলে এল হারডিন। ঘড়িতে দেখা গেল, সাতটার ওপরে বাজে। নীরবে বসে পড়ল ওরা। কান পেতে শুনছে ঝড়ের গর্জন। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন অনুভব করছে প্ল্যাটফর্মের দুলুনি আর কাঁপুনি। ক্রুদের কোয়ার্টারে কেউ কেউ বাংকে শুয়ে আছে। রিক্রিয়েশন রুমে তাস খেলছে কয়েকজন, ঢেউয়ের প্রতিটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে থেমে যাচ্ছে ওদের হাত, কান পেতে শুনছে, অপেক্ষা করছে। কারও মুখে কথা নেই। মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকে ধপ করে বসে পড়ছে সদ্য ডিউটি থেকে ফেরা ভেজা, ক্লান্ত শ্রমিক। তার পরিবর্তে আরেকজন উঠে যাচ্ছে কাজ করতে।

'প্ল্যাটফর্মটা···টিকবে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'জানি না,' হারডিন বলল। 'মজবুত করে বানানো হয়েছে বটে, কিন্তু এরকম ঝড়ে আর পড়েনি কখনও। হারিকেনের সেন্টারটাই বোধহয় যাচ্ছে আমাদের ওপর দিয়ে।'

'না, এখনও যাচ্ছে না,' মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন। 'কাছিয়ে এসেছে। খারাপ অবস্থা এখনও অনেক বাকি।'

ঢেউয়ের পর ঢেউ ভাঙছে। গোঙাচ্ছে, কাঁপছে ইস্পাতের প্ল্যাটফর্মটা, যেন একটা আহত জানোয়ার। রক্ত-জমাট-করা ভয়ঙ্কর শব্দ।

'সাবমেরিনটার কথা ভাবছি আমি,' উদ্বেগ কমানোর জন্যে অন্য আলোচনা শু. করল কিশোর। 'ছোট। ক্যাপ্টেনের ধারণা, অনেক পুরনো। ডেক গান আছে। এখনকার সাবমেরিনে ওসব নেই। থাকে না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থাকত।'

গোটা দুই মস্ত ঢেউ পর পর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওপরের ডেকে।

'ঠিকই বলেছ,' পেক বলল। 'সেই সময়েরই হবে। তা এই অঞ্চলে কোনও সাবমেরিন ডুবেছে বলে শুনিনি।'

ধুড়ুম করে কি যেন পড়ল ওপরে। ভাঙলই বোধহয় কিছু।

'হয়ত,' সেদিকে কান না দিয়ে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল কিশোর, 'আমেরিকান সাবমেরিন নয়। জাপানী হতে পারে।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে। শুনিনি হয়ত সেজন্যেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল ক্যাপ্টেন।

ওপরের ডেকে নিশ্চয় কিছু ভেঙেছে। শ্রমিকদের চেঁচামেচি আর ভাঙা বস্তুটার গড়াগড়ির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ঘষা খাচ্ছে বিকট শব্দে।

'ওরকম একটা সাবমেরিনের কথা পড়েছি আমি,' বলে গেল কিশোর। 'ক্যালিফোর্নিয়া কোস্টে এসে আক্রমণ চালিয়েছিল। আঠারশো বার সালের পর ইউনাইটেড স্টেটসের মূল ভূখণ্ডে ওই প্রথম শত্রুর হামলা।' স্মৃতির

ইনসাইক্লোপীডিয়া হাতড়ে বেড়াল গোয়েন্দাপ্রধান। 'যদ্দুর মনে পড়ে, উনিশশো বেয়াল্লিশের ফেব্রুয়ারিতে। মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল কিনা ওটার, কে জানে। নইলে শত্রু এলাকায় একলা এসে ওভাবে হামলা চালায়!'

'হ্যাঁ, আমারও মনে পড়েছে,' হারডিন মাথা দোলাল। 'পার্ল হারবার পতনের কয়েক মাস পর। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে ভেসে উঠেছিল জাপানী সাবমেরিন, এলউড অয়েল ফিল্ডের কাছে দেখা গেছে। সূর্য ডুবছিল তখন। ডেক গান থেকে তীরের দিকে সই করে পঁচিশ রাউণ্ড ফায়ার করেছিল ওটা। তীরের বেশ কয়েক মাইল ভেতরে পড়েছিল শেল। কিন্তু জাপানী গোলন্দাজের নিশানা খারাপ ছিল হয়ত, কিংবা নার্ভাস হয়ে পড়েছিল, কোনও কিছুতে লাগাতে পারেনি। অন্ধকারে কেটে পড়ল সাবমেরিনটা। তবে আমার বিশ্বাস পালাতে পারেনি। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে টহল দিচ্ছিল তখন আমেরিকান নৌবহর। ওরা ডুবিয়ে দিয়েছে।'

প্ল্যাটফর্মে আঘাত হানল আরেকটা দানব-ঢেউ। ধাক্কার চোটে এক পাশে হেলে গেল যেন ইস্পাতের বিশাল কাঠামোটা, কিংবা হেলে গেছে বলে মনে হল। অফিস ঘরে ছোট ছোট জিনিস গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। ওপর থেকে চুইয়ে পড়তে লাগল ফোঁটা ফোঁটা পানি।

'এমনও তো হতে পারে,' কিশোর বলল। 'গভীর সাগরে ডোবেনি ওটা। ডুবেছে এসে এই এখানে, একেবারে শার্ক রীফে। জাপানীরাও কথাটা গোপন রেখেছে। কিংবা হতে পারে, সাবমেরিন ছিল দুটো।'

'তা পারে,' ক্যাপ্টেন বলল। 'দল বেধেই ঘুরত তখন সাবমেরিন।'

আরেকটা ঢেউ ভাঙল প্ল্যাটফর্মের গায়ে। কাঁপিয়ে দিল সব কিছু।'

'তাহলে,' বলল কিশোর। 'শার্ক হান্টারের ডাইভার লোকটা স্মাগলার কিংবা স্যাবোটার নয়। হয়ত ওই হারানো সাবমেরিনে কোনও জিনিস খুঁজছে সে।'

'এত বছর পর?' প্রশ্ন তুলল মুসা। 'মানে, এত দীর্ঘ সময় পর কেন? আর ওটা ওখানে আছে জানল কিভাবে?'

'সেটা জেনে নেব। তুফান কমলে রবিনকে লাইব্রেরিতে পাঠাব...'

ভীষণ জোরে আঘাত হানল আরেকটা ঢেউ। দুলে উঠল প্ল্যাটফর্ম, যেন পড়েই যাবে কাত হয়ে।

'শক্ত করে ধর!' চেঁচিয়ে উঠল হারডিন।

আলো নিভে গেল।

'দেখি তো কি হল?'

'আমরাও আসি,' ম্যানেজারের সঙ্গে সঙ্গে কিশোরও উঠে দাঁড়াল।

হারডিনের পিছু পিছু একটা ডেক হাউসে এসে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। ভারি কাচ, নাকি প্লাস্টিকে ঢাকা—ঠিক বোঝা গেল না, একটা পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে দেখল, লম্বা ক্রেনটা ভেঙে পড়েছে। ঘন বৃষ্টির জন্যে ডেরিক চোখে পড়ল না। দক্ষিণ থেকে গড়িয়ে আসছে প্রায় প্ল্যাটফর্মের সমান উঁচু বড় বড় ঢেউ, ওপরটা সাদা, বোধহয় ফেনা। ওরা চেয়ে থাকতে থাকতেই একটা ঢেউ এসে আছড়ে ভাঙল। কেঁপে উঠল প্ল্যাটফর্ম। পানির বন্যা বয়ে গেল ওপরের ডেকে।

'বুঝতে পারছি না কতক্ষণ সইতে পারবে!' চেঁচিয়ে বলল ম্যানেজার, অনিশ্চিত কণ্ঠস্বর।

নীরবে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর আর মুসা। বুঝতে পারছে না ওরাও। রাতটা কি পার করতে পারবে কোনমতে? বেঁচে থাকবে এই ভয়ানক ঝড়ের পরে?

ষোল

চোখ মেলল রবিন। বুঝল, কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। মিস্টার কারটারের স্টাডিতে একটা কাউচে শুয়ে রাত কাটিয়েছে সে। টান টান হল স্নায়ু, কান খাড়া। আস্তে মাথা তুলে ম্লান আলোকিত ঘরে চোখ বোলাল। কোনও শব্দ নেই। বিরাট বাড়িটার ভেতরে-বাইরে স্তব্ধ নীরবতা।

না, গোলমাল নয়। ভাল। ঝড় থেমে গেছে।

লাফিয়ে উঠে জানালার কাছে ছুটে গেল রবিন। পর্দা সরাতেই ঘরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন উজ্জ্বল রোদ। চেঁচিয়ে ডাকল সে, 'মিস্টার কারটার, তুফান শেষ!'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন লেখক। চোখ মেললেন। 'কি? কি হয়েছে?'

'ঝড়, স্যার। থেমে গেছে।'

আলোর দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করলেন কারটার। তারপর রবিনের মতই লাফিয়ে উঠে ছুটে এলেন জানালার কাছে। গাছপালা এখনও ভিজে চুপচুপে, পাতা থেকে টুপটুপ করে পানি ঝরছে। সারা আঙিনায় ছড়িয়ে রয়েছে ভাঙা ডাল, ছেঁড়া পাতা, পামের মোচা, ডাঁটা। নোংরা হয়ে আছে। এখানে ওখানে জমে রয়েছে পানি। বাতাস বন্ধ। আকাশে এখনও পেঁজা মেঘ ভাসছে, তার ফাঁকে ঝিলিক তৈরি করে আসছে সকালের রোদ, বিচিত্র দৃশ্য।

'কোস্ট গার্ডকে ডাকুন, স্যার।'

দ্রুত রেডিওর কাছে গিয়ে বসলেন লেখক। সুইচ অন করতেই খড়খড় করে উঠল স্পীকার। 'ডলফিন কলিং মিস্টার কারটার! কাম ইন, প্লীজ। ডলফিন

কলিং...'

'কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। আনন্দে চোখে পানি এসে গেল তার। 'কিশোর পাশা!'

মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কারটার, 'কিশোর, কেমন আছ তোমরা?'

'কিশোর, মুসা, তোমরা ভাল আছ?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

বিধ্বস্ত প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রবিনের কণ্ঠ শুনে হাসল কিশোর। মুসা চেয়ে আছে রেডিও রুমের জানালা দিয়ে, বাইরে, যেখানে ক্রেন ভেঙে পড়ে অনেকগুলো রেলিঙ ভেঙেছে, বাঁকিয়ে-চুরিয়ে দিয়েছে ইস্পাতের প্লেট। আরও নানা রকম ক্ষতি হয়েছে ঝড়ে। এখনও বড় বড় ঢেউ উঠছে, তবে গতি খুব কম। গড়িয়ে গড়িয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে দোলাচ্ছে প্ল্যাটফর্মটাকে।

'হ্যাঁ, স্যার,' জবাব দিল কিশোর। 'আমরা সবাই ভাল। নব্বই মাইল বেগে ঝড় এসেছিল, প্রচণ্ড মার মেরেছে প্ল্যাটফর্মটাকে। তবে টিকে গেছে ওটা।'

'তোমরা কি ডলফিনে এখন? আসছ?'

'না। ডলফিন ভেসে আছে, ব্যস। অর্ধেকটা ডুবে গেছে পানিতে। পাম্প করে পানি বের করার চেষ্টা করছেন ক্যাপ্টেন পেক। তেল কোম্পানির শ্রমিকেরা সাহায্য করছে। পানি না সেঁচে বোঝা যাবে না কতটা ক্ষতি হয়েছে। ডলফিনের ফ্রিকোয়েন্সিতে ডাকলাম আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে।'

'কিশোর, কিছু পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'পেয়েছি।' ঝড়ের সময় ভেসে ওঠা সাবমেরিনের কথা জানাল কিশোর। হিচহাইকারের কথা বলল। সব শেষে বলল, 'সত্যি যদি ওটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার জাপানী সাবমেরিন হয়ে থাকে, ওটার পেছনেই লেগেছে আমাদের হিচহাইকার সাহেব।'

'ওকে তাহলে এখন আর চোরাচালানী ভাবছ না?' কারটার বললেন।

'শিওর না এখনও। স্মাগলার হলে প্ল্যাটফর্মে লুকিয়ে থাকার কথা ছিল। খুঁজেছি, পাইনি। আমার বিশ্বাস, ঝড়ের সময় প্ল্যাটফর্মে ওঠেইনি সে। আপনার স্টাডিতে ঢুকে চুরি করে চার্ট দেখেছিল। এরও একটাই ব্যাখ্যা, ওই পুরনো সাবমেরিন।'

'কি আছে ওটাতে, কিশোর?' আনমনে বললেন লেখক। 'আর জানলই বা কি করে, আছে ওটা ওখানে?'

'সেকথাই আমিও জানতে চাই। মুসা বলছে, সোনা কিংবা অন্য কোনও

মূল্যবান জিনিস আছে। আর সেটা জেনে গেছে কেউ।'

'তাহলে এখন কি করব?' রবিনের প্রশ্ন।

'যত তাড়াতাড়ি পার, লাইব্রেরিতে যাও। দেখ, রেফারেন্স বইতে ওরকম কোনও সাবমেরিনের কথা লেখা আছে কিনা। ওটাতে কোনও জিনিস ছিল কিনা। আর সাবমেরিন কি একটা এসেছিল, না দুটো?'

'তারপর?'

'এখানকার স্থানীয় পত্রিকা যে ক'টা পাও, সব ঘেঁটে দেখবে, গত কিছু দিনের। সাবমেরিনটার কথা কিছু লেখা থাকতে পারে।'

'দেখব।'

'তুমি আর মুসা কি করবে?' অস্বস্তি ঢাকতে পারছেন না কারটার, কণ্ঠস্বর প্রকাশ করে দিচ্ছে।

'ডলফিনকে মেরামত করতে সাহায্য করব। সেই সাথে চোখ রাখব, ডাইভার আর তার শার্ক হান্টারকে আবার দেখা যায় কিনা। সাগর আরেকটু শান্ত হয়ে এলেই ডুবুরির পোশাক পরে ডুব দেব। দেখে আসব সাবমেরিনটা।'

সতর্ক হয়ে উঠলেন কারটার। চট করে তাকালেন রবিনের দিকে। তিন গোয়েন্দার নথি-গবেষকও অস্বস্তিতে ভুগছে, ঠোঁট কামড়াচ্ছে নীরবে।

মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নামালেন আবার লেখক। 'কিশোর, কাজটা খুব বিপজ্জনক। বিশেষ করে এই আবহাওয়ায়। ঝড় গেছে, যে কোনও সময় যে কোনও জায়গায় সাগরের তলা ঠেলে উঠতে পারে, ভয়ঙ্কর উথলে উঠবে তখন পানি। তাছাড়া এমনিতেও ওই রীফটা সুবিধের না, খারাপ। আর হাঙরের কথা বাদই দিলাম। যদি যেতেই হয়, ক্যাপ্টেন পেককে নিয়ে যাবে। সে যেতে না পারলে হারডিন কিংবা অন্য কোনও অভিজ্ঞ ডুবুরিকে সঙ্গে নেবে। একা কিছুতেই যাবে না। বুঝেছ?'

'রীফটা তো তেমন গভীর মনে হল না, স্যার। ঠিক আছে, মিস্টার হারডিন যতক্ষণ যেতে না বলবেন, যাব না।'

'বেশ। তবে তার আগে আমার সঙ্গে কথা বলে নিতে বল।'

'আচ্ছা,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল কিশোর।

রবিনের দিকে ফিরলেন কারটার। 'এবার নাস্তাটা সেরে নেয়া যায়। খেয়ে তুমি লাইব্রেরিতে চলে যাও। আমি তোমার বাবাকে ফোনে জানাব, কিশোর আর মুসা ভাল আছে। ওদের বাড়িতে যেন বলে দেয়।'

ডিম, মাংস আর রুটি দিয়ে দ্রুত নাস্তা সেরে নিল দু'জনে। রবিন বেরিয়ে পড়ল, রওনা হল লাইব্রেরিতে। উজ্জ্বল রোদ। কিন্তু আকাশের মুখ পরিষ্কার হয়নি

এখানে ওখানে মুখ গোমড়া করে দিয়েছে যেন ভারি মেঘ। পথেঘাটে যেখানে সেখানে পানি। অনেক রাস্তার ওপর গাছের ডাল ভেঙে পড়ে আছে, কোথাও উপড়ে রয়েছে আস্ত গাছ। বাড়িগুলোর আঙিনা সব নোংরা। মিশন ক্রীক নদীর দু'কূল ছাপিয়ে সগর্জনে বয়ে চলেছে তীব্র পানির স্রোত।

লাইব্রেরিতে ঢুকল সে। আগে লাইব্রেরিয়ানকে জিজ্ঞেস করল। সাবমেরিনটার কথা কিছু জানেন না তিনি। তবে, সাবমেরিন-আক্রমণের ওপর গোটা চারেক বইয়ের নাম বললেন। এই উপকূলে জাপানী হামলার কথা চারটে বইতেই লেখা রয়েছে, প্রায় একই রকম বক্তব্য। মূল্যবান কিছু ছিল ওটায়, এর সামান্যতম আভাসও নেই কোনটাতে। তবে একটাতে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে, সাবমেরিনটা সত্যি পালিয়ে বাঁচতে পেরেছে কিনা।

খুব মন দিয়ে লেখাটা পড়ল রবিন, কয়েকবার। বলা হয়েছে, উত্তর-পশ্চিমে পয়েন্ট কনসেপসিয়নের দিকে চলে গিয়েছিল সাবমেরিনটা। পালাতে পেরেছিল কিনা, নিশ্চিত নয় আমেরিকান নেভি। কারণ, এরপর অনেক দূর জুড়ে চক্কর দিয়েছিল নেভির বিমান, তন্নতন্ন করে খুঁজেছিল। কিন্তু সাবমেরিনটার আর কোনও চিহ্নই দেখতে পায়নি। তবে স্থলভাগের দু'একজন নাকি ওটাকে দক্ষিণ-পশ্চিম সান্তা ক্রুজ দ্বীপের দিকে যেতে দেখেছে।

শেষ অংশটুকু পড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। চারটে বইই ফিরিয়ে দিয়ে গেল ডেস্কে।

'বইতে নিশ্চয় কিছু পাওনি, তাই না?' লাইব্রেরিয়ান বললেন। 'এখন আমার মনে পড়েছে, কয়েক মাস আগে সান প্রেস পত্রিকায় একটা পুরনো সাবমেরিনের কথা লিখেছিল। ডুবুরি, নাকি জেলেরা এসে যেন একটা গল্প বলেছিল। মাইক্রোফিল্মে কপি করা আছে কাগজটা। দেখতে চাও?...বেশ। ভিউয়ারটা পেছনে।'

পত্রিকাটা আগের বছরের। মাইক্রোফিল্ম নিয়ে এসে ফিল্মরীডারে ভরল রবিন। মাস তিনেক আগের ঘটনা। ভেতরের পাতায় ছাপা হয়েছে ছোট্ট প্রতিবেদনটাঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার জাপানী সাবমেরিন
আবিষ্কার করেছে ডাইভাররা।

সান্তা বারবারা (এপি)—গতকাল, সান্তা ক্রুজ আইল্যাণ্ডের কাছে সাগরের তলায় একটা পুরনো সাবমেরিন দেখতে পেয়েছে তেল কোম্পানির ডুবুরিরা। নতুন একটা ড্রিলিং প্ল্যাটফর্ম তোলার জন্যে ওখানটায় সার্ভে করেছিল তখন ওরা। ওদের ধারণা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের

সময়ের জাপানী সাবমেরিন ওটা।

নেভিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তারা জানিয়েছে, ওই এলাকায় ডুবন্ত সাবমেরিনের কোনও রেকর্ড নেই তাদের কাছে। বাজেয়াপ্ত করা জাপানী কাগজপত্র ঘেঁটে জানার চেষ্টা করবে নেভি। হয়ত বছরের শেষে একটা ডুবুরি-দলকেও পাঠাতে পারে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখার জন্যে।

মাইক্রোফিল্মটা তাড়াতাড়ি বের করে নিল রবিন। উঠে ঘুরে চেয়েই চমকে গেল। বিশালদেহী একজন লোক!

'দারুণ গপ্পো তো,' বলল ডিড কুইমবি। 'ওদিকে, পেছনে আরেকটা দরজা আছে, খোকা। চুপচাপ চলে যাও। যাও!'

নির্দেশ মানল না রবিন। লাইব্রেরিয়ানের অফিসের দিকে দৌড় দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু ধরে ফেলল তাকে ডিড। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলল রবিন। মুখ চেপে ধরল ডিডের ভালুকের মত থাবা। পাঁজরে কঠিন কিছুর ছোঁয়া পেল রবিন।

'চুপ! একেবারে চুপ!' ভালুকের মতই গোঁ গোঁ করে উঠল ডিড। 'হাঁটো।'

পেছনের দরজা দিয়ে রবিনকে বের করে নিয়ে এল ডিড। গলিতে দাঁড়িয়ে আছে পুরনো একটা ফোর্ডগাড়ি। স্টিয়ারিঙে বসা ফেড কুইমবি।

সতের

পেছনের সীটে রবিনকে চেপে ধরে রেখেছে ডিড। মুখ বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল রবিন, তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অপরিচিত পথ···না না, ঠিক অপরিচিত নয়। কেমন চেনা চেনা লাগছে না? এপথে আগেও এসেছিল মনে হয়?

'পরের ব্লক, ফেড,' ভাইকে বলল ডিড। 'সেকেণ্ড ড্রাইভওয়ে দিয়ে গিয়ে বাড়ির পেছনে রাখ।'

পরের ব্লকের কাছে এসে গতি কমল গাড়ির। সোজা হয়ে বসে তাকিয়ে রইল রবিন। একটা পরিচিত ড্রাইভওয়েতে নিয়ে গিয়ে গাড়ি ঢোকাচ্ছে ফেড।

মিস্টার কারটারের বাড়ি!

ড্রাইভওয়ের শেষ মাথায় গাড়ি থামাল ফেড। ঠেলা দিয়ে রবিনকে গাড়ি থেকে নামাল ডিড। ধাক্কা দিল আগে বাড়ার জন্যে। পেছনের গেট পেরিয়ে পেছনের দারজার দিকে এগোল ওরা। চোখ মিটমিট করছে রবিন, বিশ্বাস করতে পারছে না। তাকে এনে ঢোকানো হল কারটারের অগোছাল স্টাডিতে।

'যাক, এসেছে,' বলল একটা মোলায়েম কণ্ঠ।

কোণের রেডিওটার কাছে বসে আছেন কারটার। কথাটা তিনি বলেননি। বলেছে ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়ানো বেঁটে, টাকমাথা আরেকজন। হাতে বড় একটা পিস্তল। জাপানী ব্যবসায়ী, জনাব চিকামারা। হাসল রবিনের দিকে চেয়ে, নিরুত্তাপ হাসি। 'বসে পড়, ইয়াং ম্যান। তুমি নিশ্চয় মিলফোর্ড, মাস্টার মিলফোর্ড?'

'আ-আপনি···,' কথা সরছে না রবিনের মুখ দিয়ে। সামলে নিয়ে বলল, 'আপনি এখানে কি করছেন?'

'কোনও কথা নয়,' পিস্তল নাচাল চিকামারা। জ্বলে উঠল তার কালো চোখ। 'তোমাকে বসতে বলা হয়েছে।' কুইমবিদের দিকে চেয়ে ইশারা করল সে।

টেনে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে রবিনকে কাউচে ফেলল ডিড। চড় মারল নাকে-মুখে। ককিয়ে উঠল রবিন। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন কারটার। তার দিকে পিস্তল ফেরাল চিকামারা। 'উঁহুঁ, বসে পড়ুন। এটা কোনও খেলা নয়। দরকার পড়লে এই অস্ত্রটাও ব্যবহার করা হবে। আপনারা শান্ত থাকলে আমাদের সবার জন্যেই ভাল।'

'এসব করে পার পাবে না তুমি!' গর্জে উঠলেন বটে কারটার, কিন্তু ধীরে ধীরে বসে পড়লেন আবার।

'ভেরি গুড।' হাসল চিকামারা। দামী সিল্কের স্যুটের কোণ থেকে একটা আলগা সুতো সাবধানে টেনে বের করে ফেলে দিল।

এই প্রথম লক্ষ্য করল রবিন, মিস্টার কারটারের কপালে পাতলা একটা কাটা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। তারমানে নির্বিবাদে ধরা দেননি লেখক।

'আপনিই যত শয়তানীর মূল!' চিকামারার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'চুপ!' ধমক দিল চিকামারা। 'আমাদের জাপানে বাচ্চারা কখনও জোরে কথা বলে না।'

'ও ঠিকই তো বলেছে, তুমিই যত শয়াতনীর গোড়া!' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন কারটার। 'আমাদের ওপর চোখ রেখেছ, আশেপাশে ঘুরঘুর করেছ। আর তোমার গোলামি করেছে ওই কুইমবি দুটো। জেটিতে সেদিন ইচ্ছে করেই গোলমাল বাধিয়েছে। প্ল্যাটফর্মে স্যাবোটাজ করেছে ওরাই।'

হেসে অপরাধ স্বীকার করে নিল দুই ভাই। ডিড মুখ খুলতে যাচ্ছিল, চিকামারার কঠোর দৃষ্টি দেখে থেমে গেল।

'নিশ্চয় ওই সাবমেরিনের খোঁজে এসেছেন,' চুপ থাকতে বলা হলেও থাকল না রবিন। 'এবং আর কেউ জানুক, সেটা চান না। সে-জন্যেই চাইছেন বিরোধীদের প্রতিবাদ থেমে যাক। আর ক্যাপ্টেন পেকের বোটের তলায় করে চুরি করে

ডাইভার পাঠাচ্ছেন।'

এক মুহূর্ত রবিনের দিকে চেয়ে থাকল চিকামারা। 'যা ভেবেছিলাম। অনেক বেশি জেনে ফেলেছ।'

'সরিয়ে দেব নাকি?' ফেড অনুমতি চাইল।

'না, ওদেরকে আমার দরকার।' সাপের চোখের মত শীতল চোখের দৃষ্টি ঘুরল রবিন আর কারটারের ওপর। 'যা বলব করতে হবে। তাহলে আর কোনও ক্ষতি করা হবে না। কাজ শেষে ছেড়ে দেব। আমরা অত্যন্ত সিরিয়াস। কয়েকটা কথা বললেই বুঝে যাবে।' ঘরের মধ্যে বার কয়েক পায়চারি করল চিকামারা। হাঁটতে হাঁটতেই বলল, 'জানালায় দাঁড়িয়ে তোমাদের কথা শুনেই বুঝলাম, বোটের নিচে করে যে ডাইভার যায় একথা জেনে ফেলেছে অন্য ছেলে দুটো। ওর ফেরার অপেক্ষায় আছে। তারপর এল ঝড়। ভাবলাম বোট ডুবে মারা পড়েছে ওরা, ডাইভার ব্যাটাও খতম। গেছে জাহান্নামে। ওদের কপাল খারাপ, আমি কি করব?'

ভুরু কোঁচকাল রবিন। 'আপনি এসেছিলেন, শুনতে?'

দাঁড়িয়ে গেল চিকামারা। ধমক দিয়ে বলল, 'বলেছি না, কোনও কথা নয়!' তারপর আবার পায়চারি শুরু করল। 'কিন্তু আজ সকালে আমার সহকারীরা ডলফিনের রেডিও মেসেজ শুনে জানল, ছেলেগুলো মরেনি, আরামেই রয়েছে প্ল্যাটফর্মে। সাবমেরিনটার কথাও জেনে ফেলেছে। কোঁকড়াচুলো এশিয়ান ছেলেটা, ইণ্ডিয়ান নাকি?...অতিরিক্ত চালাক। একে বলল,' বুড়ো আঙুল দিয়ে রবিনকে দেখাল সে, 'লাইব্রেরিতে গিয়ে খোঁজখবর নিতে। সাবমেরিনটা দেখার জন্যে সাগরেও নাকি নামবে। খুব খারাপ করবে তাহলে।'

হেসে উঠল ফেড। 'সাবমেরিনটার কথা কাউকে জানতে দিতে চান না উনি। তাই তো আমাকে পাঠালেন এই ছেলেটাকে ধরে নিয়ে আসতে।'

'তোমরা কোনও কথা বলবে না,' কড়া গলায় ফেডকে বলে আবার রবিন আর কারটারের দিকে তাকাল চিকামারা। তিনটে কারণে ধরা হয়েছে তোমাদের। এক, তোমাদের বন্ধুরা কি করছে জানা, হয়ত জানিয়ে দিতে পারে পুলিশ কিংবা কোস্ট গার্ডকে। সেটা আমি চাই না। দুই, প্ল্যাটফর্মে কখন কি ঘটছে, শুনতে চাই। তিন, আমি চাই না, লাইব্রেরিতে কি জেনেছ, সেটা বন্ধুদের জানিয়ে দাও তুমি। বরং জানাবে আমি যা জানাতে বলব সেকথা।' থেমে রবিনের দিকে তাকাল সে। 'যা বলব, করবে। ছাড়া পেয়ে যাবে তাহলে।'

জবাব দিল না রবিন আর কারটার। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নীরবে মাথা ঝাঁকাল শুধু। আপাতত চিকামারার কথা শোনা ছাড়া উপায় নেই।

বিরক্ত চোখে জাপানী ব্যবসায়ীর দিকে তাকাল রবিন। 'কী এমন আছে ওই

সাবমেরিনে?'

গোমড়া মুখ আরও গোমড়া হয়ে গেল চিকামারার। 'কোনও প্রশ্ন নয়।'

খড়খড় শুরু করল রেডিওর স্পীকার। কিশোরের কণ্ঠ ভেসে এল, 'ডলফিন কলিং মিস্টার কারটার। শুনছেন, স্যার?'

'মাথা ঝাঁকিয়ে নির্দেশ দিল চিকামারা। সেই সঙ্গে ইঙ্গিতে হুঁশিয়ার করে দিল, উল্টোপাল্টা কথা না বলার জন্যে। মাইক্রোফোনের দিকে ঘুরলেন কারটার। সাড়া দিয়ে বললেন, 'কি হয়েছে, কিশোর?'

'ডলফিনকে মেরামত করতে নামব। পানি সেঁচে ফেলা হয়েছে। ক্যাপ্টেন পেকের ধারণা, বোটের খুব ক্ষতি হয়েছে। সারতে কত সময় লাগবে, আন্দাজ করতে পারছেন না। বলছেন, পুরো একদিন কিংবা বেশিও লেগে যেতে পারে।'

একটা নোট বাড়িয়ে দিল চিকামারা। হাতে নিয়ে জোরে জোরে পড়লেন কারটার, 'অন্য বোট পাঠিয়ে টেনে নিয়ে আসতে পারি তোমাদের।'

'না, স্যার, এখন নয়। রহস্যের সমাধান করতে পারব এখানে থাকলে। জানেন কেন ডলফিনের প্রপেলার নষ্ট হয়েছে? এইমাত্র আবিষ্কার করলেন ক্যাপ্টেন পেক। ইস্পাতের জালে বড় বড় লোহার টুকরো পেঁচিয়ে প্রপেলারের ব্লেডে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। একটা ব্লেড ভেঙেছে, বাকিগুলো বাঁকা হয়ে গেছে। আমাদেরকে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল, স্যার। কে করেছে জানি আমি।'

চিকামারার দিকে তাকালেন কারটার। মাথা ঝাঁকাল জাপানী। 'কে, কিশোর?' জিজ্ঞেস করলেন লেখক।

'কুইমবিরা।' রাগ চাপা দিতে পারল না কিশোর। 'ওরাই সবার পরে আমাদের কাছ থেকে গেছে কাল। একবার একেবারে আমাদের প্রায় ওপরে চলে এসেছিল। ওদেরই একজন পানির তলায় নেমে গিয়ে জালটা ফেলে এসেছে।'

'মস্ত ঝুঁকি নিয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা নিয়েছে। তবে মরার ভয় ছিল না। ওরা অভিজ্ঞ ডাইভার। তাছাড়া তখন খুব আস্তে চলছিল ডলফিনের এঞ্জিন। সবই হয়ত ওরা জানে। আপনার সঙ্গে রেডিওতে যে কথা বলেছি তা-ও হয়ত শুনেছে। ওরা এখন কোথায় জানি না। আপনি আর রবিন সাবধানে থাকবেন।'

'থাকব।'

'লাইব্রেরি থেকে রবিন ফিরেছে?'

মাথা নাড়ল চিকামারা।

'না; ফেরেনি,' কারটার জবাব দিলেন।

'অনেক দেরি করছে তো! কিছু পেল কিনা কে জানে? বলবেন, ও এলেই যেন

আমার সঙ্গে কথা বলে। সাগর খুব তাড়াতাড়ি শান্ত হয়ে আসছে। আশা করছি লাঞ্চের পরেই নামতে পারব।' যোগাযোগ কেটে দিল কিশোর।

মাইক্রোফোনের সুইচ অফ করে দিলেন কারটার। চিকামারার দিকে চেয়ে কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'ওদের খুন করতে চেয়েছিলে তুমি?'

'কি করব, বল? ডাইভারকে দেখে ফেলেছিল। ওর ফেরার অপেক্ষায় ছিল। কুইমবিদের বলতে বাধ্য হলাম।'

গর্বিত হাসি হাসল ফেড। 'দারুণ একখান ডুব দিয়েছি। ডিডও বিশ্বাস করতে পারছিল না একাজ করতে পারব। ওই ঢেউয়ের মধ্যে চলন্ত প্রপেলারের কাছে যাওয়া মারাত্মক…তবে মাঝে মাঝে ঝুঁকি নিতে হয় মানুষকে, তাই না? চিকামারা রেডিওতে বললেন প্রপেলার ভেঙে দিতে, দিলাম।'

বিষিয়ে গেল কারটারের মন। চোখে ঘৃণা। 'তো, এখন আর কি কি করতে হবে আমাদের?'

'ঘন্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবে এই ছেলেটা,' রবিনকে দেখিয়ে বলল চিকামারা। 'প্ল্যাটফর্মে যোগাযোগ করবে। বন্ধুদের জানাবে, সাবমেরিন সম্পর্কে কোনও তথ্য জোগাড় করতে পারেনি।'

এক ঘন্টা পেরোল। রবিনকে ইশারা করল চিকামারা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে গিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে ঝুঁকল রবিন। ভাবছে, একটা উপায়…ইস্, একটা কোনও বুদ্ধি যদি এসে যেত মাথায়, কোনভাবে যদি বোঝানো যেত কিশোরকে…কিন্তু কোনও বুদ্ধি বের করতে পারল না। বলল, 'কলিং ডলফিন, রবিন মিলফোর্ড কলিং ডলফিন। কাম ইন।'

স্পীকারে ভেসে এল মুসার গলা। 'সেকেণ্ড বলছি, নথি। মিস্টার পেকের সঙ্গে কিশোর নিচে গেছে ডুবুরির পোশাক চেক করতে। লাইব্রেরিতে কি পেয়েছ?'

চিকামারার দিকে তাকাল রবিন। 'কিছু না, মুসা। নতুন কিছুই পাইনি।'

'খাইছে!' হতাশ মনে হল মুসাকে। 'আমরা তো শিওর ছিলাম…ওই যে, কিশোর আসছে।'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কিছুই পাওনি, রবিন? কিচ্ছু না?'

'কিচ্ছু না,' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে রবিন।

'সাবমেরিনটার কথা কিছুই লেখা নেই কোথাও?'

'নতুন কিছু না।'

'কি লিখেছে, বল তো?'

'লিখেছে…,' বুদ্ধিটা মাথায় এসে গেল রবিনের।

'কি লিখেছে, বল,' অধৈর্য হয়ে উঠছে কিশোর।

'নতুন কিছু না।'

'সাবমেরিনটার পালানর কথা কিছু লেখেনি? গুপ্তধন? দ্বিতীয় কোনও সাবমেরিন?'

'না।'

'শার্ক রীফে ওই সাবমেরিনটা দেখা যাওয়ারও কোনও খবর নেই? ইদানীংকার কোনও খবর?'

'নেই।' আড়চোখে চিকামারার দিকে তাকাল রবিন। তার চালাকি বুঝতে পারছে না তো জাপানীটা?

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। হতাশ কণ্ঠে বলল, 'তাহলে আর কি? কেউ যদি দেখেই না থাকে, না-ই জানে রীফে রয়েছে সাবমেরিনটা, তাহলে ওটা খুঁজতে যাবে না কেউ। মনে হয় ভুল করেছি আমরা।'

হাসি ফুটল চিকামারার মুখে। বসের দেখাদেখি দুই কুইমবিও হাসল।

'কিন্তু,' হঠাৎ বলে উঠল কিশোর। 'একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেলাম, ডাইভার ব্যাটা স্মাগলার কিংবা স্যাবোটার নয়। প্ল্যাটফর্মে কোনও সময়ই আসেনি। আর মিস্টার কারটারের স্টাডিতে ঢুকে চার্টও শুধু শুধু দেখেনি। কারণ আছে। যা-ই হোক, আমরা নামছি। সাবমেরিনটা দেখতে যাব।'

শব্দ করে হাসল রবিন। 'নিশ্চয় যাবে। যাও।'

'ফিরে এসেই আবার যোগাযোগ করব তোমার সাথে।'

নীরব হয়ে গেল রেডিও। ভুরু কোঁচকাল চিকামারা। ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল রবিনের হৃৎপিণ্ড। তার চালাকি বুঝে ফেলল নাকি লোকটা?

'যাচ্ছেই তাহলে?' বলল জাপানী ব্যবসায়ী। 'বেশ, আমরাও অপেক্ষা করব ওরা কি দেখে আসে শোনার জন্যে। এক হিসেবে খারাপ হল না। আমাদের কাজটা ওরাই করে দেবে এখন।' সন্তুষ্টির হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

রবিনও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। আপাতত নিরাপদ সে। কিন্তু কিশোর কি তার কথায় কিছু আঁচ করতে পেরেছে? মেসেজ পেয়েছে?

আঠার

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে প্ল্যাটফর্মের রেডিও রুম থেকে খোলা ডেকে বেরিয়ে এল কিশোর। তার পেছনে মুসা।

'রবিনের কথায় অবাক হওনি তুমি, সেকেণ্ড?'

উল্টে পড়া বিকল ক্রেনটা পানিতে ফেলে দিয়েছে ক্রুরা। ওপরের ডেক

মেরামতে ব্যস্ত এখন। নীল সাগর থেকে ধীরে গড়িয়ে আসা ঢেউয়ের দোলায় মৃদু দুলছে প্ল্যাটফর্ম।

'হ্যাঁ, কেমন যেন মনে হল,' মুসা বলল। 'নিরাশ নিরাশ ভাব। হয়ত কিছু পায়নি বলেই।'

'কি জানি। বার বার প্রশ্ন করতে হল তাকে। অথচ ওসব নিজে থেকেই বলে ফেলার কথা তার। উত্তেজনায় ফেটে পড়ার কথা।'

'ওই যে বললাম, খুব হয়েছে।'

'হয়ত।'

নিচের ডেকে নেমে এল ওরা। রবিনের নিরাসক্ত কথাবার্তার ব্যাপারটা ছাড়াও এখন এনেক কিছু ভাবার আছে কিশোরের। স্ক্যুবা ডাইভিং ইক্যুইপমেন্টগুলো নেড়েচেড়ে দেখছে হারডিন, স্টোরেজ রুমে। ওদের সাড়া পেয়ে মুখ তুলে তাকাল। 'ঠিকই আছে সব। তো, রবিন কিছু জানল?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল মুসা।

'তবে,' কিশোর বলল। 'আমার এখনও বিশ্বাস, ওই সাবমেরিনেই রয়েছে সব রহস্যের চাবিকাঠি। গিয়ে দেখতেই হচ্ছে আমাদেরকে।'

'বেশ। চল।'

লাঞ্চের পরেও আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। সাগর আরও শান্ত না হলে নামা উচিত হবে না। বসে রইল না ওরা, স্ক্যুবা ইক্যুইপমেন্টগুলো বয়ে আনতে লাগল ওপরের ডেকে।

'ডলফিন তো অকেজো,' হারডিন বলল। 'প্ল্যাটফর্মের বোটটাই এখন ভরসা।'

ডেকের কিনারে শেকল দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে মোটরবোটটা। ইস্পাতের তৈরি খোল, আউটবোর্ড এঞ্জিন। সাধারণ নৌকার তুলনায় লম্বা, সাগরে চলাচলের উপযোগী, তবে ডলফিনের চেয়ে অনেক ছোট।

'আরেকজন লোক লাগবে আমাদের,' বলল ম্যানেজার। 'তিনজন নামলে ভাল হবে, নিরাপত্তা বেশি। আমাদের একজন ডাইভারকে নিয়ে নেব। কিশোর, বোটটা সামলাতে পারবে?'

'আমি,' ঢোক গিলল কিশোর। মোটরবোটটার দিক থেকে চোখ ফেরাল উত্তাল সাগরের দিকে। 'আমি কি পারব? তারচে ক্যাপ্টেন পেককে নিয়ে গেলে ভাল হয় না? আমি বরং প্ল্যাটফর্মেই থাকি।'

হেসে ফেলল মুসা। 'কি ব্যাপার? ভয় পেলে নাকি?'

'না, কিশোর ঠিকই বলেছে,' মুচকি হাসল হারডিন। 'ওর রেডিওর কাছে

থাকাই ভাল। রবিন আবার কখন ডাকে। জরুরী কোনও খবর থাকতে পারে।'

'সে-ই ভাল,' হাসিতে দাঁত বেরিয়ে গেছে মুসার। 'কিশোর মিয়ার হাতে স্টিয়ারিং দিলে বোটই হয়ত ডুবিয়ে দেবে।'

আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল কিশোর। ক্যাপ্টেনকে ডাকতে গেল হারডিন। ফিরে এল পেক, আর আরও একজনকে নিয়ে। লোকটার নাম ডেনিং, অয়েল কোম্পানির বেতনভোগী ডাইভার। নৌকায় কয়েকটা বাড়তি এয়ার-ট্যাংক তুলে নিল সে। আর একটা লম্বা ব্যাগ। নৌকা পানিতে নামাল কয়েকজন শ্রমিক। ইতিমধ্যে ওয়েটস্যুট পরে নিল মুসা, হারডিন আর ডেনিং। লম্বা দড়ি বেয়ে নৌকায় নামল চারজনে। এঞ্জিন স্টার্ট দিল পেক। রওনা হল ওরা।

গলুইয়ের কাছে বসেছে মুসা। ঢেউয়ে ভীষণ দুলছে নৌকা, কিন্তু ডোবার কোনও ভয় নেই। সেভাবেই তৈরি হয়েছে, আর চালকও খুব দক্ষ। হারডিন বসেছে মুসার পেছনে।

'আধ মাইল মত দূর হবে,' ম্যানেজার বলল। 'কিশোরেরও তা-ই অনুমান। শার্ক রীফের দক্ষিণ ধারে ভেসে উঠেছিল ওটা।'

'ঝড়ে সরিয়ে নেয়নি তো?'

'নিতেই পারে,' মুসার কথায় সায় জানাল ডেনিং। 'এক কাজ করব। ঠিক রীফের ওপর নোঙর ফেলব। তারপর অনেকখানি জায়গা জুড়ে চক্কর দিয়ে খুঁজব। আস্তে আস্তে সরে যাব বেশি পানির দিকে।'

এতে একমত হল সবাই।

মাত্র আধ মাইল পথ। যেতে আর কতক্ষণ। রীফের কাছাকাছি এসে পানিতে একটা প্রকট পরিবর্তন চোখে পড়ল মুসার। বড় লম্বা ঢেউ আসছে না এখানে, তার জায়গায় ছোট ছোট এলোমেলো ঢেউ। ছল-ছলাৎ করে বাড়ি মারছে ধাতব গুলুইয়ের তলায়। সামনে কয়েক শো' মিটার দূরে সাদা ফেনা রীফের সীমারেখা তৈরি করেছে।

'এসে গেছি,' ক্যাপ্টেন বলল। 'ঠিক কোথায় রাখতে হবে?'

প্ল্যাটফর্ম আর সান্তা ক্রুজ আইল্যাণ্ডের মাঝামাঝি একটা জায়গা দেখাল হারডিন। তিনটেকে তিনটে বিন্দু কল্পনা করলে এক সারিতে পড়ে। নোঙর ফেলল পেক। পানি এখানে মাত্র পাঁচ মিটার গভীর। লম্বা ব্যাগটা খুলে তিনটে ভারি স্পিয়ার গান বের করল ডেনিং।

চোখ বড় হয়ে গেল মুসার। 'হাঙর! হায় হায়, ভুলেই গিয়েছিলাম!'

'হ্যাঁ, এখানে হাঙর আছে,' ম্যানেজার বলল। 'এত ভয়ের কিছু নেই। বেশির ভাগই নিরীহ। খারাপগুলো থাকে খোলা সাগরে, জান নিশ্চয়। তবু, হুঁশিয়ার থাকা

ভাল।'

'হ্যাঁ। রীফেও মাঝে মাঝে দু'চারটা খারাপ চলে আসে। আগেও বহুবার রীফের কাছে ডুব দিয়েছি।'

'গুড। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। হাঙর দেখলে ভয় পেয়ে হঠাৎ কিছু করে বসবে না। তাতে বিপদ বাড়বে।'

মাথা কাত করল মুসা।

সাগরে নামল তিন ডুবুরি। ধীরে ধীরে সাঁতরে চলল। যতই গভীরে নামছে, শান্ত হয়ে আসছে পানি, ওপরের উথালপাতাল ঢেউ এখানে পৌঁছুতে পারছে না। তবে ঝড়ের পর পানি কিছুটা ঘোলা হয়ে গেছে। তলায় অসংখ্য ছোট-বড় পাথুরে টিলা। সেখানে সাঁতরে বেড়াচ্ছে ছোট মাছের দল।

আরও নিচে পানি পরিষ্কার। প্রথম হাঙরটা দেখা গেল। ছোট। সামনে কিছু দূরে অলস ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করছে। মুসার গায়ে হাত রাখল হারডিন। সে ফিরে তাকাতেই মুখোশের ভেতরে হাসল। অর্থাৎ, ভয়ের কিছু নেই, ওটা নিরীহ হাঙর।

মুসাও সেটা বুঝতে পারছে।

এগিয়ে চলেছে ওরা। কিছু দূর এগিয়ে বাঁয়ে মোড় নিল। ঢালু হয়ে নেমে গেছে সাগরতল। সাবমেরিনের খোঁজ শুরু হল এখান থেকে। অনেক বেশি মাছ এখানে। ঝাঁক বেঁধে রয়েছে। নিঃসঙ্গ মাছও আছে। গোটা তিনেক রঙিন চিংড়ি দেখতে পেল মুসা। পাথরের গা কামড়ে রয়েছে হাজারো শামুক গুগলি। যেমন বিচিত্র চেহারা, তেমনি রঙ। হাস্যকর ভঙ্গিতে পাশে হেঁটে দ্রুত সরে যাচ্ছে কাঁকড়া, ভাঁড় একেকটা। ঘন লতা-জঙ্গলের মত জন্মে রয়েছে জলজ আগাছা, স্রোতের টানে কাত হয়ে যাচ্ছে, যেন দুলছে বাতাসে।

হঠাৎ চোখে পড়ল ওটা!

স্পিয়ার গান তুলে দেখাল ডেনিং, সে-ই প্রথম দেখেছে।

বড় কালো একটা ছায়া। আরও এগিয়ে দেখা গেল গায়ে জন্মে রয়েছে জলজ উদ্ভিদ। ডেক গানটায় ভারি হয়ে মরচে পড়েছে, ছেয়ে রয়েছে শামুক আর গুগলিতে। প্রায় নব্বই ডিগ্রী কোণ করে যেন খাড়া হয়ে রয়েছে পুরনো সাবমেরিনটা। কনিং টাওয়ারটা উঠে আছে ওপরের ফ্যাকাসে আলোর দিকে।

সাবধানে আরও কাছে গেল তিনজনে। কনিং টাওয়ারের খানিকটা নিচে বিশাল এক কালো ফোকর দেখা গেল। দু'জন লোক সহজেই সাঁতরে ঢুকে যেতে পারবে ওই ফোকর দিয়ে। মাটিতে শুয়ে না থেকে ওভাবে খাড়া হয়ে আছে কেন সাবমেরিনটা, বুঝতে পারল তিনজনেই। বাতাস। নিশ্চয় টরপেডো টিউবের ফোকরের ওপরে কোনও চেম্বারে এখনও বাতাস রয়েছে। ওই চেম্বারটা

বায়ুনিরোধক। সাবমেরিনটা আক্রান্ত হয়ে রীফে ডুবে যাওয়ার সময় নিশ্চয় ওখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ক্রুরা। আর এই বাতাসের কারণেই ঝড়ের সময় ওভাবে ভেসে উঠেছিল সাবমেরিনটা, ওরকম ভাবে দুলছিল। ঢেউয়ে এখনও মৃদু দুলছে ওটার ওপরের দিক।

এই সময় কানে এল শব্দ!

আস্তেই হচ্ছে, কিন্তু পানিতে মৃদু শব্দও অনেক দূর ছড়ায়। ধাতব শব্দ। টোকা, তারপর ঘষা দেয়ার আওয়াজ। মনে হচ্ছে শব্দটা আসছে সাবমেরিনের ভেতর থেকেই।

ঝট করে একে অন্যের দিকে তাকাল ওরা। সতর্ক। মুসার চোখে ভয়। তবে কি পুরনো সাবমেরিনের ভেতরে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে লাশগুলো? জাপানী ভূত? সে শুনেছে জাপানী ভূতেরা নাকি খুব খারাপ হয়।

ভুরু কুঁচকে কাল ফোকরটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। ওটার ধার ঘেঁষে দুলছে আগাছা, সুডুৎ করে বেরিয়ে এদিক ওদিক ছুটে পালাল কয়েকটা মাছ।

দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল মুসা। মাথা ঝাঁকাল হারডিন।

এগোতে যাবে ওরা, ঠিক এই সময় ফোকর গলে বেরিয়ে এল একটা কালো ছায়া—মুখে মুখোশ, পরনে ওয়েটস্যুট, এক হাতে স্পিয়ার গান, আরেক হাতে একটা ধাতব বাক্স। বেরিয়েই ওদেরকেও দেখে ফেলল ডাইভার। চোখের পলকে ঘুরে সাঁতরে উঠতে শুরু করল ওপরে।

ইশারায় মুসা আর ডেনিংকে আসতে বলে পিছু নিল হারডিন।

এল দ্বিতীয় হাঙরটা। প্রথমটার চেয়ে বড়, একটা গ্রে শার্ক। ডেকের কিনার দিয়ে বেরিয়ে এগিয়ে এল, ডাইভারও তখন প্রায় ওখানে পৌঁছেছে। মুখোমুখি হয়ে গেল হাঙরের। হাত থেকে বাক্সটা ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি স্পিয়ার গান তুলল সে।

কিন্তু মারার দরকার হল না। ডাইভারের পোশাক-আশাক দেখেই বোধহয় আগ্রহ হারাল হাঙর। শরীরটাকে বাঁকা করে প্রায় ধনুক বানিয়ে ঘুরল ওটা, শাঁ করে ছুটে গেল গভীর পানির দিকে। তারপর কি মনে করে ঘুরল আবার। ছুটে আসতে লাগল মুসা আর তার দুই সঙ্গীর দিকে।

ওটার দিকে নজর তিনজনের। এই সুযোগে সাঁতরে সাবমেরিনের অন্য পাশে চলে গেল ডাইভার, বাক্সটা তোলার চেষ্টা করল না। হাঙরটাও বেশি এগোল না। কিছু দূর এসেই মোড় নিয়ে চলে গেল। গভীর পানিতে হারিয়ে গেল তার লম্বা, বাঁকা লেজটা।

ডাইভারের পিছু নিল হারডিন আর ডেনিং। পড়ে থাকা বাক্সটা তুলে নিয়ে

ওদেরকে অনুসরণ করল মুসা। তিনজনেই দেখল, টরপেডোর মত দেখতে মিনি সাবমেরিনে চড়ে বসছে ডাইভার। নিশ্চয় সেই হিচহাইকার! প্রাণপ্রণে সাঁতরে এগোল ওরা। কিন্তু তার আগেই স্টার্ট নিল শার্ক হান্টার, প্রপেলারের ঝাপটায় পানিতে বালির মেঘ উড়িয়ে ছুটতে শুরু করল। হারিয়ে গেল মেঘের ওধারে।

আর পিছু নিয়ে লাভ নেই। সাঁতরে ওটাকে ধরা যাবে না। থেমে গেল হারডিন আর ডেনিং। হতাশ হয়ে তাকাল পরস্পরের দিকে। আঙুল তুলে ওপরে ওঠার নির্দেশ দিল ম্যানেজার।

মুখোশের আড়ালে হাসল মুসা। তুলে দেখাল হাতের বাক্সটা। চকচক করছে চোখ। সে নিশ্চিত, এটার ভেতরেই রয়েছে শার্করীফ রহস্যের সমাধান!

উনিশ

ভেসে উঠল ওরা। হাত নেড়ে ডাকল হারডিন। দেখতে পেল পেক। মোটর বোট নিয়ে হাজির হল। তাতে উঠে দ্রুত মুখোশ আর এয়ার-ট্যাংক খুলে ফেলল ডুবুরিরা। তারপর বাক্সটার দিকে হাত বাড়াল মুসা। 'দেখি, কি আছে?'

'এখন না, মুসা,' চারপাশের সাগরে ঘুরছে হারডিনের দৃষ্টি। 'শার্ক হান্টার নিয়ে ওই লোকটা ফিরে আসতে পারে। আমাদের এই বোটের তলাও ইস্পাতের। বুঝতে পেরেছ? চলুন, ক্যাপ্টেন।'

ফুল স্পীড দিল পেক। আসার সময় ঢেউয়ের অনুকূলে এসেছিল, প্রতিকূলে এগোতে গিয়ে এখন গতি গেল কমে। তবে চলছে মোটামুটি ভালই। পানি ছিটকে উঠছে না, ভিজতে হচ্ছে না কাউকে। হাতের বাক্সটা রেখে দিয়ে প্ল্যাটফর্মের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।

ল্যাণ্ডিং স্টেজ-এ পৌছল ওরা। ডলফিনের মেরামত চলছে। মোটরবোট বাঁধার দায়িত্ব ডেনিঙের ওপর ছেড়ে দিয়ে সরু সিঁড়ি বেয়ে নিচের ডেকে উঠে এল অন্যেরা। কিশোর ওখানে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে। হাতে একটা দূরবীন। 'ওই বাক্সে কি, সেকেণ্ড?' দেখেই চেঁচিয়ে উঠল সে।

'জানি না।'

'খোল তাহলে।'

হারডিন, পেক, কিশোর, তিনজনেই ঘিরে ধরল মুসাকে। ইস্পাতের শক্ত ক্লিপ খুলে বাক্সের ডালা তুলল সে। ভেতরে পানি ভরা। তার মধ্যে রয়েছে ইস্পাতের ছোট আরেকটা বাক্স। মরচে পড়া।

'কি যেন লেখা!' হারডিন ঝুঁকে এল।

ছুরি বের করে বাক্সের ওপরের ময়লা চেঁছে ফেলল মুসা। কালো রঙ ছিল এক সময় বাক্সটার, কিছু নষ্ট হয়েছে মরচে আর পানিতে। মুসার চাঁছা জায়গায় বেরিয়ে পড়ল ধূসর ইস্পাত। জাপানী অক্ষরে কি যেন খোদাই করা রয়েছে।

'জাপান ইম্পেরিয়্যাল নেভির ছাপ!' বিড়বিড় করল পেক। 'নিশ্চয় এটা সাবমেরিনের কমাণ্ডারের দায়িত্বে ছিল। অফিশিয়াল কাগজপত্র আছে।'

বাক্সের তালা ভেঙে, ডালার ফাঁকে ছুরি ঢুকিয়ে চাড় মেরে ডালা তুলে ফেলল মুসা। ভেতরটা পানি-নিরোধক। অয়েলস্কিন দিয়ে পেঁচানো রয়েছে কিছু। কেটে বের করল সে। বেরোল ভারি ক্যানভাসে মোড়া ছোট একটা নোটবুক। ক্যানভাসের ওপর নানারকম ছাপ, লেখাগুলো জাপানী ভাষায়।

'সাবমেরিনের লগবুক,' আন্দাজে বলল হারডিন।

নোটবুক খুলে হতাশ হল মুসা। গুঙিয়ে উঠল, 'পড়ব কিভাবে?'

ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'মিস্টার কারটারের বাড়ি নিয়ে যাব এটা। তাঁর মালী শোহো পড়তে পারবে। আর কিছু আছে নাকি দেখ তো?'

মাথা নাড়ল মুসা।

'আছে, প্রথম বাক্সটায়,' বলে উঠল হারডিন। ভারি একটা সোনার আঙটি তুলে নিল বাক্সের পানি থেকে। তাতে জোড়াপাতা আঁকা। লাল একটা পাথর বসানো।

'ওটা আসল রুবি, আমি শিওর,' ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আঙটিটা দেখছে ম্যানেজার। 'পুরুষের আঙটি। বেশ পুরনো। আমার মনে হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও আগেকার। এই দেখ, খোদাই করা পাতাগুলোর শিরা কেমন মসৃণ হয়ে গেছে। আঙুলে লাগে না।'

নীরবে জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে অন্য তিনজন। অবশেষে কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল মুসা। বলল, 'এইই গুপ্তধন?'

'এগুলোর জন্যেই গিয়েছিল ডাইভার,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ, আর অনেক কষ্ট করেছে,' যোগ করল হারডিন। 'মূল্যবান না হলে কেন করল?'

'কি জানি,' দাড়ি চুলকালো পেক। 'বদ্ধ পাগল তো অনেক আছে। হয়ত স্যুভনির হিসেবেই নিয়েছিল ওগুলো। গিয়ে বন্ধুদের দেখিয়ে বলবেঃ এই দেখ, কোত্থেকে কি জিনিস নিয়ে এসেছি! যত্তোসব!'

'উহুঁ,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'স্যুভনির নয়। অন্য কিছু। লোকটা জানত কোথায় আছে এগুলো, আর এতে কি আছে। হয়ত সাবমেরিনের ভেতরে কোনও কঙ্কালের আঙুল থেকেই খুলে নিয়েছে আঙটিটা।'

'তারমানে বলতে চাইছ,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'এগুলোতেই রয়েছে সূত্র? গুপ্তধন কোথায় আছে?'

'হ্যাঁ, কিশোরের অনুমান ঠিকই হতে পারে,' হারডিন বলল। 'এখুনি নিয়ে যাওয়া দরকার। আগে মিস্টার কারটারকে রেডিওতে বলে নিই।'

কাউচে নিথর হয়ে বসে আছে রবিন। মিস্টার কারটার এলিয়ে পড়েছেন চেয়ারে। চিকামারা পায়চারি করেই চলেছে। হাই তুলছে দুই কুইমবি। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে?

'ডলফিন কলিং মিস্টার কারটার! কাম ইন, কারটার!'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল চিকামারা। ঝট করে সোজা হল ডিড আর ফেড। রেডিওর দিকে তাকাল রবিন। ইশারায় মিস্টার কারটারকে জবাব দিতে বলল চিকামারা।

'কারটার বলছি। কিশোর?'

'হ্যাঁ, স্যার। আমরা আসছি।' তারপর সংক্ষেপে জানাল কি পেয়েছে। শেষে বলল, 'ঝড়ের সময় নিশ্চয় সান্তা ক্রুজ দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছিল ডাইভার। সাগর শান্ত হলে নেমেছে। আপনি এক কাজ করুন। ম্যারিনায় চলে আসুন। সাথে করে শোহোকে নিয়ে আসবেন।'

চিকামারার দিকে তাকালেন কারটার। মাথা ঝাঁকাল জাপানী।

'আজ তো ওর ডিউটি নেই,' বেফাঁস কিছু বলার সাহস পেলেন না কারটার, তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে চিকামারা।

'এখানে আসবে না। ওর বাসায় গিয়েই ওকে তুলে নিতে হবে।'

'ঠিক আছে। যান। আমরা মোটরবোট নিয়ে আসছি।'

নীরব হল রেডিও। কি ভেবে হঠাৎ মাইক্রোফোনের কাছে মুখ নামালেন কারটার। পিস্তল তুলল চিকামারা। শীতল কণ্ঠে বলল, 'না! খবরদার!'

'মিস্টার কারটার!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'চুপ!' ধমক দিল ফেড। দুই লাফে এসে রবিনের মুখ চেপে ধরল।

শ্রাগ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার চেয়ারে হেলান দিলেন কারটার।

কুইমবিদের আদেশ দিল চিকামারা, 'বেঁধে ফেল ওদের।'

রেডিওর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে এনে একটা চেয়ারে বসিয়ে কারটারকে বাঁধা হল। রবিনকেও বেঁধে কাপড় গুঁজে দিল মুখে। তারপর কুইমবিদের নিয়ে বেরিয়ে গেল চিকামারা।

*

মোটরবোট চালাচ্ছে মুসা। পথ জানা আছে তার, তবু বার বার বুঝিয়ে দিয়েছে পেক, কোন দিক দিয়ে কিভাবে যেতে হবে। সাগর পুরোপুরি শান্ত হয়নি এখনও। খোলা সাগরে পড়ে খুব দুলছে বোট।

'কিশোর,' একসময় বলল মুসা। 'সত্যি আছে তো? যুদ্ধের সময় অনেক সোনা-টোনা নিয়ে যেত জাপানীরা, শুনেছি...'

'থাকতেই পারে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর।

'থাকতেই হবে। নইলে এই পুরনো লগবুক আনতে যাওয়ার কার কি ঠেকা পড়েছে?'

জবাব দিল না কিশোর। চিমটি কাটতে শুরু করেছে নিচের ঠোঁটে।

চুপচাপ বোট চালাল মুসা।

সামনে সান্তা বারবারা চ্যানেলে ঢোকার মুখ। মুখের কাছে আগাছার বিশাল জঙ্গল ভাসছে, বোঝা গেল ঝড়ের কাজ। মাঝখানে সরু ফাঁক, বোট চলাচলের ফলে হয়েছে। গতি কমিয়ে মুসাও বোট ঢোকাল সেই ফাঁকে। বেরিয়ে এল অন্য পাশে। হঠাৎ মুসার দিকে তাকাল কিশোর।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুসা। বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ, আমিও খেয়াল করেছি। ভারি হয়ে গেছে বোট!'

স্তব্ধ হয়ে এক মুহূর্ত বসে রইল কিশোর। তারপর বোটের কিনার খামচে ধরে ঝুঁকে তাকাল নিচে। ঝড়ের কারণে এখানেও পানি ঘোলা, কিন্তু বেশি নিচে নয় জিনিসটা। তাই দেখতে পেল সে। সরে এসে মাথা ঝাঁকাল। ফিসফিসিয়ে বলল, 'আছে!'

ভয় ফুটল দু'জনের চোখেই।

কিশোর বলল, 'আগাছার মাঝের ফাঁক...গতি কমিয়ে ছিলে, নিশ্চয় তখনই নিচে এসে লেগেছে। মুসা, আমরা আসব, জানত। ঘাপটি মেরে বসেছিল।' নির্জন জায়গা। খোলা বোটে দু'জন কিশোর। আর ঠিক তাদের নিচেই রয়েছে...আর ভাবতে পারল না কিশোর। চেঁচিয়ে বলল, 'মুসা, যদি উঠে আসে?'

'পারবে বলে মনে হয় না। আসতে হলে বোটের তলা থেকে সাবমেরিনটা ছাড়িয়ে নিতে হবে। লাফ দিয়ে আগে চলে যাব আমরা। টিকির নাগালও আর পাবে না।'

'কিন্তু পেট্রলের কথা ভেবেছ? নিচে বোঝা, নিশ্চয় অনেক বেশি তেল খাচ্ছে এঞ্জিন। যদি আমরা গিয়ে পৌঁছার আগেই তেল ফুরিয়ে যায়?'

চ্যানেল পেরিয়ে এল বোট। মুসা বলল, 'ঠিকই বলেছ। তেল থাকবে না।

এখানেই কোথাও উঠে যেতে হবে। সান্তা বারবারা আর ভেনচুরার মাঝে কোথাও।'

সায় জানাল কিশোর।

শাঁই করে তীরের দিকে বোটের নাক ঘুরিয়ে ফেলল মুসা। হঠাৎ খেপা ঘোড়ার মত লাফ দিয়ে আগে বাড়ল বোট, গতি এক ধাক্কায় বেড়ে গেল অনেকখানি।

'আমাদের সাহায্য করছে!' চিৎকার করে বলল মুসা। 'নিজের মোটরও চালু করে দিয়েছে। কেন, কেন করছে?'

'কারণ,' ধীরে ধীরে বলল কিশোর। 'ও যেখানে আমাদেরকে নিয়ে যেতে চেয়েছে, সেদিকেই যাচ্ছি আমরা। নির্জন জায়গায়।'

বিশ

জন-মানবশূন্য তীরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা। মাত্র আর আধমাইল দূরে। এক ধারে পাথরের টিলা ঢালু হয়ে উঠে গেছে সাগরের নিচ থেকে। পাশে সাদা সৈকত। একটা অয়েল পিয়ার আছে। দূরে কয়েকটা বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু তীরে কেউ নেই।

'মাত্র পাঁচটা বাজে,' মুসা বলল। 'লোকজন গেল কোথায়?'

'বোধহয় বাড়িতে। সাগরের যা অবস্থা, সাঁতার কাটা যাবে না। মাছও ধরতে পারবে না। এসে কি করবে?'

'তারমানে আমাদেরকে একা পাবে ব্যাটা!'

'না। হাইওয়ে ওয়ান-জিরো-ওয়ান তীরের কাছেই, পনের মিটার মত হবে, ওই যে ওদিকে। নেমেই ছুটতে শুরু করব। ওখানে নিশ্চয় লোক আছে। আর লোকজনের চোখের সামনে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।'

'ঠিক আছে। ওই অয়েল পিয়ারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি আমি। ল্যাণ্ডিং স্টেজে লাফিয়ে নেমেই দেব দৌড়, পিয়ার ধরে।'

পশ্চিম দিকের লম্বা একটা অন্তরীপ পেরিয়ে এল বোট। ঢেউ তেমন ঢুকতে পারছে না এখানে, ফলে পানি অনেকটা শান্ত। চলল লম্বা পিয়ারটার দিকে। কাউকে চোখে পড়ল না। পিয়ারটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেও কেউ নেই। কোনও গাড়ি নেই।

'অবাক কাণ্ড তো!' মুসা বলল। 'মোটে পাঁচটা বাজে। পিয়ারের কাছেও কেউ নেই?'

'না থাকুক। হাইওয়েতে থাকলেই হল।'

গতি কমাল না মুসা। পুরোদমে এগোল ল্যাণ্ডিং স্টেজের দিকে। ওটার কাছাকাছি এসে এঞ্জিন বন্ধ করেই স্টিয়ারিং ঘোরাল। শাঁ করে পাশ কাটাল বোট। দক্ষ হাতে স্টেজের কাছে ওটাকে নিয়ে এল সে, পাশ ঘেঁষে রাখল, ধাক্কা প্রায় লাগলই না।

বোট বাঁধার চেষ্টা করল না মুসা। লাফিয়ে কাঠের সিঁড়িতে নেমে দুড়দাড় করে উঠে গেল। একেবারে ওপরে ওঠার আগে আর ফিরে তাকাল না। কিন্তু এখন ফিরেই থমকে গেল। 'কিশোর! দেখ!'

ফিরে তাকাল কিশোর।

কুইমবিদের কালো জাহাজটা সোজা ছুটে আসছে পিয়ারের দিকে। নিশ্চয় অন্তরীপের কোথাও লুকিয়ে ছিল। গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ফেড কুইমবি। হুইল ধরেছে ডিড। তার পাশে আরেকজন ছোটখাট লোক।

'চিকামারা। কিশোর, ওরা আমাদের সাহায্য করবে।'

'করবে কি?' দ্বিধা করছে গোয়েন্দা প্রধান।

গতি কমাচ্ছে না জাহাজটা। ভাসতে ভাসতে ওটার দিকেই চলেছে মোটরবোটটা।

'আরি, থামাচ্ছে না তো! ভেঙে ফেলবে নাকি?' ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার।

তা-ই করল। বোটের ঠিক মাঝামাঝি আঘাত হেনে ওটাকে প্রায় দু'টুকরো করে ফেলল জাহাজ। এগিয়ে আসতে লাগল স্টেজের দিকে।

'ফেডের হাতে পিস্তল! মুসা, দৌড় দাও, কুইক!'

পিয়ারের ওপর দিয়ে তীরের দিকে ছুটল ওরা। পেছনে কালো জাহাজ থেকে শোনা গেল রাগান্বিত চিৎকার। ফিরেও তাকাল না ছেলেরা।

'আমি এখন শিওর, কুইমবিরাই ডলফিনকে নষ্ট করেছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'আর সব কিছুর পেছনে রয়েছে ওই জাপানী চিকামারা। লগবুক আর আঙটিটা চায়। শার্ক হান্টারে করে ডাইভার সে-ই পাঠিয়েছে।'

'কিন্তু ডাইভারের জন্যেও তো কেয়ার করল না,' জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে মুসা। 'ইচ্ছে করেই বোটটাকে ভাঙল। জানে না, নিচে লোকটা আছে?'

'জানে। তবে ওর কাছে তো লগবুক আর আঙটি নেই। মুসা, এখন বুঝতে পারছি রেডিওতে ওরকম করে কথা বলেছিল কেন রবিন, আমাদের হুঁশিয়ার করতে চেয়েছিল। চিকামারা আর কুইমবিরা নিশ্চয় তখন স্টাডিতে ছিল। সে-জন্যেই জানে লগবুক আর আঙটি আমাদের কাছে।'

পিয়ারের শেষ মাথায় পৌঁছল ওরা। সৈকতে নেমে ছুটল হাইওয়ের দিকে। কিন্তু এইট-লেন বিশাল হাইওয়েত পৌঁছে থমকে গেল। পথের দু'দিকে যতদূর

চোখ গেল, কাউকে দেখল না। কোনও গাড়ি নেই। অথচ এসময়টায় অনেক গাড়ি থাকার কথা।

লোক নেই, গাড়ি নেই। কোনও কিছু নড়ছে না। নীরব, শূন্য। যেন ভয়াবহ মহাযুদ্ধের পর মরে পড়ে রয়েছে অজানা কোনও গ্রহের বিশাল রাজপথ।

ড্রাইভওয়েতে গাড়ি থামার শব্দ শোনা গেল। পেছনের দরজার কাছে এগিয়ে আসতে লাগল পদশব্দ। 'জেমস? জেমস কারটার?' ইতিমধ্যে অসংখ্যবার বাঁধন খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন কারটার, আরেকবার করলেন। মুখে কাপড় গোঁজা। চেঁচানর চেষ্টা করেও পারলেন না, গোঁ গোঁ শব্দ বেরোল শুধু।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার শোনা গেল, 'জেমস! হলটা কি···'

দরজায় দেখা দিলেন ক্যাপ্টেন হ্যানস কারডিগো। তাড়াতাড়ি এসে রবিন আর কারটারের বাঁধন খুলে দিলেন। বাঁধা জায়গায় ডলে ডলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিতে লাগল দু'জনে।

'তুমি এলে কিভাবে, হ্যানস?' জিজ্ঞেস করলেন লেখক।

উঠে হাঁটতে শুরু করল রবিন। পা ঝিমঝিম করছে।

'তোমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিল হারডিন,' ক্যাপ্টেন জানালেন। 'জবাব না পেয়ে ভাবল, ছেলেদুটোর সঙ্গে দেখা করতে গেছ। কোস্ট গার্ডকে ডেকে জিজ্ঞেস করল। ওরা বলল, তুমি ম্যারিনায় যাওনি। ছেলেদুটোও পৌছেনি। কি জানি কি সন্দেহ হল, পুলিশকে খবর দিল সে।'

'মুসা আর কিশোর আসেনি?' চমকে গেল রবিন।

'না। চ্যানেলেও নেই ওরা।'

'নিশ্চয় চিকামারা ধরে নিয়ে গেছে!' কেঁদে ফেলবে যেন রবিন।

যা যা ঘটেছে এখানে, সংক্ষেপে জানালেন কারটার।

'ছেলেদের খোঁজ করতে লোক লাগিয়ে দিয়ে এসেছি,' কারডিগো বললেন। 'আমরাও যাব কোস্ট গার্ডের ওখানে। কিন্তু একটা মস্ত সমস্যা হয়ে গেছে,' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি। 'ওয়ান-জিরো-ওয়ান হাইওয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। ঝড়ে ভূমিধস নেমেছে, কাদায় মাখামাখি। ভেনচুরায় একটা ব্রিজ ভেঙে পড়েছে। কোনও দিক থেকেই লোক চলাচল করতে পারছে না।'

স্তব্ধ হয়ে শূন্য হাইওয়ের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর আর মুসা। বিশ্বাস করতে পারছে না। যেখানে হাজার হাজার গাড়ি থাকার কথা, একটাও নেই। শুধুই থমথমে নীরবতা।

'নিশ্চয় পথ বন্ধ হয়ে গেছে কোনভাবে,' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'ওই যে, দেখ···ওই···'

পশ্চিমে, পাহাড়ের একটা অংশ যেন লুটিয়ে পড়ে আছে পথের ওপর।

'ঠিকই বলেছ,' কিশোরও দেখছে। 'সে-জন্যেই নেই কেউ। কারও সাহায্য পাব না আমরা, সেকেণ্ড।'

পেছনে পিয়ারের ওপর শোনা গেল ভারি পায়ের শব্দ।

'কি করব এখন, কিশোর?'

'বাড়িগুলোয় পৌছতে পারব না,' দ্রুত ভাবনা চলেছে গোয়েন্দাপ্রধানের মাথায়। 'তার আগেই আমাদের ধরে ফেলবে ওরা। সৈকতে লুকানর জায়গা নেই। কি করি!' রুক্ষ, বাদামী পাহাড়ের দিকে তাকাল সে। ধসে পড়া পাহাড়ের মাঝে একটা সরু ফাটল, গিরিপথের মত দেখাচ্ছে। 'ওখানেই গিয়ে ঢুকতে হবে।'

'তাহলে দেরি কিসের? চল,' বলতে বলতেই দৌড় দিল মুসা।

পেছনে ছুটল কিশোর। পাহাড়ের কাছে পিচ্ছিল কাদা। পিছলে পড়তে পড়তে কোনমতে ঢুকল ওরা গিরিপথে। ঠিক এই সময় শোনা গেল চিৎকার।

'ওই যে, চলে যাচ্ছে!'

ফিরে তাকাল মুসা। পথের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে দুই কুইমবি আর চিকামারা। ফেডের হাতে রাইফেল, চিকামারার হাতে পিস্তল।

'জলদি এস, কুইক!' ডাকল কিশোর।

সরু ফাটলের ভেতর দিয়ে ছুটতে শুরু করল ওরা। খাড়া দেয়াল। রোদ ঢুকতে পারছে না। এই বিকেলেই গোধূলির ঘন ছায়া ওখানে। পায়ের নিচে সাবানের মত পিচ্ছিল কাদা। ধীরে ধীরে উঠে গেছে পথ। একে পিচ্ছিল, তার ওপর ঢালু। কয়েকবার আছাড় খেল কিশোর। শেষে তার হাত ধরে রাখতে হল মুসাকে। ছুটতে পারছে না। অনেক কষ্টে উঠে এল একটা শুকনো মত জায়গায়, কাদা নেই এখানে, ছোট পাথরের ছড়াছড়ি। আবার দৌড়াতে শুরু করল দু'জনে। এঁকেবেঁকে গেছে পথ।

সামনে এক জায়গায় দু'ভাগ হয়ে গেছে ফাটলটা। কোনও রকম ভাবনা-চিন্তা না করে ডানে মোড় নিল মুসা। ঢুকে পড়ল ভেতরে। এবং ভুলটা করল। সামনে খানিক দূরেই পথ রুদ্ধ, সামনে পাহাড়ের খাড়া দেয়াল। ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। তাতে নষ্ট হল কয়েকটা মূল্যবান মিনিট।

ফিরে এসে বাঁয়ের পথ ধরল ওরা। হাঁপাচ্ছে দু'জনেই। পেছনে শোনা যাচ্ছে পায়ের শব্দ, গালাগালি···এগিয়ে আসছে···

'জলদি কর, কিশোর!' চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'এস···'

দাঁড়িয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান। যেন পাথর হয়ে গেছে। তাকিয়ে রয়েছে মুসার কাঁধের ওপর দিয়ে। 'মুসা...'

মুসাও ফিরে তাকাল। মাত্র তিন মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। পরনে কালো ওয়েটস্যুট। মুখে ডাইভিং মাস্ক। হাতে কুৎসিত চেহারার স্পিয়ার গান।

কোস্ট গার্ড স্টেশন। পায়চারি করছেন কারটার। রবিন জানালায় দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে ধূসর হয়ে আসা সাগরের দিকে।

শেষ রিপোর্টটা পড়ছে লেফটেন্যান্ট মাইক। শেষ করে মাথা নাড়ল। 'সরি। পাওয়া যায়নি এখনও ওদেরকে।'

'পাওয়া যায়নি, তাহলে গেল কোথায়?' রেগে উঠলেন কারটার। 'তারমানে সত্যি সত্যি চিকামারার হাতে পড়েছে।'

'কুইমবিদের বোটটাও পাওয়া যাচ্ছে না।' দ্বিধা করল মাইক, তারপর বলল, 'অথচ ঘন্টা দুই আগে বন্দর থেকে গেছে ওটা। চিকামারাকেও নাকি ওটাতে উঠতে দেখা গেছে।'

চুপ করে রইল রবিন আর কারটার।

'চ্যানেলে ঘুরছে আমাদের কাটার,' আবার বলল মাইক। 'উপকূলের ওদিক-টায় খুঁজছে পুলিশের হেলিকপ্টার। বের করে ফেলবে।'

'বেশি দেরি না করে ফেলে!' বিড়বিড় করল রবিন।

একুশ

ঢোক গিলল কিশোর আর মুসা। তাদের পথরোধ করে আছে হিচহাইকার। বেঁটে, হালকা-পাতলা একজন মানুষ। আবছা আলোয় মাস্কে ঢাকা মুখটা দেখা যাচ্ছে না।

স্পিয়ার গান নেড়ে ইঙ্গিত করল লোকটা। পাশের ছোট আরেকটা ফাটল দেখাল। ওটার ভেতর ঢুকতে বলছে ওদেরকে। দ্বিধা করল দুই গোয়েন্দা। আবার ইশারা করল লোকটা, জরুরী।

'ঠিক আছে, বাবা, ঢুকছি,' হাত তুলল মুসা।

সরু শাখা-ফাটলে ঢুকে পড়ল দু'জনে। পেছনে এল লোকটা। গান পয়েন্টে তাদেরকে নিয়ে চলল। তীক্ষ্ণ বাঁক পেরোতেই চোখে পড়ল, পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আছে চ্যাপ্টা একটা পাথর, ঝোলা বারান্দা তৈরি করেছে। ওটাতে উঠে লুকিয়ে পড়তে ইঙ্গিত করল ওদেরকে ডাইভার।

উঠে নিচে তাকাল ওরা। আরে, সেই ফাটলটাই তো দেখতে পাচ্ছে, যেটা

থেকে ওদেরকে এইমাত্র ধরে আনল লোকটা।

ডাইভার উঠে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ওদের পাশে। চুপ থাকার নির্দেশ দিল। অবাক হয়েছে ছেলেরা, তবে কথা শুনল নির্দ্বিধায়। চিকামারা আর কুইমবিদের কথা আর পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। একটা মোড়ের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে ঠিক পাথরটার নিচে দাঁড়াল ওরা।

'এখানে থামলেন কেন?' ফেডের গলা।

'কিছু একটা হয়েছে,' চিকামারা বলল।

'কি আবার হবে? ভালই তো এগোচ্ছি,' বলল ডিড। 'ওদের পায়ের আওয়াজ শুনছি না,' বলল চিকামারা।

'এসব পাহাড়ী ফাটল সম্পর্কে হয়ত আপনার ধারণা নেই। নানা কাণ্ড হয় এসব জায়গায়। কখনও আলো দেখা যায়, কখনও যায় না। হয়ত এখনই এখানে একটা শব্দ হল, ওখানে গিয়েই গায়েব। এমন তরো...'

'এগোও,' আদেশ দিল চিকামারা।

আগে আগে গেল দুই ভাই। পেছনে জাপানীটা। হারিয়ে গেল আরেকটা মোড়ের ওধারে। মুসা আর কিশোরকে নিয়ে পাথরের ওপর থেকে নামল ডাইভার। ফাটল থেকে বের করে নিয়ে এল একটা পায়েচলা পাহাড়ী পথে। দক্ষিণে সাগরের দিকে গেছে ওটা। পথের কোথাও কাদা, কোথাও পাথর, কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। চলতে খুব অসুবিধে হল।

অবশেষে উঁচু একটা ছোট্ট খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল ওরা। নিচে চ্যানেলটা চোখে পড়ল। পিয়ার, সৈকত, নির্জন হাইওয়ে, সবই দেখা যাচ্ছে। পিয়ারের শেষ মাথায় বেঁধে রাখা হয়েছে কালো জাহাজটাকে, ঢেউয়ে দুলছে।

হঠাৎ করেই যেন খাড়া পাহাড়ের ওপাশ থেকে উদয় হল একটা হেলিকপ্টার। কাঁধে চাপ দিয়ে তাড়াতাড়ি দুই গোয়েন্দাকে বসিয়ে দিল ডাইভার। চুপ থাকতে ইশারা করল। চ্যানেলের দিকে উড়ে গেল কপ্টারটা, কালো জাহাজের ওপর দিয়ে চলে গেল পশ্চিমে।

খোলা জায়গাটার একধারে বড় বড় পাথরের চাঁই পড়ে আছে। ছেলেদেরকে ওটার আড়ালে গিয়ে লুকানর ইঙ্গিত করল ডাইভার।

পাথরগুলো প্রায় গায়ে গায়ে লেগে একটা বৃত্তমত তৈরি করেছে। লুকানর চমৎকার জায়গা। আর ওটার ভেতর থেকে ফাঁক দিয়ে নিচের সব কিছু দেখা যায়।

ছেলেদের মুখোমুখি বসল ডাইভার। এই প্রথম মুখ খুলল, 'এখানে আমরা নিরাপদ। বাতাস লাগে না, রাতেও থাকতে পারব। তো, দয়া করে এখন আমার নোটবুক আর আঙটিটা দিয়ে দাও।'

গটমট করে কোস্ট গার্ড স্টেশনে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন কারডিগো। বললেন, 'কুইমবিদের বোটটা পাওয়া গেছে।'

চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রবিন। বাইরে সন্ধ্যা নেমেছে তখন। কথা থামিয়ে ফিরে তাকালেন কারটার আর মাইক।

'আমাদের একটা হেলিকপ্টার খবর দিয়েছে,' বললেন কারডিগো। 'দক্ষিণ-পুবে মাইল বারো দূরে একটা অয়েল পিয়ারের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে বোট। তাতে লোকজন দেখতে পায়নি পাইলট। তার ধারণা, ওটাতে কেউ নেই। মোটরবোটটাও দেখেনি।'

'তাহলে এখুনি আমাদের যাওয়া দরকার,' বলে উঠল রবিন।

মাথা নাড়লেন ক্যাপ্টেন। 'আশপাশের অনেকখানি ঘুরে দেখেছে পাইলট। কোনও মানুষ চোখে পড়েনি। পিয়ার, হাইওয়ে কোথাও নেই। বাড়িঘরের কাছেও কাউকে যেতে দেখেনি। ওর বিশ্বাস, পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়েছে জাহাজের লোকেরা।'

'রাতও হয়ে গেল,' জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন কারটার। 'পাহাড় থেকে এখন ওদেরকে খুঁজে বের করা যাবে না।'

'না, যাবে না,' একমত হল মাইক। 'সকালের আগে হচ্ছে না।'

'কিন্তু রাতে রাতেই যদি পালিয়ে যায় ওরা? মুসা আর কিশোরকে খুন করে জিনিসগুলো নিয়ে চলে যায়?' প্রতিবাদ করল রবিন।

'না, যেতে পারবে না,' বুঝিয়ে বললেন কারডিগো। 'হাইওয়ে পুরোপুরি বন্ধ। দু'দিকেই পুলিশ কার বসিয়ে রেখেছি। হাইওয়ে থেকে আর কোনও পথ নেই। রাতে পাহাড় থেকে বেরোলেও সুবিধে করতে পারবে না, পুলিশের চোখে পড়বেই।'

'আমি যাব,' উঠে দাঁড়াল মাইক। 'কাটার নিয়ে পাহারা দেব, যাতে জলপথে পালাতে না পারে ব্যাটারা।'

কারটার আর রবিনও যাওয়ার জন্যে তৈরি হল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নোটবুক আর আঙটি ডাইভারের হাতে তুলে দিল দুই গোয়েন্দা।

কড়া চোখে লোকটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কে আপনি? মাস্ক খুলছেন না কেন?'

'দরকার নেই, মুসা। আমি জানি।'

'তুমি জান?'

'জানি। শোহো। মিস্টার কারটারের মালী।'

মুখ থেকে মাস্ক খুলল ডাইভার। কিশোরের অনুমান ঠিক। হেসে জিজ্ঞেস করল তরুণ জাপানী, 'কি করে বুঝলে, কিশোর?'

'আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার,' নিজের ওপর রেগে গেল কিশোর। 'যখন মিস্টার কারটার বলেছিলেন, "আমার নতুন মালী"। যখন তাঁর আঙিনা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল চোরটা, গায়েব হয়ে গিয়েছিল। বেরিয়ে গিয়ে জাস্ট লুকিয়ে পড়েছিলেন আপনি, ওয়েটস্যুট খুলে রেখে গিয়ে এমনভাব দেখিয়েছেন, যেন বাগানে কাজ করছেন। দু'জন লোককে দেখেছেন, বলে, আমাদের বোকা বানিয়েছেন। মিস্টার কারটারের স্টাডিতে আপনিই চুরি করে ঢুকেছিলেন সেদিন।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল শোহো। 'ঢুকেছিলাম। তাঁর শিডিউল বুক দেখতে বোট নিয়ে কখন তিনি বেরোবেন, কখন ফিরবেন জানতে। তাছাড়া দ্বীপ অব ঈস্টের চার্টগুলোও দেখা দরকার ছিল, সাবমেরিনটা খুঁজে বের করার জন্যে।'

'চিকামারা আর কুইমবিরা আপনার শত্রু, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল জাপানী তরুণ। পাথরে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল। 'আমার পুরো নাম শোহো চিকামারা। মিস্টার চিকামারা আমার দাদা। হয়ত।'

'আরে,' বলে উঠল মুসা। 'আপনি নাকি ইংরেজি জানেন না? এখন বলছেন কি করে?'

'আমাদের চেয়ে কম জানে না,' হাসল কিশোর।

শোহোও হাসল। 'ঠিকই বলেছ। সাত বছর বয়েস থেকেই ইংলিশ স্কুলে লেখাপড়া করেছি আমি। সেদিন ভাঙা ভাঙা বলেছি, কারণ আছে। জাপানী এক মালী এত শুদ্ধ ইংরেজি বলে, শুনলে লোকে অবাক হবে না?'

'যাকগে, আসল কথা বলুন। চিকামারা আপনার দাদা, তার সঙ্গে আবার "হয়ত" কেন?'

'কারণ আছে, কিশোর,' বিষণ্ন হয়ে গেল শোহো। 'সাধারণ মানুষ ছিলেন আমার দাদার বাবা। এঞ্জিনিয়ারিং পড়ে এঞ্জিনিয়ার হয়ে তেল আর ক্যামিকেলের ব্যবসা ধরেছিলেন। বড় ধনী হয়ে উঠেছিলেন ওই ব্যবসা করে। তাঁর এক ছেলে। বাপ-ছেলেতে বনিবনা হত না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে খুব ঝগড়া লাগল একদিন দু'জনে। রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ছেলে, গোলমালে জড়াল, তারপর গিয়ে যোগ দিল ইমপেরিয়্যাল নেভিতে। ওর নাম হ্যারিয়ামো চিকামারা। অনেক যুদ্ধ করল, কয়েকবার জখম হল, তারপর ধরা পড়ল বিদেশীদের হাতে। শেষে,

'উনিশশো ছেচল্লিশ সালে ছাড়া পেয়ে ফিরে এল জাপানে।'

'একটা শব্দ হল। কান পাতল তিনজনেই। আর শোনা গেল না। উঠে পাথরের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল মুসা, কাউকে চোখে পড়ল না।

আবার বলতে লাগল শোহো, 'আমার দাদার বাবা আর আত্মীয়-স্বজন প্রায় সবাই মারা গেল যুদ্ধের সময়। হিরোশিমায়। বাপের সয়-সম্পত্তির একমাত্র মালিক হল হ্যারিয়ামো।'

'ওই হ্যারিয়ামো কি আসল হ্যারিয়ামো নয়?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'আমার বাবা তা-ই ভাবে,' শোহো বলল। 'লোকটার চেহারা অনেকটা হ্যারিয়ামোর মত হলেও সে হ্যারিয়ামো নয়। আমাদের পরিবারের অনেক কথা সে জানে, কিন্তু সব কথা নয়। আঁইগুঁই করে জানিয়েছে, জখম হওয়ায় তার চেহারা বদলে গেছে। স্মৃতিশক্তিও নষ্ট হয়েছে অনেকখানি, আগের কথা সব মনে করতে পারে না। আসল হ্যারিয়ামোর মেডিক্যাল, ডেন্টাল, সমস্ত রেকর্ড নষ্ট হয়ে গেছে হিরোশিমায়। নেভির রেকর্ডে জানা গেল, ওই লোকটাই হ্যারিয়ামো চিকামারা। ফিঙ্গারপ্রিন্টও মিলে যায়, যুদ্ধের সময় হ্যারিয়ামো নামে যে লোকটা নেভিতে ঢুকেছে তার আঙুলের ছাপের সঙ্গে।'

'ফিঙ্গারপ্রিন্ট মিথ্যে হতে পারে না,' মুসা বলল।

'কিন্তু লোকটা মিথ্যুক হতে পারে,' বলল কিশোর। 'শোহো, আপনার দাদা কি যুদ্ধের আগে জন্মেছিলেন?'

'হ্যাঁ। এক গরীব ওয়েইট্রেসকে বিয়ে করেছিল দাদা। এক ছেলে হল। দাদা যুদ্ধে যাওয়ার সময়ও ওই ছেলে, মানে আমার বাবা এত ছোট ছিল, দাদার চেহারাই মনে রাখতে পারেনি। হ্যারিয়ামো ফিরে আসার পর দেখেই তাকে অপছন্দ করল বাবা। আমার দাদীও সন্দেহ করল। বাবাকে বলেনি দাদী, তবে বাবা বুঝতে পারল।'

'আপনার বাবাকে বলল না কেন তাহলে আপনার দাদী?'

'লোকটাকে ভীষণ ভয় করত দাদী। প্রমাণও ছিল না তার কাছে। তাছাড়া তখন যুদ্ধ শেষ হয়েছে; দেশের অবস্থা খুব খারাপ। টাকা থাকলেও খাবার পাওয়া যেত না। বাচ্চা একটা ছেলে নিয়ে একা মেয়েমানুষ কি করবে? তাই কোনমতে লোকটার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেয়েছিল। ভুল করেছিল সেখানেই।' থামল শোহো। সন্ধ্যার ঘন ছায়া নামছে। আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল এক মুহূর্ত, তারপর আবার বলল, 'ভীষণ খারাপ লোক ওই নকল হ্যারিয়ামো। জাপানে অনেক বদনাম আছে তার, কুখ্যাত ক্রিমিন্যাল। আমাদের আত্মীয়-স্বজন কাউকে সহ্য করতে পারে না, অপমান করেছে সবাইকে। কেউ আসে না এখন আমাদের বাড়িতে।

বাবার ধারণা, আমার দাদীকে ওই লোকটাই খুন করেছে। ও আসার কিছু দিন পরই রহস্যজনক ভাবে মারা যায় দাদী।'

'কিন্তু আপনার আসল দাদার কি হল?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

আবার আকাশের দিকে তাকাল শোহো। 'বয়েস বাড়লে সেটাই জানার চেষ্টা করল আমার বাবা। জানল, যুদ্ধে যাওয়ার আগে এক অপরাধীদের দলে ভিড়েছিল আমার দাদা। দলের সর্দার কিংফো টাকিনো এক অসম্ভব শয়তান লোক, পুলিশের ভয়ে গা ঢাকা দিয়ে কিভাবে কিভাবে গিয়ে ঢুকেছিল নেভিতে। হ্যারিয়ামো আর সে, একই সঙ্গে। ট্রেনিঙের পর টাকিনোকে তুলে দেয়া হল যুদ্ধজাহাজে, হ্যারিয়ামো রয়ে গেল হেডকোয়ার্টারে। তারপর, উনিশশো বেয়াল্লিশের গোড়াতে দু'জনেই সাবমেরিন নিয়ে যুদ্ধে গেল, আর ফিরল না।'

'জায়গা পরিবর্তন করেছিল বোধহয়,' নড়েচড়ে বসল কিশোর। 'নিখোঁজ হয়েছিল হয়ত হ্যারিয়ামো, নেভি মনে করেছে টাকিনো। কাজেই, হেডকোয়ার্টারে ফিরে টাকিনো যখন একথা জানতে পারল, লুফে নিল সুযোগটা। হ্যারিয়ামো সেজে তার অতীত পাপ ঢাকা দিতে পারবে, সেই সাথে হাতে এসে যাবে চিকামারাদের অগাধ সম্পদ। কোনও ভাবে অফিশিয়াল কাগজপত্রে গণ্ডগোল করে দিল টাকিনো, এমনকি নিজেও আঙুলের ছাপ পর্যন্ত বসিয়ে দিল হ্যারিয়ামের ব্যক্তিগত ফাইলে। সেজে বসল হ্যারিয়ামো চিকামারা।'

মাথা ঝাঁকাল শোহো। 'হতে পারে। আমার দাদা নাকি ছিল খুব দেশপ্রেমিক। সাগর ভালবাসত। দাদীর কাছে নাকি প্রায়ই বলত, সুযোগ পেলেই নাবিক হয়ে চলে যাবে।'

'শার্ক রীফের ওই কালো সাবমেরিনটাতে কে ছিল তাহলে?' প্রশ্ন করল মুসা। 'আপনার দাদা?'

'হ্যাঁ,' বলল শোহো। 'সাবমেরিনট্যর নম্বর আমাদের মুখস্থ। জানতাম আমেরিকান উপকূলের দিকে গিয়েছিল। কিন্তু ঠিক কোথায়, শিওর ছিলাম না। জেনেছি মাসখানেক আগে।' নাক চুলকাল সে। 'হ্যারিয়ামোকে চেনার একটা উপায়ই ছিল। তার হাতে ছিল একটা আঙটি, চিকামারাদের পারিবারিক আঙটি। নকল হ্যারিয়ামোর হাতে আঙটি না দেখে জিজ্ঞেস করেছিল বাবা। সে জবাব দিয়েছে, লড়াইয়ের সময় হারিয়ে ফেলেছে। বাবা বিশ্বাস করেনি। জানত, মরলেও আঙটি পরেই মরবে তার বাবা। গত মাসে টোকিওর একটা খবরের কাগজে ছোট্ট একটা খবর বেরিয়েছে। তাতে লিখেছে, সান্তা বারবারার কাছে জাপানী সাবমেরিন দেখা যাওয়ার কথা। বাবাকে বলে সঙ্গে সঙ্গে চলে এলাম।

'আই ট্রেইনড ডাইভার। এখানে এসে একটা শার্ক হান্টার কিনলাম। একটা

বোটও ভাড়া করতাম, তার আগেই এল বাবার তার। জানলাম; নকল হ্যারিয়ামোও সাবমেরিনের খবর পেয়ে আমেরিকায় চলে এসেছে। বুঝলাম, আমাকে ঠেকানর চেষ্টা করবে সে। আর কোনও উপায় না দেখে মালীর ছদ্মবেশে গা ঢাকা দিলাম। বিরোধীরা সুবিধে করে দিল আমার। রোজই শার্ক রীফের কাছে যায় আসে ওদের বোট। ডলফিনের তলায় শার্ক হান্টারটা আটকে নিতে কোনও অসুবিধেই হল না। এভাবে গোপনে তল্লাশি চালিয়ে গেলাম।

'সাবমেরিনটা আবিষ্কার করলাম ঝড়ের দিন। তখন আর ওটাতে ঢোকার সময় ছিল না। ঝড় বাড়ছে দেখে আশ্রয় নিলাম সান্তা ক্রুজ আইল্যাণ্ডে। পর দিন। সাগর শান্ত হলে আবার নামলাম। সাবমেরিনে ঢুকে বের করে আনলাম লগবুক রাখার বাক্সটা। আঙটিটাও পেলাম···একটা কঙ্কালের আঙুলে···আমি···আমি দাদাকে পেয়েছি,' ধরে এল শোহোর গলা। সামলে নিয়ে বলল, 'নিয়ে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু হাঙরটার জন্যে বাক্সটা রাখতে পারলাম না। পেছনে তখন মুসারাও তাড়া করে আসছে। বাক্স ফেলেই পালালাম। ছোট একটা রেডিও আছে আমার কাছে। তোমরা বাক্সটা নিয়ে তীরে যাবে, একথা শুনলাম। ভাবতে লাগলাম, কি করে আটকাই? মনে পড়ল, চ্যানেলের মুখের কাছে আগাছা জমেছে দেখেছি। ওখানে বোটের গতি কমাতেই হবে তোমাদেরকে। গিয়ে চুপ করে বসে রইলাম ওর তলায়।···'

'আরি, দেখ দেখ,' বলে উঠল মুসা।

নিচের ফাটলে আগুন। ক্যাম্পফায়ার।

'নিশ্চয় চিকামারা,' বলল সে। 'উল্টো দিক দিয়ে পালানো যাবে···'

'না,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'ওই যে, ওদিকে আরেকটা।'

ঠিক উল্টো দিকে পথের ধার ঘেঁষে আরেকটা ক্যাম্পফায়ার জ্বলছে।

'চালাকি করে আমাদের বের করতে চাইছে,' শোহো বলল। 'ক্যাম্পফায়ারের কাছে কোনও ছায়া আছে? নড়াচড়া? কিচ্ছু নেই। তারমানে কেউ নেই ওখানে। জ্বেলে দিয়ে সরে গেছে। ভাবছে, যেদিকে আগুন নেই সেদিক দিয়ে বেরোব। আর বেরোলেই, খপ! ব্যাটারা জানে না, আমরা কোথায় লুকিয়েছি।'

'তাহলে কি করব এখন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'এখানেই আমরা নিরাপদ। বরং ঘুমানর চেষ্টা করা যাক। কাল সকালে দিনের আলোয় ওদের ফাঁকি দিয়ে পালাব।'

বাইশ

পোর্টহোল দিয়ে ভেতরে ঢুকল ম্লান আলো। কাটারেই ঘুমিয়ে পড়েছিল রবিন আর মিস্টার কারটার। ঘুম ভাঙল।

'সূর্য ওঠার আগেই তীরে নামতে হবে,' বললেন লেখক। 'তাহলে আমাদের দেখবে না। ওঠ, নাস্তা সেরে নিই।'

চট করে মুখ ধুয়ে এল রবিন। দু'জনে চলে এল মেসরুমে। নাস্তা শুরু করে দিয়েছে লেফটেন্যান্ট মাইক আর তিনজন কোস্ট গার্ড। মেসরুমের পোর্টহোল দিয়ে রবিন দেখল, একটা অন্তরীপের কাছে নোঙর করা হয়েছে জাহাজটাকে। জিজ্ঞেস করল, 'কুইনবিনের বোট কোথায়?'

'অন্তরীপের ওপাশে,' মাইক জানাল। 'পিয়ারে বেঁধে রেখেছে। লুকিয়ে থাকার জন্যে এপাশে রয়েছি আমরা। অন্তরীপে নেমে চুপে চুপে উঠে যাব টিলার কাছে। তাহলে পিয়ার, হাইওয়ে, পাহাড়, কোনখান থেকেই আমাদের দেখতে পাবে না কেউ। টিলার পরে গাছপালা আছে। ওগুলোর ভেতর দিয়ে লুকিয়ে চলে যেতে পারব।'

মুসার ঘুম ভাঙল। উজ্জ্বল হয়ে উঠছে পুব দিগন্ত। কান পেতে রইল সে। পাখির গান আর ঝোপে-ঝাড়ে ছোট জানোয়ারের মৃদু হুটোপুটি ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। ফিসফিসিয়ে ডাকল, 'কিশোর? ওঠ।'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল শোহো।

কিশোরও চোখ মেলল। উঠে বসতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল, 'আউফ! বাবারে, মরে গেছি! একটা হাড্ডিও আস্ত নেই!'

'আরে ওঠ, ওঠ। মাটিতে শুলে ওরকম হয়ই। আছাড়ও তো খেয়েছ কাল কয়েক ডজন,' মুসা হাসল।

পাথরের ফাঁকে গিয়ে উঁকি দিল শোহো। বলল, 'কাউকেই তো দেখছি না। চলে গেল নাকি?'

তার পাশে চলে এল মুসা। 'না,' সাগরের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল সে। 'পিয়ারের বোট রয়েছে। ঘুমাচ্ছে বোধহয়, যায়নি।'

'ফাটলে আলো ঢোকার আগেই পালাতে হবে আমাদের। ফাটল দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে ওপাশের হাইওয়ে থারটি থ্রীতে। লগবুক আর আঙটি তোমাদের কাছেই রাখ। আমার পকেট নেই।'

'ঠিক আছে,' কিশোর বলল। 'বইটা আমি রাখছি। মুসা, আঙটিটা তোমার কাছে থাক।'

'চল, যাই,' শোহো উঠে দাঁড়াল।

যেদিক দিয়ে উঠেছিল, তার উল্টো ধার দিয়ে নামতে শুরু করল ওরা।

অনেক নিচ থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ, 'শোহো! এস, কথা আছে।'

নিচে একটা ফাটলের মধ্যে রয়েছে নকল হ্যারিয়ামো ওরফে কিংকো টাকিনো।

পাশ ফিরে ঢাল বেয়ে দৌড় দিল শোহো, আরেকটা ফাটলের দিকে। ওর পেছনে ছুটল দুই গোয়েন্দা। হোঁচট খেয়ে পিছলে পড়তে পড়তে নেমে এল চওড়া ফাটলটায়। এটা আগেই ছিল, সরু গিরিপথ, ঝড়ে সৃষ্টি হয়নি।

গিরিপথ ধরে ছুটে গিয়ে ওকের ঘন জঙ্গলে ঢুকে পড়ল ওরা।

গাছের আড়াল থেকে আচমকা বেরিয়ে এল ফেড কুইমবি। খপ করে শোহোর হাত ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'ধরেছি! বঅস্!'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল দুই গোয়েন্দা। তাদের পেছনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে ডিড কুইমবি। হাতের পিস্তলটা নেড়ে বলল, 'হয়েছে, থাম, আর দৌড়ানর দরকার নেই।'

নির্জন হাইওয়ের কিনারে বড় একটা গর্তে ঘাপটি মেরে রয়েছে রবিন। 'চিকামারার গলা!' সঙ্গীদের বলল সে।

ঢালের অনেক ওপরে একটা ফাটলের মুখের দিকে চেয়ে আনমনে বললেন কারটার, 'কুইমবিরা কোথায়? মুসা আর কিশোর?'

'চলুন না, দেখি,' মাইক বলল।

কোস্ট গার্ডদের এগোনর নির্দেশ দিল সে। গর্ত থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে পেরিয়ে এক ছুটে গিয়ে ফাটলে ঢুকল ওরা। রবিন আর কারটারকে নিয়ে মাইকও গেল তাদের পেছনে। ফাটলটা এত সরু, ভোরের রোদ ঢুকতে পারছে না। এখনও ঘন ছায়া এখানে। কর্দমাক্ত মাটির দিকে আঙুল তুলে দেখাল রবিন, 'দেখুন। ঝড়ের পর অনেক লোক গেছে এখান দিয়ে।'

জুতোর ছাপগুলো ভালমত দেখে মাইক বলল, 'অন্তত পাঁচজন। পাঁচ রকমের জুতো।'

'মুসা আর কিশোর।' পরিবেশ ভুলে চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'ওদেরকে তাড়া করে নিয়ে গেছে অন্য তিনজন।'

ছাপ ধরে ধরে এগিয়ে একটা ক্যাম্পফায়ারের দেখা মিলল। কারটারই আগে

দেখলেন। 'এখনও ধোঁয়া উঠছে। যায়নি বেশি দূর।'

কানে এল রাগান্বিত চিৎকার, খিকখিক হাসি। সামনে কোথাও। বিচিত্র আরও কিছু শব্দের পর নীরব হয়ে গেল।

'কি হল?' কারটারের কণ্ঠে অস্বস্তি।

'মনে তো হয়…,' কথাটা শেষ করল না মাইক।

'নিশ্চয় কিশোর আর মুসাকে ধরেছে!' রবিন বলল। 'জলদি চলুন। ওদের বাঁচাতে হবে।'

'দাঁড়াও!' তাকে থামিয়ে দিল লেফটেন্যান্ট। 'আমরা এসেছি বুঝলেই কিছু করে বসবে ওরা।…ক্ষতি হতে পারে মুসা আর কিশোরের।'

অসহায় ভঙ্গিতে একে অন্যের দিকে তাকাল ওরা। কি করবে বুঝতে পারছে না। অথচ দেরি করলে বন্দিদের নিয়ে পালিয়ে যাবে অপরাধীরা। এখান থেকে নিয়ে গেলে ভীষণ বিপদে পড়বে কিশোর আর মুসা।

আঙুল কামড়াতে লাগল রবিন। হঠাৎ দাঁতের ফাঁক থেকে সরিয়ে নিল আঙুল, 'স্যার, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে!'

তিন বন্দীকে নিয়ে আসা হল সেই জায়গাটায়, যেখানে আগের দিন দুই গোয়েন্দাকে বাঁচিয়েছিল শোহো।

'হারামজাদা!' দাঁতে দাঁত চাপল শোহো। 'আগেই বোঝা উচিত ছিল আমাদের। সাড়া দিলেই আমরা ওদিকে ছুটব, বুঝে আগেই দুই স্যাঙাৎকে বনের ভেতরে পাঠিয়ে দিয়েছে টাকিনো।'

'বুঝেছ তাহলে?' শোনা গেল টাকিনোর কণ্ঠ। ছায়া থেকে বেরিয়ে এল সে। শব্দ করে হাসল। 'মনে করেছিলে, পালাবে। পারলে না। আরে তুমি তো দুধের শিশু, তোমার বাপ-দাদাই আমার সঙ্গে পারেনি।' কুৎসিত হাসি হাসল আবার ডাকাতটা। 'দাও, লগবুক আর আঙটিটা,' হাত বাড়াল সে।

'আমাদের সঙ্গে নেই,' মুসা বলল। 'আসার আগে লুকিয়ে রেখে এসেছি।'

'খোঁজ,' দুই ভাইকে আদেশ দিল টাকিনো। 'পকেট-টকেট সব দেখ।'

কিশোরের পকেট থেকে বেরোল লগবুক। কিন্তু মুসার কাছে আঙটিটা পাওয়া গেল না। পকেট, কাপড়ের নিচে, জুতোর ভেতরে খুঁজল ডিড, কয়েকবার করে। বৃথা। টাকিনোর দিকে ফিরে বলল, 'আঙটি নেই এর কাছে।'

'ওটার কাপড়ের মধ্যেও খোঁজ,' কিশোরকে দেখাল টাকিনো। 'জুতোর মধ্যে।'

খোঁজা হল। আঙটি পাওয়া গেল না। রেগে আগুন হয়ে গেল টাকিনো। ধমক

দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় লুকিয়েছ?'

জবাব দিল না তিন বন্দী। মুখ ফিরিয়ে রাখল আরেক দিকে। 'সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না তাহলে…!'

'বস,' হঠাৎ বলে উঠল টাকিনো, 'ধোঁয়া!'

মুখ ফিরিয়ে তাকাল সবাই। ফাটলের ভেতর থেকে ঘন ধোঁয়া উঠছে। কালো করে দিচ্ছে সকালের নির্মল আকাশ। ভেজা ডালপাতা পোড়ানো হচ্ছে বোধহয়।

'ওখানে,' ফেড চেঁচিয়ে উঠল। 'ওখানেই তো কাল রাতে ক্যাম্প করেছিলাম! নিশ্চয় আগুন ছিল, লেগে গেছে ঝোপঝাড়ে।'

'জ্বলুক,' শান্ত কণ্ঠে বলল টাকিনো। 'আমার এখন আঙটি দরকার।' বন্দিদের দিকে চেয়ে বলল, 'ভালয় ভালয় বলে ফেল। নইলে কি করে বলাতে হয় জানা আছে আমার।'

ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিল কিশোর। ফিরে তাকাল। 'না, স্যার, কিছু করবেন না আমাদের। প্লীজ! আমি দেখাব কোথায় আছে।'

'কিশোওর!' চিৎকার করল মুসা। 'খবরদার…'

শোহো অবাক। 'কিন্তু…'

'দেখাব,' ওদের দিকে চাইলই না কিশোর। টাকিনোকে বলল, 'যদি আমাদের ছেড়ে দেন।'

'দেব,' সাথে সাথে জবাব দিল টাকিনো।

ঢোক গিলল কিশোর। 'পিয়ারে লুকিয়েছি। যখন আমাদের বোটটা ভেঙে দিচ্ছিলেন। তাড়াহুড়ো ছিল তখন। বইটা বড় হওয়ায় লুকানর জায়গা পাইনি…'

অধৈর্য হয়ে হাত নাড়ল টাকিনো। 'চল এখুনি।'

বন্দিদের নিয়ে চলল কুইমবিরা। খানিক পড়েই চোখে পড়ল নির্জন হাইওয়ে, নীরব পিয়ার, শূন্য সাগর। কোথাও কোনও নড়াচড়া নেই।

'ভাগ্যিস ঝড় এসেছিল,' চলতে চলতে বলল ফেড। 'রাস্তা বন্ধ না হলে…'

'চল, চল,' পেছন থেকে ধমক দিল টাকিনো। 'কথা থামাও। জলদি চল।' পাশ কাটিয়ে সারির মাথায় চলে এল সে।

নীরবে ফাটলের শেষ কয়েক শো' মিটার পেরোল ওরা।

পাশের ঝোপ থেকে ঝাঁপ দিলেন কারটার। এসে পড়লেন টাকিনোর ওপর। জাপটে ধরলেন তাকে। আড়াল থেকে বেরিয়ে দুই কুইমবিকে ধরে ফেলল মাইক আর কোস্ট গার্ডেরা। চোখের পলকে কেড়ে নেয়া হল রাইফেল, পিস্তল।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল রবিন। কিশোরকে বলল, 'আমার সিগন্যাল বুঝেছ দেখছি।'

ছাড়া পাওয়ার জন্যে ধস্তাধস্তি করছে টাকিনো। চেঁচাল, 'সিগন্যাল? কিসের সিগন্যাল? কিছুই শুনিনি!'

'শোনার জন্যে তো নয়, ' হাসি বিস্তৃত হল রবিনের। 'দেখার জন্যে। ওই যে ধোঁয়া, জ্বেলে রেখে গিয়েছিলেন। আশপাশে অনেক খড়কুটো ছিল। জড়ো করে দিয়েছি লাগিয়ে।'

'মোর্স কোড,' হাসিমুখে টাকিনোকে বলল কিশোর। 'নেভিতে ছিলেন, এটা বুঝতে পারলেন না? কেমন কম-বেশি হয়ে থেমে থেমে ধোঁয়া উড়ছিল, খেয়াল করেননি? করবেনই বা কি? পাগল হয়ে গিয়েছিলেন আঙটির জন্যে। কোডে ওর নাম জানিয়েছিলঃ র-বি-ন। বুঝে গেলাম, কাছেই আছে আমাদের উদ্ধারকারীরা।' থেমে, নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'ব্যস, আর কি? আপনাকে ব্যা-ব্যা বানিয়ে নিয়ে এলাম এখানে…'

'ব্যা-ব্যা!' বিচিত্র বাংলা শব্দটা বুঝতে পারল না টাকিনো।

দাঁত বের করে হি-হি করে হাসল মুসা। 'এটাও বুঝলেন না? ওহ্ হো, আপনি তো কিশোর মিয়ার চলতি ভাষা বোঝেন না। ছাগল ছাগল, জাপানে ছাগল নেই? ব্যা-ব্যা করে না?'

রাগে অন্ধ হয়ে গেল টাকিনো। ঝাড়া দিয়ে হাত ছুটিয়ে নিতে চাইল। কিন্তু কারটার ছাড়লেন না। শোহোর দিকে চোখ পড়তে ভুরু কুঁচকে ফেললেন। 'আরে, তুমি এখানে?'

সংক্ষেপে জানানো হল লেখককে।

'ছেলেগুলোর সঙ্গে লাগতে গিয়ে মস্ত ভুল করেছ তুমি, চিকামারা…,' হাসতে হাসতে বললেন কারটার।

'ও চিকামারা নয়,' বাধা দিয়ে বলল শোহো। 'কিংফো টাকিনো। ওর জালিয়াতির প্রমাণ আছে এখানে,' লগবুকটা দেখাল সে। ফেডের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছে ওটা। খুলে পাতা উল্টে একটা জায়গায় এসে থামল। 'এই যে, শুনুন, লেখা আছে,' পড়ে গেল সে। 'সময় শেষ হয়ে এসেছে আমাদের। একজন তরুণ নাবিক আছে আমার সাবমেরিনে। ওর নাম কিংফো টাকিনো বলেই জানতাম। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে এসে আমাকে বলল, ওর আসল নাম টাকিনো নয়। আর ছদ্মনাম নিয়ে মরার ইচ্ছে তার নেই, তাহলে দেশবাসী কোনদিনই তার নাম জানতে পারবে না। মরতেই যখন হবে, গৌরব নিয়েই মরতে চায় সে। ওর আসল নাম, হ্যারিয়ামো চিকামারা। বাড়িতে স্ত্রী আর এক ছেলে আছে। চিকামারার শেষ অনুরোধ, যদি কখনও এই লগবুক কারও হাতে পড়ে, তিনি পড়েন, তাহলে দয়া করে যেন চিকামারা পরিবারকে হ্যারিয়ামোর গৌরবজনক মৃত্যুর খবরটা পৌঁছে

দেন…,' আর পড়তে পারল না শোহো। চোখে পানি এসে গেল। মুছে নিয়ে বলল, 'এটা সাবমেরিনের ক্যাপ্টেনের লেখা। পুলিশ নিশ্চয় অবিশ্বাস করবে না। এই নোটবুক আর আঙটিই টাকিনোকে জেলে পাঠাতে যথেষ্ট।…আরে, মুসা, আঙটিটা কোথায় রেখেছ?'

হাসল মুসা। 'যেখানে আঙটি খোঁজার কথা কল্পনাও করবে না কেউ।' ডান হাত তুলে আঙুল ছড়াল সে। তার আঙুলে খাপে খাপে বসে গেছে হ্যারিয়ামোর আঙটি। কাদায় হাত মাখামাখি, আঙটিটা প্রায় অদৃশ্য হয়ে আছে। 'ব্যাটারা আমার আঙুল দেখার কথা মনে করেনি একবারও। আরও দুটো ব্যা-ব্যা!' ফেড আর ডিডের দিকে চেয়ে চোখ টিপল সে।

শেষ ঃ